শবরীর তিয়াষ

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

ভোলানাথ প্রকাশনী
৬/১ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীসুরেশ দাশ
৩৭।১১, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ :
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬১

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত

মুদ্রক :
অর্জুন ঠাকুর
অমরনাথ প্রেস
২০৮, বিধান সরণী
কলিকাতা—৬
ও
বাবুলাল প্রামানিক
সোম প্রকাশন
২৩এ কেদার দত্ত লেন
তা.—৬
কলিক

উৎসর্গ

মা ও বাবার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

Sabarir Tiash

A fiction by

CHITTA RANJAN SENGUPTA

'শবরীর তিয়াষ' প্রসঙ্গে

"শবরীর তিয়াষ" একটি উপন্যাস এবং সেই কারণে কথাসাহিত্য। কিন্তু কেবল যদি কথাসাহিত্য হত 'শবরীর তিয়াষ' তাহলে এই বই প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলবার আমার সুযোগ হত না এবং তা হলেও আমি গ্রহণ করতাম কিনা সন্দেহ। লেখক শ্রীচিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত আমার বিশেষ প্রীতিভাজন এবং আমার সাংস্কৃতিক অনুসন্ধানকর্মে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম আকর্ষণীয় অঞ্চল ঝাড়গ্রাম মহকুমায় বহুবার পর্যটনকালে অত্যন্ত উৎসাহী সহযোগী ও সঙ্গী ছিলেন এবং এখনও মধ্যে মধ্যে সঙ্গী হন। তিনি নিজে পুরুলিয়ার ছেলে এবং দীর্ঘকাল তিনি ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী কল্যাণ দফ্তরের আধিকারিক (Tribal Welfare Officer) দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাচীন জনগোষ্ঠীর (যেমন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি) ভাষা তিনি অনেকটা মাতৃভাষার মত জানেন। কেবল তাই নয়, এই সমস্ত সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি-প্রথা, উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ সমীক্ষা ও সাহচর্যলব্ধ পর্যাপ্ত জ্ঞান যে-কোনো নৃতত্ত্ববিদের কাছেও ঈর্ষার বস্তু বলে মনে হবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর কৌতূহল ও অনুরাগ অপরিসীম। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ সাঁওতাল ভূমিজ মুণ্ডা প্রভৃতিদের লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, উৎসব-আচার-অনুষ্ঠানের বিবরণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে। সাঁওতালী উৎসব-অনুষ্ঠানের অনেক সঙ্গীত তিনি বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। ভবিষ্যতে তাঁর সংগৃহীত এই তথ্য ও উপকরণ প্রকাশিত হলে সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হবে।

লেখক চিত্তরঞ্জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে পাঠকরা বুঝতে পারবেন কেন তাঁর লেখা 'শবরীর তিয়াষ' উপন্যাস হলেও আমি তাঁর অনুরোধে সাগ্রহে এই ভূমিকাটুকু লিখে দিতে সম্মত হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের প্রাচীন জনসংস্কৃতির প্রতি আমার নিজের অনুসন্ধিৎসা দীর্ঘকালের। বীরভূম-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-পুরুলিয়া-সংলগ্ন অঞ্চলের সমাজপ্রান্তে নির্বাসিত উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুদিন ধরে ঘুরেফিরে ও মিলেমিশে আমার এই ধারণা ক্রমে দৃঢ় হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের তথা বাংলার সংস্কৃতির স্বকীয়তা অথবা তার মনোরম সৌধের রূপগুণের বৈশিষ্ট্য বিচার করতে হলে তার 'বনিয়াদ' কোথায় খুঁজে বার করতে হবে এবং তা করতে হলে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের, অর্থাৎ উত্তর-রাঢ় অঞ্চলের, এই সমস্ত আদি জনগোষ্ঠীর দ্বারস্থ হতে হবে। একবার নয়, দু'বার নয়, বারংবার তাদের কাছে যেতে হবে, তাদের কথা শুনতে হবে, তাদের বিষয় জানতে হবে। এখনও হয়ত সময় আছে, এর পরে আর থাকবে না, কারণ দেশের ও সমাজের বর্তমান হাল যদি আরও কিছুকাল অপরিবর্তিত থাকে তাহলে এই সমস্ত অতিদরিদ্র অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উপরন্তু শহুরে সভ্যতার পংকিল আবর্তের ঘাতপ্রতিঘাতে তাদের যাবতীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্তির সম্ভাবনাও কম নয়। শহরের ম্যারাপ-বাঁধা 'ফোক কালচারের' শৌখিন অনুষ্ঠানে অথবা প্রদর্শনীতে অথবা সেমিনারের সাহায্যে, যা ইদানীং বঙ্গদেশের অন্যতম সংক্রামক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে, 'ফোক্' বা 'কালচার' কোনোটাই বাঁচানো সম্ভব হবে না, কেবল কিছু গবেষকের ডিগ্রিলাভ ও চাকরিলাভ হবে এবং কিছু পেশাদার লোক-সংস্কৃতিবিদের হয়ত বিত্তলাভ হবে। এইদিক থেকে বিচার করলে, 'শবরীর তিয়াষ' উপন্যাসের সাহিত্যিক মূল্য যাই থাকুক না কেন, তার সাংস্কৃতিক মূল্য অনস্বীকার্য।

মানভূম-পুরুলিয়ার একটি ছোট ভূমিজপ্রধান গ্রামের সাধারণ মানুষের দুঃখ প্রেমভালবাসা উৎসব আনন্দ কেন্দ্র করে লেখক কাহিনী রচনা করেছেন। কাহিনী হয়ত লেখকের কাছে মুখ্য, কারণ তা না হলে তিনি 'উপন্যাস' লিখবেন কেন? কিন্তু কাহিনী মুখ্য হলেও, তাঁর দৃষ্টি স্থানীয় জন-সংস্কৃতির প্রতি নিবদ্ধ। স্থানীয় উৎসব পার্বণ, যেমন গাজন, মনসাপূজা, করম ইত্যাদি এবং আঞ্চলিক জনসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন নাচনীনাচ, ঝুমুর গান, ছৌনাচ প্রভৃতির মনোজ্ঞ বর্ণনার ভিতর দিয়ে তাঁর কাহিনী পল্লবিত

হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন কাহিনীকে আরও বেশি জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করেছে। এই কারণে সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে এই বইয়ের গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়। মানভূম পুরুলিয়ার জনসংস্কৃতির, বিশেষ করে ভূমিজসংস্কৃতির, এরকম তত্ত্বকথাবর্জিত সহজ সরল, অথচ নির্ভরযোগ্য, বিবরণ আমার চোখে পড়েনি। আশাকরি লেখকের এই সাহিত্যিক উদ্যম সমাদৃত হবে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ অথবা ভিন্নরূপ সাহিত্য রচনার ভিতর দিয়ে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার আঞ্চলিক জনসংস্কৃতির ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য রূপায়ণে উৎসাহিত হবেন।

বিনয় ঘোষ

প্রকাশকের নিবেদন

'শবরীর তিয়াষ' প্রকাশিত হ'ল। আমাদের দেশের এক উল্লেখযোগ্য জনমণ্ডলীর প্রায় অবজ্ঞাত আখ্যান এ'তে বিধৃত হয়েছে। নির্ভুল সুপ্রকাশিত গ্রন্থ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া আমাদের মহত্তম দায়িত্ব।

এবারের বিদ্যুৎ-সংকটের দরুণ প্রকাশনের কাজের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়েছে। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতাও আর একটি বড়ো বাধা। আরো অন্যবিধ নানা প্রাসঙ্গিক অসুবিধার মধ্যে প্রকাশনায় কিছু মুদ্রণ-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সহৃদয় এবং সুধী পাঠক সমাজের উপদেশ এবং আগ্রহের প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে পরবর্ত্তী সংস্করণকে সর্বপ্রকারে ত্রুটি-মুক্ত করবার আন্তরিক অভিপ্রায় নিবেদন করছি।

সুরেশ দাশ।

সেই নবাগত সন্ন্যাসীটি যজ্ঞডুমুরের ছায়ায় ব'সে দূরের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখ দুটো আধখোলা। একটু যেন ঝিমুনীর ভাব। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস মত আসন ও প্রাণায়াম সেরে পদ্মাসনে ব'সেছিল।

তারপর সূর্য্য যখন পাতায় পাতায় রেশমী আলোকের পরশ বুলিয়ে মাটিতে প'ড়ে কাঁপছিল তখন শূন্য দৃষ্টিতে দূরের পানে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল সন্ন্যাসী। মাত্র এক রাত্রির মধ্যেই সন্ন্যাসীটি এই অঞ্চলের কিম্বদন্তীর মানুষ হয়ে উঠেছে। সত্যদ্রষ্টা সাধু। ভূত-ভবিষ্যত-বর্ত্তমান নখদর্পনে। আশ্চর্য্য বিভূতি সম্পন্ন মানুষ নাকি এই সন্ন্যাসী।

আপাততঃ মোকাম নিয়েছে তিয়াসি গ্রামেই। এই যজ্ঞডুমুরের তলায়। সন্ন্যাসীকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। যেন একটা দুস্তর চিন্তার মধ্যে ডুবে আছে।

তারপর এক সময় একটা রুম-ঝুম শব্দে সচকিত হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগল সন্ন্যাসী। কিন্তু শব্দটা ঠিক কোন দিক থেকে আসছে অনুধাবন করতে পারল না। ক্রমেই শব্দটা নিকটতর হতে লাগল। কেউ আসছে।

যজ্ঞডুমুরের তলায় এখনও ভীড় জমেনি। এখনও কৌতুহলী জনতা দেখতে আসেনি এই কিংবদন্তীর মানুষকে। বিহান বেলায় কোকিলের ডাকের সঙ্গেই আবার ঘুম ভেঙ্গেছে যদিও, তবু কেউ একা আসতে ভরসা পায়নি। দল বেঁধে আসার অপেক্ষা শুধু। এই সকাল বেলাতেই অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছিল সন্ন্যাসী।

সেই রুমঝুম শব্দ, যেটা খানিক আগে একটা দূরাগত বাঁশীর সুরের মত শোনা যাচ্ছিল, অথবা ভোরবেলায় ঘুম ঘুম ঠাণ্ডায় কাশীর গঙ্গায় মাঝিদের নৌকো বাওয়া ছলাৎ-ছলাৎ শব্দের মত মায়াময় মনে হচ্ছিল। সেটা এবার অনেক কাছে এগিয়ে এল। এবং খানিক পরে সন্ন্যাসী লক্ষ্য

করল, শব্দটা একটি যৌবনবতী নারীর রূপ ধারন করেছে। তারই নুপুরের ঝঙ্কার।

শব্দটা ক্রমশ অনেক কাছে এগিয়ে এল। এক সময়ে আচ্ছন্নের মত অনুভব করল সন্ন্যাসী, শব্দটা থেমে গেছে।

গাছ-কোমর করে শাড়ী পরেছে মেয়েটি। মাথার কানা উঁচু কাঁসার থালাটা ঝিক-মিক করছে নরম আলোয়। থালাটা মাটীতে নামাল মেয়েটি। তারপর সন্ন্যাসীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অকস্মাৎ সম্বিৎ হারিয়ে ফেলল মেয়েটি। ও মাটিতে এলিয়ে পড়ছিল। সন্ন্যাসী ওকে আলগোছে ধরে মাটীতে শুইয়ে দিল।

ইতিমধ্যে যজ্ঞডুমুরের তলায় জড় হয়েছে অনেকেই। ওরা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল ভূমিজদের গরবিনী মেয়ে পদ্ম হঠাৎ সন্ন্যাসির পায়ের কাছে মুর্ছিত হ'য়ে পড়ল। ওরা ভাবল ঠাকুরের ভর হ'ল পদ্মর ওপর। বেশি বয়স পর্য্যন্ত মেয়েরা আইবুড়ো থাকলে নাকি ঠাকুরের ভর হয়। ওরা মুগ্ধ হ'ল এবং লজ্জিতও হল, শেষ পর্য্যন্ত পদ্মর মত একটা শক্ত মেয়ের ওপরও ঠাকুরের ভর হ'ল? নাকি যজ্ঞডুমুরের 'পুস্করা' ভর করল? বিচিত্র কিছুই নয়। পদ্ম বাতাসে ভর দিয়ে পথ হাঁটে। পায়ের নীচের শক্ত মাটিকে দলে পিষে যে মেয়ে আকাশের স্বপ্ন দেখে।

মেয়ে-পুরুষ, ছেলে বুড়ো সবাই জড় হ'য়েছিল যজ্ঞডুমুরের তলায়। মাঝে মাঝে পদ্মর সর্বাঙ্গে একটা ময়ুরের পালক বুলিয়ে দিচ্ছিল সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর ঠোঁটে ঈষৎ হাসি। কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে যাওয়ায় বিহ্বল ভাবটা গোপন করতে পারেনি।

ওর সামুদ্রিক নারকেলের খোলের কমুণ্ডলু থেকে আঁজলা ভরে জল ,নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছিল পদ্মর চোখে মুখে। পদ্মর ভারী ভারী দুটো চোখের পাতা ভ্রমরের পাখনার মত কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ঠোঁট দুটো নড়ছিল মাঝে মাঝে।

সন্ন্যাসী ওর মুখের কাছে কান রেখে শুনছিল ওর নিঃশ্বাসের শব্দ।

মাতব্বরের গরবিনী মেয়ে পদ্ম। এখানে ওর থাকার কথা নয়। কিন্তু মাতব্বরের কথায় সন্ন্যাসীকে সিধে পৌঁছাতে এসে এই বিপত্তি।

সন্ন্যাসী মনুষ্য-চরিত্র ভালো ভাবেই জানে, তা একটাই নিরাপদ দূরত্ব থেকে মাঝে মাঝে ময়ূরের পালক বুলিয়ে দিচ্ছিল পদ্মর সর্বাঙ্গে। খানিক পরই আস্তে আস্তে চোখের পাতা ফেলল পদ্ম। মুহূর্ত্তের মধ্যে বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই মাটিতে উঠে দাঁড়াল। তারপর বেশবাস সামলে খর পায়ে হাঁটা দিল বাড়ীর দিকে। বিরক্তি আর ধিক্কার ওকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

সন্ন্যাসী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। প্রথম দিনই একি গেরো। তারপরও সব ভাবনা ছেড়ে হাসি মুখে গাঁয়ের মানুষদের কাছে ডাকল।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিয়াসির গুটি কয়েক মানুষের পরিচয় বকুল নগরের হপ্তাহাটে। সেই পরিচয়ের সূত্র ধ'রেই এখানে আসা। সপ্তাহে একদিন হাট। হাট তো নয় যেন ছাতা পরবের মেলা। মানুষের অরন্য। ওদের কাছে হাটে যাওয়ার আকর্ষণ দূর্নিবার। স্বর্গরাজ্যের পর্দা সরে গিয়ে মাঝে মাঝে অপ্সরাদের সঙ্গীত ভেসে আসে এই হপ্তা হাটে। শহরের অনেক আনন্দ মাঝে মাঝে উপছে পড়ে গাঁয়ে গঞ্জে। হাটই তার প্রাণকেন্দ্র। বেশি লোক হাটে যায়নি সেদিন। দ্বিজপদ গিয়েছিল একটা দোহেলে বলদ বিক্রী করতে। হাতে টাকা নেই। অথচ এই মাসেরই শেষাশেষি মেয়েকে দ্বিরাগমনে পাঠাতে হবে। গত হাটে বেয়াইএর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বেয়াই বলেছে এই মাসেরই শেষ দিকে বউকে নিয়ে যাবার দিন করবে। বউ অর্থে ছেলের বউ। বউ এবারে বড় হয়েছে, আর বাপের বাড়ীতে রাখা চলে না। কথাটা তাৎপর্য্যপূর্ণ। বড় হওয়া মানে যৌবনে পদার্পন করা। আমের বোল ধরলে গাছকে নজরে রাখতে হয়। দ্বিজপদ ক্ষীণ আপত্তি জানিয়েছিল আর কটি দিন রাখো কেনে ব' বেহাই, তুমার বউ ত' তুমারই রইল হে, বিটিকে আর কতদিন ধর্‍্যে রাখা যায়?

'কথাটি ত' ঠিকই বুলছ, হে, তবে কিনা যৈবন হলগে শুখা খড়। দপ কর্‍্যে জ্বলে যায়' দ্বিজপদর বেয়াই বলে চিবিয়ে চিবিয়ে।

'তা ঠিক' ঘাড় নাড়ে দ্বিজপদ 'কথায় বলে বিটি হল্য কোকীলের জাত। মানুষ করলেই পরের ঘর।'

কথাটা শুনে দ্বিজপদর বেয়াই এর মন ভিজলেও বউকে আর বাপের ঘরে রাখতে রাজী হয় না।

'তুমার অনুরোধটি রাখতে লারব বেহাই। ইয়ার পর 'শাকরাইত' তারপরে 'পহিল দিন' ছইত মাস, বাধার কি আর অন্ত আছে হে? তারপর ঈষৎ নতকণ্ঠে আসল তথ্যটি প্রকাশ করে, 'তাছাড়া ছেল্যাটিও ইবারে জুয়ান হয়েছেন হে, ইবারে বউটি আনা পেয়োজন।

বাস্তবিক, জোয়ান ছেলে, সোমত্ত বউ থাকতে কাছে না পেলে বিপথে-কুপথে যেতে কতক্ষণ? দ্বিজপদও আর আপত্তি করেনি। মেয়ে বিদায় দিতে খরচ আছে। তাই দোহেলে বলদটা বিক্রী করতে এসেছে হাটে।

বেজ, অর্থাৎ ব্রজবিহারীর সমস্যাটা ও প্রায় একই রকমের। অর্থাৎ কন্যা ঘটিত। ওর মেয়ে আসন্ন প্রসবা। ও এসেছে উদাসী ওঝার কাছে সুপ্রসবের ওষুধ নিতে।

আর মাতব্বর ঈশ্বরী সিংএর সঙ্গে এসেছে নীলকণ্ঠ, রমানাথ আর নগাই। এবারের গাজনে ঝুমুর গান আর নাচনী নাচের বায়না করতে।

দ্বিজপদর বলদটা বিক্রী করতে সময় লাগল না বিশেষ। পাহাড়-তলীর ঘাস খাওয়া হাতীর মতন দেহ। বলতে গেলে হাটের পথেই দরদস্তুর সুরু হ'য়েছিল। শেষে হাটে এসে প'টল।

উদাসী ওঝারও আজ ভীড় ছিল না বেশি। ব্রজকে দেখে এক গাল হেসে অভ্যর্থনা জানাল উদাসী। গোটা তিয়াসি গ্রামই উদাসীর অনুরাগী। অসুখে-বিসুখে উদাসীই একমাত্র মুস্কিল আসান। শেকড়-বাকড়, জড়ী-বুটী ছাড়াও উদাসী মন্ত্রশক্তিতে অসাধারণ, বিশেষ করে কতকগুলি ব্যারামে।

'বেজ যে! খবরাখবর সব ভাল ত', বিটিটি কেমন আছে? উদাসী শুধোয়।

'আর বল কেনে হে, উয়ার জন্যিই তো আসা' ব্রজর কণ্ঠে ক্লান্তির আভাস।

ব্রজর মেয়ে এক সময় উদাসীর রোগীনি ছিল। স্বভাবতঃই কৌতুহলী হয়ে জিগ্যেস করল উদাসী 'কেনে হে? কি হয়েছেন? শূলের ব্যারামটি বাড়ল, না শরীলটি দুব্বল হয়্যে গেছেন?

এই দুটোই ব্রজর মেয়ের ছেলেবেলার প্রধান উপসর্গ। ঈষৎ স্নেহ মেশানো লজ্জার সঙ্গে ব্রজ বলে 'না হে, উসব লয়, বিটিটি 'পুয়াতি' বটেন। শ্বশুর ঘর থিকে খালাস হতে অ্যাসেছেন আমার কাছে। তুমি ত' জানো হে, মেয়্যাটি ভারী দুব্বল। ধকলটি সামলাতে লারবেক। লিকষ্টে খালাস হবার ওষুধ দাও দেখি।'

'সে তুমাকে বলতে হবেকনি হে, এমুন ওষুধ দিব যে কষ্ট বুঝতেই লারবেক। কিন্তুক মেয়্যাটি এত বড় হয়ে গেছেন হে? সিদিন যে এতটুকু দেখলম কুকড়া ছার লাখান।'

'উ চাঁদের বাড়ন আর মেইয়া মানুষের বাড়ন, একই। কিন্তুক ওষুধটি ভাল দিও হে।'

নিজের নিজের কাজ চুকে যেতেই কানুদাস রসিকের আখড়ার সামনে জড় হয় সবাই। ওই রকমই কথা হ'য়েছিল মাতব্বরের সঙ্গে। নাচ গানের বায়না করতে হ'লে দল বেঁধে যেতে হয়। জোর হয় তাতে। গাঁয়েরও ইজ্জৎ বাড়ে।

হাটের এককোণে কানুদাস রসিকের আখড়া। নিরন দিনের পাল-পার্ব্বনের মরশুম আরম্ভ হয়েছে। কানুদাসও তাই আস্তানা গেড়েছে হাটে। এখান থেকেই ওর বায়না হয় গ্রামে-গঞ্জে, হাটে বাজারে। বলতে গেলে হাটই তো হাজার জনের মিলন ক্ষেত্র।

এবারের মরশুমে কানুদাসের বেশ নাম হয়েছে এ অঞ্চলে। ওর নাচনীর নাম কাজলী। দারুন ঠমক নাকি কাজলীর। ওর চলনে-বলনে নাচের ছন্দ। বুকের মাঝে ঢেঁকীর পাড় তোলে। তাছাড়া 'রসিক-ছাড়া' (রসিক পরিত্যক্ত) নাচনী নয় তাই, এখনও কদর আছে। 'বিয়ালা বউ' আর 'সাঙ্গালা বউ' এর যা তফাৎ।

কানুদাসের সঙ্গে কাজের কথা আরম্ভ হবার আগে একটা শালপাতার চুটী ধরায় ঈশ্বরী। 'রাজট' অর্থাৎ কোন কিছু আলোচনা সময়ে মুখে চুটী না থাকলে মাতব্বর মানায় না। কথায় বলে 'ময়ূরের ঝুটি আর মুরুব্বির চুটি। তাছাড়া মগজে ধোঁয়া না গেলে পাটোয়ারী বুদ্ধি ঠিক খোলে না।

কিছুতেই রাজী হয় না কানুদাস।

'না হে মাতব্বর লারব। অত কমে গাইলে ইজ্জত থাকবেক নাই দলের। গেরামে রট্যে গেলে ভাতে ধূলা পড়বেক আমার।

ঈশ্বরী চুটিতে একটা জোর টান দেয়। তারপর আস্তে, আস্তে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করতে করতে বলে 'কথায় বলে যেমন আম তেমন দাম। তুমি তো আমাদের গেরামে লোতুন হে, ইবারে কেমন গাও দেখে লিই, ঘুরে বার থিকে না হয় অন্য ব্যবস্থা করা যাবেক।'

নতুন কথাটিতে ভারী আপত্তি কানুদাসের। 'তুমাদের গেরামে না হয় নাই গেছি। কিন্তুক আসে-পাশের লোকজনদের মুখে শুনেছ ত' সব। এই তো সিদিন দাসপাড়া-চন্দনপুরের সদগোপ বাড়ীর বিয়াতে গাইলম তিন রাত। মজুরী লগদ তিরিশ টাকা, বখশীষ একজোড়া কাপড় আর খাওয়া-দাওয়া ফিরি। আর তুমি বুলছ লৌতুন। লৌতুন বলেই ত' দাম বেশি। লৌতুন কাপড়ের দাম বেশি, লৌতুন গাই এর কদর বেশি আর লৌতুন বউএর আদর বেশি।' তারপর চোখ বুজে ঝুমুরের একটা কলি ভাঁজে কানুদাস।

> লৌতুন শাড়ী, লৌতুন কুটুম
> লৌতুন বউএর মান
> (আর) লৌতুন পিরীতির হায়রে
> দশ আনা দাম।

কানুদাসের গলা ভাল। সুর শুনে চমৎকৃত হয় ওরা সবাই। কিন্তু দরদস্তুর করতে ছাড়ে না। কারণ ব্যাপারটা কারও একার নয়। সমস্ত গ্রামের।

'পূজার বায়না আর বিয়ার বায়নায় তফাত নাই?' দ্বিজপদ বলে 'গঙ্গার জল আর কালিন্দী সায়রের জল কি এক হল?'

উপমাটি ভাল লাগে ঈশ্বরীর। না এক নয়। গঙ্গার জল আর কালিন্দী সায়রের জল এক হতে পারে না কোনদিন।

'বউএর লমুনা তুলেই যেখন কথা বুললে কানুদাস, ত্যাখন বলি, বিয়ালা বউ আর সাঙ্গালা বউএর মান কি সমান? বুঝে দেখ কথাটি?' মাতব্বর গোঁফ চুমরায়।

বিয়ালা বউ হল এক পুরুষের মন ধরা আর সাঙ্গালা হল দ্বিতীয় পুরুষের মন চোরা। প্রথম স্বামীর মৃত্যু হ'লে বা স্বামী ছেড়ে দিলে দ্বিতীয় পুরুষ গ্রহণ করে যে রমণী সেই সাঙ্গালা বউ। দুই এর কদর এক নয়।

'রাজী হ'য়ে যাও কেনে' বেজ বলে 'কিছু অথ্থ আর কিছু পুণ্যি দুই হবেক।'

'না ব' মাতব্বর, অত কমে গাইতে লারব। মর‍্যে যাব তাহল্যে' সবিনয়ে নিবেদন করে কানুদাস।

নীলকণ্ঠ বিরক্ত হয়। ওর জোয়ান বয়েস। এতটা দর কষাকষি ওর ভাল লাগে না।

'এতো গরজ কিসের ব'। না গাইবেক' তো নাই গাইবেক' 'নীলকণ্ঠ' রমাইএর কানে ফিস ফিস করে বলে। মাতব্বর শুনতে পেয়ে ইশারায় থামিয়ে দেয় নীলকণ্ঠকে। শুনতে পেলে হয়ত বিগড়ে যাবে কানুদাস। এতক্ষণের পরিশ্রম বিফল হবে তাহ'লে।

'বেপারটি ত' আমার একার লয় হে। এজমালী কাণ্ড। ষোল আনার বেপার। আমার একার হল্যে একবাক্যে মেনে লিতম তুমার কথাটি। কিন্তুক আমি অনুপায়।' কানুদাসকে বোঝাবার চেষ্টা করে ঈশ্বরী সিং মাতব্বর।

কানুদাস বাস্তু ঘুঘু। সহজে ভোলবার লোক নয়। ঈশ্বরী ও অনেক অভিজ্ঞ। সেও জানে নাচনী নাচ, ছো নাচ আর

পাইক নাচের বায়নায় দর কষাকষি অবশ্যম্ভাবী। আর এক কথায় রাজী হ'য়ে যাওয়ার নাম ঠকা।

আর যাই হোক এই বয়সে চৌরাশি পরগণার নাম করা মাতব্বর ঈশ্বরী সিং ঠকতে রাজী নয়। সাতকুড়ি পাঁচটি পরিবারের সুখ দুঃখের দিক-দিশারী।

কানুদাস মাথা চুলকোয়। কানুদাসও বোঝে সহজে রাজী হ'য়ে যাওয়ার লোক নয় ঈশ্বরী। আড়চোখে একবার নীলকণ্ঠর দিকে তাকায়। নীলকণ্ঠর চোখে-মুখে অসহিষ্ণুতা। বেশি চাপ দিলে হয়ত ফসকে যেতে পারে। তাছাড়া কালাচাঁদ রসিকও এই হাটেই আখড়া বেঁধেছে। ওর নাচনীর নাম রাইকিশোরী। নাম ডাকও মন্দ নেই। কাজলীর মত সুরসিকা না হলেও শরীরে বেশ একটা লোভানী আছে। জোয়ানদের বেসামাল হতে ভাল লাগে না। কাজলী যেন মহুয়ার মিঠে সুবাস। চোখ জুড়ে ঘুম আসে। রাইকিশোরী মহুয়ার কড়া মদ। শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। এদের দুজনকে এক সঙ্গে পেলে নাচের আসরে বর্ষার ঢল নামাতে পারত কানুদাস। কিন্তু হায়রে, তা সে হবার নয়। এক আকাশে দুই সূর্য্য, আর এক রসিকের দুই নাচনী থাকার জো নেই। নাহলে রাইকিশোরী কি আর কানু দাসকে ছেড়ে কালাচাঁদের কাছে যায়। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে কানুদাসের।

'আর দুটো টাকা বাড়াই দাও মাতব্বর, আমার কথা রাখো।'

মাতব্বর নিজের সিদ্ধান্তে অটল। কারণ সে জানে একবার যখন নড়েছে তখন আর পড়তে দেরী নেই। ঠিকমত ঘা দেওয়ার অপেক্ষা।

কোলাকুলীটা শেয়ানে শেয়ানে। কানুদাস বোঝে মাতব্বর ইচ্ছে করলেই দুটো টাকা বাড়িয়ে দিতে পারে। এবং না বাড়ালেও তিয়াসিতে কানুদাস ঝুমুর গাইবেই। কিন্তু তাহ'লে নিজের অহমিকার কাছে ছোট মনে হয়। অন্ততঃ একটা টাকাও না বাড়ালে যে ইজ্জত থাকে না। তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখে কানুদাস 'আমার 'রেটের'

থিকেও যে কম হ'চ্ছে হে, আমার আর ব্যবসা চলবেক নাই। অনাহারে থাকতে হবেক ব' মাতব্বর।'

মাতব্বর কিছু বলার আগেই সন্ন্যাসীর প্রবেশ। এখানে সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রথম দেখা।

'কিসের কলহ চলছে কানুদাস? দরে পটছে নাই বুঝি?'

হে হে করে হেসে কানুদাস বলে 'পটবেক নাই কেনে। মিল হয়েছে। তবে জোড় বাঁধে নাই এখুনও।' রসিকতা করে কানুদাস।

'মাত্তর ছুটাকায় আটকাছে হে সন্ন্যাসী ঠাকুর।' মাতব্বর জবাব দেয়।

'তা মাতব্বরের কথায় রাজী হয়ে যাও কেনে। দেবতার পুজার বেপার। রাজী না হলে ভগবান পাপ-পুণ্যির হিসাব নিয়ে দরাদরি করবেক হে।'

কানুদাস হাসে। তাহল্যে ওই কথাই রইল মাতব্বর 'এগারো টাকা লগদ আর খাওয়া দাওয়া—'

'না হে', ঈশ্বরী মাথা নাড়ে 'অত দিতে লারব।'

নীলকণ্ঠ অধৈর্য্য হয়। এতো খোসামুদীর কি আছে, দরে না পটলে রাইকিশোরীকে বায়না করলেই তো হয়। দরাদরিটা নীলকণ্ঠর ভাল লাগে না। হাজার হোক বকুল নগরের বোর্ডিংএ থেকে পড়াশুনা করেছে ও।

সন্ন্যাসির কথায় রাজী হয়। 'তাহ'লে আমার মাঝের নৌকায় পা দাও ছুজনে। তুমার কথাও থাক আর আমার ও। রাজী হয়ে যাও আমার মাঝের কথায়।' সন্ন্যাসির মুখে প্রশান্ত হাসি। রাজী হয়ে যায় ছুজনাই।

এবারে নাচনীর কথা খেয়াল হয় সবার। সত্যি সে কই? যার চলনে ঠমক, বলনে ধমক? সেই নাগিনী নর্ত্তকী? অন্তত একবার চোখের দেখা না দেখে গেলে গাঁয়ে গিয়ে বলবে কি?

'সে কই হে, তাকে ত' দেখছি নাই?'

কানুদাস বোঝে। মুখ বেজার করে বলে 'ইখেনে নাই হে। ছেলার লেগে পরান কাঁদছিল। তাই দেখতে গেছে ভিন গাঁয়ে।'

ছেল্যা? ওরা শুনেছিল কাজলী এখনও কুমারী। তাহল্যে?

কানুদাস পিট পিট করে তাকায়। 'নাহে যা ভাবছ তা লয়। নর্ত্তকী না বিইয়ে গোবিন্দর মা হইছে। সে অ্যানেক বেত্তান্ত। দাসপুরে একটা ছেল্যা, মা বুলে ড্যাকেছিল। তার সঙ্গে পাতানো সম্পক্ক।'

হতাশ হয় সবাই। বেলা প'ড়ে আসছে, ওরা উঠবার উদ্যোগ করে।

'চলি তবে কানুদাস, তাহ'লে অই কথাই রইল।' মাতব্বর গামছাটা কাঁধে ফেলে উঠি উঠি করে। অন্য সবাই উঠে দাঁড়ায়।

'চলি গো সন্ন্যাসী ঠাকুর।'

সন্ন্যাসী নির্বেদ হাসি হেসে বলে 'যাবে? যাও। পথেই দেখা হবেক আবার।'

'কোন পথে।'

'এই আসা যাওয়ার পথে। পথ যে অনন্ত হে। একই পথে আমাদের নিত্য দিন আসা যাওয়া। শুধু যেছি আর এসছি, বিরাম নাই।'

ওরা ভাবের কথা বোঝে না। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামে।

নীলকণ্ঠর ব্যবহার অনেকক্ষণ ধরে পীড়িত করছিল ঈশ্বরীকে। একটা কাঁটা যেন খচখচ করছিল মনের মধ্যে। পথে নেমে প্রথম সেই কথাই বলল মাতব্বর। বেশ মিষ্টি করেই বলে, 'দেখ বাবা নীলু, তরা হলি লিখাপড়া জানা জোয়ান ছেল্যা, কথায় কথায় তুদের রক্ত গরম হয়। বয়স কালে আমাদেরও হত, তবে আমরা কুনদিন মুরুব্বিদের সামনে মাথা গরম করি নাই।'

নীলকণ্ঠ সহসা বুঝতে পারে না। 'বলি বেত্তান্তটা কি বলবে ত?'

'তা বলব বৈকি। ই বয়সে অ্যানেক দেখলম বাপধন। কানুদাসের সঙ্গে দরাদরিতে তুর গোসা হইছিল। কিন্তুক বাপধন, ঝুমুর ওয়ালা-দের সঙ্গে যে দর না করলে চলে নাই। উয়ারা এক কথার মানুষ লহেন। তাছাড়া কাজটি লিজের লয়, ষোল আনার কাজ, একটুকু বেবচনার সঙ্গে করতে হয়।'

নীলকণ্ঠ লজ্জিত হয়। 'আমি গোসা করি নাই মাতব্বর। তবে বেরক্ত হয়েছিলম ই কথাটি মিছা লয়। ঝুমুর ওয়ালাদের অত দেমাক কিসের হে?'

'গুণী লোকদের দেমাক সাজে বাপ। আর সে দেমাকের দামও দিতে হয়। উনারা গান বাঁধে, গান গায়, লোককে আনন্দ দেয়, উনাদের দেমাক থাকবেক নাই? তাহল্যে তুর আমার সঙ্গে তফাত কি তেনাদের। নেহাৎ পেটের দায়ে মজুরী লিয়ে গান গাইতে হয়। গান কি আর বেচবার জিনিষ? হেদয়ে ধ'রে রাখার জিনিষ—।'

গানের প্রতি আর গীতিকারদের প্রতি একটা আশ্চর্য্য দুর্বলতা আছে ঈশ্বরীর। তিয়াসির মানুষদের সন্দেহ······অবশ্য সে কথা পরে।

এদের মধ্যে নগাই অর্থাৎ নগেন্দ্রই একটু মিতভাষ। কথা সে কম বলে। শুধু দেখে। পৃথিবীর সব কিছুই তাকে বিস্মিত করে। ভোরের সূর্য্যের দিকে প্রতি দিনই অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নগাই। এত রঙ কোথা থেকে আসে? পাখীর কাকলীতে নগাই মুগ্ধ, এই সুরেলা কণ্ঠ ওরা পেল কোথায়? ভোরের শিশির হাতের পাতায় তুলে ও ভাবে, এই নিটোল অশ্রুবিন্দুটি যদি চিরকাল ধ'রে রাখতে পারতাম।

নীলকুঠি বাড়ীর বাঁক ওরা কখন পার হ'য়ে এসেছে খেয়াল নেই। নীল পুকুরের পাড়ে নীল ধোওয়ার বড় বড় জালাগুলো দেখে ভারী অবাক লাগে নগাইএর। কিন্তু এগুলো কি মানুষের তৈরী, নাকি বিশ্বকর্মার?

'দেখ লীলু, এত বড় বড় পাথরের জালাগুলিন কি মানুষের তৈরী

নীলকণ্ঠ অন্যদের শুনিয়ে ওর কথার জবাব দেয় 'হঁ, মানুষের তৈরীই ত' বটে হে। সহরে ত' কুনদিন যাস নাই। গেলে দেখতিস কত বড় বড় কল তৈরী করেছে মানুষ। উড়োজাহাজ, ইঞ্জিন গাড়ী আরও কত কি।'

উড়া জাহাজ অবশ্য ওরা দেখেছে। ওদের আকাশ দিয়েও উড়ে যায় মাঝে সাঝে দুএকটা কান দুটো ঝালাপালা করে দিয়ে। কিন্তু ওগুলোও কি মানুষের তৈরী?

'হ্যাঁ ব' নীলু উগুলোও কি মানুষের তৈরী? উড়া জাহাজ গুলিন?' বিস্মিত সবাই। দ্বিজপদ, বেজ, নগাই।

বিজ্ঞে জাহির করে নীলকণ্ঠ। 'আজকাল আবার কলের লাঙ্গল বের্যাইছে হে। চাষ করতে বলদ লাগবেক নাই আর।'

ই বাবা! কলের লাঙ্গল? সে আবার কি জিনিস হে। এরপর হয়ত শোনা যাবে কলের মানুষ তৈরী হ'য়েছে। পাহাড়তলীর মাঠে রেখে দিলে একাই হাজার হাজার গরু, ভেড়া, ছাগল, কাড়ার তদারকী করতে পারবে। ধন্য মানুষের বুদ্ধি। এই প্রসঙ্গে সেই টুসু গানের কলিটা মনে পড়ল নগাইএর

'বাঘমুড়ির পাহাড়ে, জোড়া হাতী
চরে রে,
ধন্য মানুষের মাথা ফাঁদ পাত্যে
ধরে রে।'

হাতীর মতন একটা বিরাট প্রাণীকেও ফাঁদ পেতে ধরে।

নীলকণ্ঠ আরও বলে 'তারপর বায়স্কোপ, ছায়ার মানুষ। তুমার আমার মতনই চেহারা। কথা বলছে, হাসছে, চলছে ফিরছে। কিন্তুক সব ছায়া। যেই আলো জ্বলল অমনী সব ফাঁকা।'

'একদম মানুষের লাথান?' নগাই বিস্ফারিত চোখে শুধোয়।

'লয়ত' কি? যা দেখ্যে আয় পুরুল্যা শহরে। তিন আনা কর্যে টিকিট। যাত্রাগানের মতন।'

নীলকণ্ঠর চোখ দুটো আবেশে ভরে আসে। শহর ওর চোখে মায়ার কাজল পরিয়ে দিয়েছে। দুর্বার তার হাতছানি। সেবার তরণী সেন না কি যেন একটা পালা বায়স্কোপে দেখেছিল ও। সীতার কথা ভেবে তিন রাত ঘুমুতে পারেনি। আহা কি ডাগর ডাগর চোখ, আর কিই বা মুখের গড়ন। কে বলে রাক্ষস হ'লেই অসুন্দর হয়; মন্দোদরী যে সেজেছিল সে কি কম সুন্দর? আর চেড়ীগুলো? কিন্তু মাত্র তিন ঘণ্টার ব্যাপার। আলো জ্বলল কি সব শেষ। মনটা যেন ব্যাথায় ভরে ওঠে।

'আর কি কি হয় ব?' নগাই-এর জানার অসীম আগ্রহ।

'সে বেত্তান্ত বলে সিব্যাতে লারব হে। হাওয়া গাড়ী, কলের গান।'

কলের গান? হ্যাঁ, কলের গান একবার দেখেছে নগাই। সেই যে হাটে একবার হরিণ মার্কা বিড়ি বিক্রী করতে এসেছিল, তখন কলের গান বাজিয়ে লোক ডাকছিল ওরা।

'মানুষ লয় হে। উয়ারা সব ভগবান বটে।' আচ্ছন্নের মত নগাই বলে।

'হঁ, তাবটে।' বেজ সায় দেয় ওর কথায় ঠিক এইসময়ে পিছন থেকে একটা তৃতীয় কণ্ঠ শোনা যায়।

'মানুষের' মধ্যেই যে ভগবান আছেন ভাই।' চমকে পিছনে তাকায় ওরা। লাঠিটা বাগিয়ে ধরে ঈশ্বরী।

'কে?'

'আমি ভাই, সন্ন্যাসী।'

'সন্ন্যাসী ত' আমাদের সঙ্গে কেনে?'

'তোমাদের সঙ্গে যে আমার জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয় ব।' তাই তুমাদের সঙ্গ ধরলাম হে।'

হ্যারিকেনের আলোটা একটু উসকে দিয়ে সন্ন্যাসীর মুখের সামনে ধরে।

'ও, কানুদাসের আখড়ার সন্ন্যাসী।'

'চিনতে পারলে' সন্ন্যাসী উল্লসিত হয়। 'কিন্তুক তুমাদের গাঁয়ে যেতে বললে নাই আমাকে ?'

ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে ঈশ্বরী বলল 'আমাদের গাঁয়ে কেউ কুনদিন যায় না সন্ন্যাসী। আমরা যে গাঁয়ে থাকি। বন-জঙ্গল ঘেরা গাঁ, না আছে সুখ না আছে আরাম। তুমি যাবে ই ত' আমাদের ভাগ্যি হে। কিন্তুক কথাটি পেত্যয় করতে নারলম।'

দ্বিধা নেই। সংশয় নেই। অকপট স্বীকারোক্তি। তিয়াসিতে কেউ আসে না। কোনদিন না। কটি মানুষ আর তাদের পরিবার যুগ যুগ ধ'রে বাস করে এই সীমিত পৃথিবীতে, লোকালয় ও বাইরের ছুনিয়ার খবর সেখানে এখনও অজ্ঞাত।

'তুমাদের গাঁ যে আমার বড় চেনা হে, তাই তো আমার গাঁঠরিটি বেঁধে চল্যে এলম তুমাদের পিছু পিছু।'

'আগে কুনদিন অ্যাসেছিলে আমাদের' গাঁয়ে ?' নগাইএর চোখে অসীম কৌতুহল।

সন্ন্যাসী স্মিত হাসি হাসে।

'আমার মনটি যে চেরকাল ঘুরে ফিরে' বেড়ায় তুমাদের গাঁয়ের আনাচে-কানাচে, দেহটি শুধু পড়্যে থাকে পথে পথান্তরে।

ওরা নীরবে পথ হাঁটে। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে রাস্তা। শাল ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ম' ম' করে। ছু পাশে শাদা শাদা ফুল। জ্যোৎস্নায় আর শিশিরে ভেজা। হঠাৎ তাকালে মনে হয় একরাশ হাসি কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে পথের ছুপাশে। মাঝে মাঝে ছুএকটা পাখী ডানা ঝটপট করে উড়ে যায় আকাশে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কেউ যেন আলো আঁধারীর জাল বিছিয়ে দিয়েছে পথের মাঝে। সাবধানে পা ফেলতে হয়। বুঝি ভেঙ্গে যাবে চরণাঘাতে।

এ দৃশ্য তিয়াসির মানুষদের কাছে চিরপুরাতন ও চিরনূতন। যেমন রোজকার সূর্য্য, রোজকার পাখীর ডাক আর ভোরের শিশির। প্রতি সপ্তাহেই ওরা যায় এই পথ দিয়ে। কখনও দেখে ফুলে ফুলে ভরে

ওঠা রক্ত পলাশের রাঙ্গা রূপ। কেউ যেন আগুন জ্বেলে দিয়েছে সারা বনময়। সেই আগুন ওদের মনকেও উত্তপ্ত করে তোলে। যৌবন যেন যন্ত্রনায় ছটপট করে। আবার কোন সময়ে দেখে সেই গাছ-গুলোরই রিক্তপত্রতার হাহাশ্বাস। হতাশার মর্মর ধ্বনি। মনটাও অকারন শূন্যতায় ভরে উঠে। এমনি ওদের নিয়মিত আসা যাওয়ার অবকাশে ফুল ফোটে, গন্ধ বিলোয়, ওদের চেতনায় গুঞ্জরিত হয় কখনও বসন্তের উল্লাস আর তন্ত্রীতে বেজে ওঠে চৈত্রের বিলাপ।

মেহনতী মানুষ ওরা। জীবনে কখনও কখনও রঙ লাগে। অস্তশেষের ক্ষণিক রক্তরাগের মতই। বেদনার সুর বাজে কখনও। সেই অরুন্তদ বেদনার সুরও স্তব্ধ হ'য়ে যায়। জীবন আবার শান্ত। নিস্তরঙ্গ। কঠিন, কঠোর।

সন্ন্যাসীর কাছে সবই যেন নূতন। সবই আনন্দময়। এই পথ, এই আকাশ, এই সৌরভ, সব যেন সন্ন্যাসী নয়ন ভ'রে দেখে।

নগাই অবাক হয়। 'এত কি দেখছ হে পথের মাঝে ?'

'পথই ত' সব হে। একই পথে আমাদের সবার আনাগোনা। সংসারে পথের মতন পবিত্র স্থান কি আছে ? পথ হ'ল সব তীর্থের বড় তীর্থ। তাই ত' পথের ধূলো দেখে লিলম অঙ্গে হে।'

সন্ন্যাসীর ভাবের কথা ওরা কিছু বোঝে না। শুধু বোঝে এগুলো জ্ঞানের কথা। নগাই অভিভুত হয়ে শোনে। ঈশ্বরীও। কিন্তু নীলকণ্ঠ সন্দিগ্ধ। ওর বিশ্বাস দ্বিধাগ্রস্ত। কিছুটা পিছিয়ে ব্রজ-বিহারীকে বলে, বেজ কাকা, সন্ন্যাসীকে ব' আমার ভাল মনে হছে নাই। কি মতলবে গেরামে যাছে কে জানে।

এই সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেজের ভাল লাগে না। মাতব্বর গাঁয়ের ভালমন্দের মালিক। ও যখন বিশ্বাস ক'রে গাঁয়ে যাচ্চে তখন আর সন্দেহের কিছু নেই। 'না, না, তু ব্রেথা সন্দেহ করছিস লীলু। মতলব আর কি থাকবেক।'

দ্বিজপদ নীলকণ্ঠর এই অকারণ সন্দেহে বিরক্ত হয়। 'ইটা তুর অন্যায় সন্দেহ লীলু। সন্ন্যাসী ভগবানের দাস। উনাকে সন্দেহ করলে পাপ লাগবেক।

ব্যাজার হয়ে নীলকণ্ঠ বলে 'আমি কি তাই বলেছি? বাইরে গেরুয়ার ভেক, ভিতরে কি আছে বুলতে পারে কেউ? শহরে কত ভেকধারী চোর-জুয়াচোর ঘুরে বেড়ায় তার খবর রাখো তুমরা?'

বেজ চ'টে। দরকার নাই। সে যেখানে বেড়ায় বেড়াক। আর এত খবরই বা পায় কি করে নীলু? শহরে গিয়ে বোধ হয় খবরের কাগজ পড়ে যত বিদ্যা তত অবিশ্বাস। বেজ ভাবে, এর চেয়ে মুখ্যু থাকাও ভাল, তাহ'লে আর মানুষকে অবিশ্বাস করতে হয় না।

'দেখ বাবা, মাতব্বর পবীন লোক। সে যা ভাল বুঝবেক করবেক, তুর আমার মাথা গরমাই লাভ কি?'

'ঠিক কথা' দ্বিজপদ সায় দেয়। মাতব্বর যা করবে গাঁয়ের মঙ্গলের জন্যই করবে। অন্যদের ভেবে লাভ কি।

ওদিকে তখন গুণ গুণ করে গান ধরেছে—

সন্ন্যাসী,

'(আমি) মন বেসাতি ফিরি করি
ভাবের বাজারে,
কিনে লাও যেজন সুজন এমন রতন
কি আছে আর সংসারে
মন বেসাতি ফিরি করি ভাবের বাজারে।
(ও হে) দাম লাগে না গাঁটের কড়ি
ভাবের কড়ি লগদ চাই
এ মহাজন কঠিন বড়
ধার মেলে না তেনার ঠাঁই।
এ রতন হয় না চুরি যায় না খোয়া
রাখতে যে হয় হেদয় মাঝারে
মন বেসাতি ফিরি করি ভাবের বাজারে।

'আহা হা। বেশ বেশ। বড় আনন্দ পেলম হে।' মাতব্বরের চোখ ভাবে গদগদ।

নগাই তখন ভাবছে, সন্ন্যাসি গাঁয়ে গেলে থাকবে কোথায়। সবাই তো সংসার নিয়ে বাস করে। ঘরের সংখ্যা কুলো দেড়খানি। একখানিতে শোয় আর অন্যটিতে গরু বাছুর রাখে। এর মধ্যে মাতব্বরেরই যা দু'একটি বাড়তি ঘর আছে। কিন্তু ওর ঘরে ও তো যুবতী মেয়ে।

সন্ন্যাসিকে নগাইএর নিজের ঘরে রাখলে কেমন হয়? কদিন সাধু সঙ্গ হবে।

চাঁদ হেলে পড়েছে পশ্চিমে। বুড়োবুড়ি পাহাড় ডিঙ্গিয়ে মাঠের রাস্তা ধরে ওরা। ধান ক্ষেতের আলোর ওপর দিয়ে পথ। ধান কাটা হয়ে গেছে বহুদিন। পাথুরে এক ফসলে জমি। এখন পতিত পড়ে আছে। আগাছা জন্মেছে পথের দুপাশে। মানুষ সমান বাবুই ঘাস। ওরা মাঝে মাঝে কেটে নিয়ে গিয়ে দড়ি বানায়। খাটিয়ার দড়ি। শিকে। জল তোলার দড়ি। মাঝে মাঝে বিক্রী ও করে হাটে।

গাঁয়ের কাছাকাছি এসে মাতব্বর বলে আজকার রাত ট' তাহলো গরীবের ঘরেই থাকা হোক সন্ন্যাসি।

মাথা চুলকে নগাই বলে 'কাকা হে, আমার ঘরে ত লোকজন নাই। সন্ন্যাসিকে আমার ঘরেই রাখতে পারি তুমি অনুমতি দিলে।'

মাতব্বর জবাব দেওয়ার আগেই ঘাড় নাড়ে সন্ন্যাসি 'না হে। ঘর ছেড়ে পথে নেমেছি। ঘরে আর আটকা পড়তে পারব নাই। পথই আমার ঘর। এই গাছ তলাটি বড় ভাল লাগছে হে। ইখেনেই থাকব আমি।'

'সেকি'. ওরা সঙ্কিত হয় 'রাত বিরাতে লাকড়া কিংবা আধবাঘা বাইরায়—

সন্ন্যাসি হেসে বলে সন্ন্যাসির আর ভয় কিসের হে? পথের মানুষ বল আর বনের পশুই বল, সন্ন্যাসিকে সবাই ভালবাসে।

যজ্ঞডুমুরের তলায় গাঁঠরী নামায় সন্ন্যাসি। যাওয়ার আগে হাতজোড় করে ঈশ্বরী বলে 'কাইল দিন তুমার সিধা পাঠাই দিব। গ্রহণ করতে হবেক কিন্তুক—'

'লিচ্চয়' সন্ন্যাসি বলে 'গ্রহণ করব বৈকি। মাথা পেতে গ্রহণ করব।'

তিয়াসিতে ভূমিজদের বাস। অন্য সম্প্রদায়ও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তবে ভূমিজরাই প্রধান। এদের কৌলিক পদবী সর্দ্দার। দলীল দস্তাবেজের পোষাকী পদবী সর্দ্দার। কেউ লেখে সিংমুড়া। পরগণা চৌরাশির জমিদার সিংহমানকিদের আশ্রিত ছিল একদা। সিংহ মানকিরা ভূমিজ রাজপুরুষ। কেউ লেখে ঘাটোয়াল। ঘাট অর্থাৎ সংরক্ষিত ভূখণ্ডের মালিক। সিংহমানকিরা ভূমিজ বংশোদ্ভুত। তবে ঘাটোয়াল বা দীগাররা সবাই ভূমিজ নয়। সিংহমানকি ঘাটোয়াল দীগার এরা সবাই ছোটনাগপুর উপত্যকা ভূমির ছোট ছোট ভূস্বামি।

চৌরাশির সিংহমানকিদের আত্মীয়তার সুত্র ধরে তিয়াসির ভূমিজদের পূর্বপুরুষেরা কবে কখন এবং কোথা থেকে এখানে এসে ছিল তা কেউ জানে না। অনেকের অনুমান রাঁচী হাজারী বাগ সীমান্তের কোন পার্বত্য জনপদের ভূমিজদের একটি শাখা ভাগ্য অন্বেষনে বার হয়ে বন কেটে বসতি স্থাপন করে এই জঙ্গল খণ্ডে। খুঁটিপাঠিদার সত্ত্বে মৌজা চৌরাশির পত্তনী নেয়। মহারাজাদের কাছে। তারপর চাষ চন্দনকেযারী থানার সীমানা দিয়ে দলেদলে মানুষ আসে জঙ্গল খণ্ডে বসতি করতে। তিয়াসির ভূমিজরাও তাদেরই উত্তর পুরুষ। একসময়ে চৌরাশির সিংহমানকিদের যখন লোকবলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল তখন তাঁরা তিয়াসি মৌজার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড এদের চাকরান সত্ত্বে দান করেছিলেন। তখন এরাইছিল মানকিদের ভূসম্পত্তির রক্ষক।

তিয়াসির দুপাশে দুটো হেলানো পাহাড়। একটা ছোট আর একটা বড়। রাতের অন্ধকারে পাহাড় দুটোকে কোল কুঁজো বৃদ্ধের মত মনে হয়। লোকে বলে ওগুলোর নাম বুড়োবুড়ী পাহাড়। মনে হয় সুদীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করেও ওরা প্রতিদিন সকালে সম্ভাষণ জানায় পরস্পরকে। পাহাড় দুটোর মাঝে বিস্তীর্ণ একখণ্ড অনাবাদী পাথুরে জমি। দশ মাইলের মধ্যে কোন বসতি নেই। এই নিস্ফলা ভূখণ্ডের নাম তিয়াসি।

কবে কোন পথিক নাকি আকণ্ঠ তিয়াষ নিয়ে মরেছিল এই ভূখণ্ডে তাই অতৃপ্ত অশরীরির ভয়ে মানকিরা দীর্ঘদিন এই মৌজাটাকে অনাবাদী পতিত অবস্থায় ফেলে রেখেছিল। প'রে ভূমিজ্দের দান ক'রে ছিল চাকরান সত্ত্বে।

আজ ভূমিজরাও আছে। মানকিরাও আছে। কিন্তু সব সত্ত্ব উপসত্ত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জমিদারী খাটোয়ালী উঠে গেছে। এখন আর তিয়াসির মানুষদের ব্যাগার দিতে হয় না। জমি এরা নিস্কর ভোগ করে। কেউ কেউ পেশাদার সৈনিক হিসাবে লড়াই করে। কখন ও দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে। কদাচিত খুন। কিন্তু এসব তিয়াসির স্বভাব শান্ত ও সহজ সরল ভূমিজদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে বিঘ্নিত করে না।

তিয়াসিতে বাইরে থেকে বড় একটা কেউ আসে না। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন বসতি। পাহাড় তলীতে কিছু সরেস জমি আছে। ওরা বলে বাহাল জমি। বর্ষায় পাহাড় থেকে সঞ্চিত জল অজস্র ধারায় নেমে এসে জমি গুলোকে উর্বর করে। ওরা বলে বহির জল। সেই জমি চাষ করে। আর করে পশুপালন। গরু মহিষ, ছাগল ভেড়া পোষে। চরানোর জন্য ভাবতে হয় না। ডুংরীতে ডুংরীতে অপর্য্যাপ্ত ঘাস জন্মে। গেরস্থর ছেলে মেয়েরাই চরায়। ওরা বলে গোঠালী। তাই এ গ্রামের ছেলেমেয়েদের একটি বিশিষ্ট বয়সে গোঠালী বা রাখালী একটি অপরিহার্য্য বৃত্তি। তা নাহ'লে পাহাড় থেকে কখন যে নিঃসাড়ে নেকড়ে নেমে আসবে—চলতি ভাষায় ওরা বলে লাকড়া। প্রতি বৎসরই দুটো একটা ভেড়া ছাগল তুলে নিয়ে পালায়। ওরা বলে হড়পা বান আর লাকড়া বাঘ জানান।

প্রতি বছরই দুএকটা ভেড়া ছাগল তুলে নিয়ে পালায় তেমনি প্রতি বছরই আসে একদল লোক গাড়োয়ালী ভেড়ার পাল নিয়ে সুদূর উত্তর থেকে। এরা শীতকালে সারাটা শীত পাহাড়তলীর মাঠে আগুন জ্বেলে কম্বল গায়ে দিয়ে রাত কাটায়। পাহাড়তলীর খানিকটা জায়গা ঘেরা দিয়ে সেখানে ভেড়াগুলোকে রাখে। বলে ভেড়ী ডেরা।

ভেড়ী ডেরার মাটী উৎকৃষ্ট, আর গোবর গোমুত্রের চেয়েও শক্তি শালী। ভেড়ী ডেরার মাটী নিয়ে পাছে বিবাদের সৃষ্টি হয় তাই মাতব্বরের নির্দ্দেশে ভাগ করে দেওয়া হয় ভেড়ী ডেরার মাটী। পরিবর্ত্তে ভেড়ী ওয়ালা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পায় তরি-তরকারী, ডিম, দুধ। কিন্তু তার চেয়েও বড় আকর্যণের মোহে আসে ওরা এই দক্ষিণ অঞ্চলে। শীতকালে যখন উত্তরে গাছ গাছালী শুকিয়ে যায়। দক্ষিণের মাঠে ডুংরীতে ডহরে তখন অপর্য্যাপ্ত ঘাস। সেই ঘাস খেয়ে ভেড়াদের শরীর মখমলের মত লোমে ভরে ওঠে। এরা তার জন্য দ্বিগুণ মজুরী পায়। সেটা মুখ্য আকর্ষণ। কিন্তু একটা গৌণ আকর্ষণও আছে সেটা হ'ল ঘরনীর তল্লাশ। না সাময়িক আনন্দের জন্য এরা নারী খোঁজে না, খোঁজে ঘরনী, ঘর বাঁধার দুর্নিবার আকাঙ্খায়।

ওদের দেশে নাকি মেয়ের সংখ্যা কম। তাই এ দেশে এসে কোন দুস্থ গরীব মেয়ের সঙ্গে ভাব জমায়। একটা স্বপ্নের ঝাঁপি তুলে ধরে তার সামনে তারপর একদিন মুগ্ধা হরিণীর মত গ্রাম থেকে নিয়ে উধাও হয়। এই নিয়ে দুচারদিন আলোড়ন হয়। তারপর ক্রমশঃ সব থিতিয়ে যায়। এ সব কথা কেউ মনে রাখে কেউ রাখে না।

গ্রামীন মানুষের জীবন যাত্রার স্বল্প পরিসরে দুঃখ আছে, দারিদ্র আছে কিন্তু দুরাকাঙ্খা নেই। তাই অশান্তি ও কম। দূর গাঁয়ে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেয়। পাল পার্বনে হৈ হল্লা করে। স্ফূর্ত্তি করে। মদ খায়। নাগরিক সভ্যতায় এরা বিস্মিত, হতচকিত। কিন্তু তার জন্য কোন অভিযোগ নেই। গ্রামের সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনাকে প্রাণ দিয়ে অনুভব করে। চাষ করে। পাথুরে মাটিতে ফসল ফলায়। গায়ের সোনা ঘাম দিয়ে জমি তৈরী করে। গরু ছাগল চরায়। বকুল-নগরের বিকিকিনির হাটে আনন্দের সওদা করে। ভিন গাঁয়ের থেকে মেয়ে এনে বাসা বাঁধে। সংসার করে তারপর একদিন মরে যায়। বুড়োবুড়ী পাহাড়ের ছায়ায় একটা বড় পাথরের নীচে হয় তার সমাধি। ওরা যাকে বলে হাড়সালী।

তিয়াসির মানুষদের ও এই মোটামুটী জীবন দর্শন।

গ্রামের প্রান্ত ঘুরে যজ্ঞডুমুরের তলা দিয়ে ঘাস ক্ষয়ে যাওয়া রাস্তাটা বুড়োবুড়ী পাহাড়ের ফাঁকে অদৃশ্য হয়েছে। এই পথটা দিয়ে ওরা কাঠ আনতে যায় পাহাড়ে। পাহাড় তলীতে জমি চাষ করতে যায়। আবার বকুলনগরের হাটে যাওয়ার রাস্তাও এইটাই। রাস্তার বাঁক-টাকে ওরা বলে ত্বয়ারসিনি। পাহাড় দুটো ডিঙ্গিয়ে রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে একটা বড় মাঠের সঙ্গে। তার নাম ডহর। তারপর নীল কুঠিবাড়ীর গহীন জঙ্গল ছাড়িয়ে সোজা নীলপুকুরের কেয়াতলা। সেখানে খানিক বিশ্রাম করে হাঠুরেরা। চুটী তামুক খায়। হাতমুখ ধোয়। আর ক্রোশ খানেক হাঁটলেই বকুলনগর। সপ্তাহে একদিন হাট বসে। পরগনা চৌরাশির দক্ষিণ অঞ্চলে একটী মাত্র হাট। হাটে মানকিরা টোল আদায় করে। ভিন গাঁয়ের কুটুমদের সঙ্গে দেখা হয়। সামাজিক তত্বতল্লাশ হাটেই সারা হয়। হাটের শেষে সবাই একত্র হয়ে বাড়ী ফেরে। দাসপাড়া, রাঙ্গামাটী, চন্দনপুর ইত্যাদি আরও পাঁচটা গাঁয়ের লোক থাকে সঙ্গে। নীলকুঠি বাড়ীর বাঁকে ওরা অন্য রাস্তা ধ'রে আর তিয়াসির লোকেরা পাহাড়টুকু পার হ'য়ে ছমছম গায়ে ঈশ্বরকে একদফা প্রণাম জানিয়ে ঘরে ফেরে।

পর দিন সকালে সন্ন্যাসীর আগমন বার্তা তিয়াসিতে কারো অজানা থাকে না। নগাই ই জনে জনে বর্ণনা করে—আহা, রোপের কি জেল্লা হে, হোক কালো বরণ, কিন্তুক তমালের ল্যাখান চেকনটি। আর কি সুমেষ্ট গলা, যেন মধুটি ঝরছেন হে। ধম্ম কথায় মাতব্বরের মতন্ পবীন লোককেও মাথাটী নুয়াত্যে হল ব'। যতই হোক, এই কাঁচা বয়সেই ঠাকুরের বোরপা পেয়েছে।

ব্যাপারটাতে স্বভাবতঃই সবাই কৌতুহলী হ'য়ে উঠে। বাস্তবিক, কে এইনবীন সন্ন্যাসী? হঠাৎতিয়াসিতেই বা এল কেন। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই শোনা যায় হাটুরেদের কাছ থেকে। সন্ন্যাসী নাকি সর্বদর্শী। মানুষের অকথিত মনের কথাগুলো ও অগোচর নয় সন্ন্যাসীর।

সেই কথাই নগাইকে জিগোস করে হেঁটকুলীর নটবর সিং। 'সন্নাসী নাকি মানুষের মনের কথাগুলিন পটপট বলে দিছে?'

'তবে আর বলছি কি হে' কথায় আর কল্পনায় মিথ্যের মিশেল দিয়ে বর্ণনাটা চমকপ্রদ করবার চেষ্টা করে নগাই। 'শুনল্যে অবাক হবে হে, কাল রেতে শুধালেক মানকিডাঙ্গার বাজ-বহড়া তলায় (বাজ পড়া বহড়া তলা) এখনও ছাতা পরবের মেলা বসে কি না। তেমনী মনের কথাগুলিনও তেনার অজানা নাই হে। ' কে কার নামে মামলা করবেক। কার সঙ্গে কার রঙ হইছে—সব।'

ঈষৎ সন্ত্রস্ত হয় চম্পাই। চম্পাই নটবরের ছেলে। বাপের কাছে কাছেই থাকে। আবার ছো-নাচে ও ওর বাপের দোসর।

চম্পাইএর মন বিশ্বাস-অবিশ্বাসে সংশয়াকুল। সন্ন্যাসীকে দেখতে যাবে কি না ভাবছিল ও। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখল না যাওয়াই ভাল। কারণ ওর বাপের সামনে যদি সব কথা বলে দেয়—সম্প্রতি পরীক্ষিৎ সিং এব মেয়ে ননীবালার সঙ্গে ভালবাসা হয়েছে চম্পাইএর।

সন্ন্যাসীর এ হেন বিভূতির কথা অনেককেই, বিচলিত করে। নেশাখোর শশীকমল ব্যক্তিগত কারনে সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি অনুরক্ত। নেহাৎ ভগবৎ প্রেমে নয়। সম্প্রতি যদিও শশীকমলের মন অবিশ্বাসি হ'য়ে পড়েছে মনের মধ্যে নানান্ দ্বিধাদ্বন্দ সব কিছু অগ্রাহ্য করতে পারে না।

চোখ দুটো টান করে তাকিয়ে শশীকমল শুধোয়—'সন্ন্যাসীর বয়স কত রে নগাই?'

'হবেক বা বিশ পঞ্চাশ।'

গাঁজার নেশায় আরক্তিম চোখদুটো কপালে তোলে শশীকমল 'হই বাপ, বলছিস কি রে!— সঠিক বল।'

'লারলম ব'। সন্ন্যাসীরা চেরকাল জুয়ান থাকে হে। তাই পঞ্চাশ বছর বয়সেও বিশ বছরের জুয়ানের লাথান দেখায়। বয়স সম্বন্ধে নগাইএর যুক্তিটা মানতে রাজী নয় শশীকমল। বিশ থেকে পঞ্চাশ। একটি যৌবনের সুরু এবং অন্যটি প্রৌঢ়ত্বের শেষ। নগাইএর কথা শুনে হাসাহাসি করে চম্পাইরা। কোন তর্ক না করে শশীকমল সুধোয় 'কোন মাদুলী-টাদুলী দিতে পারে রে?'

কোথায় শশীকমলের দুর্বলতা তা জানে নগাই। ঘাড় নেড়ে বলে 'বলতে লারলম ব' খুড়া। তবে মাদুলী তাবিজ ত' অনেক লিলে, ইবার খুড়ীকে কুবরেজ দেখাও।

শশীকমল জবাব দেয় না।

পঁচাশি বছরের জবুথবু মাতালী বুড়ীর কানেও ওঠে কথাটা। ঈশ্বরী সিংএর মা ও। ঈশ্বরীর নিজের মা নয়, ওর বাপের প্রথম পক্ষ। ঈশ্বরীর নিজের মায়ের মৃত্যু হ'য়েছে ওর জন্মের পরই। ব'লতে গেলে মাতালী বুড়ীই মানুষ করেছে ওকে। সারাটা দিন বকবক করে বুড়ী।

বুড়ীও জিগ্যেস করে ঈশ্বরীকে।

'বলি, জগডুমুরের তলায় কে নাকি একজন সন্ন্যাসী অ্যাসেছে শুনলম, হ্যাঁ বাপ ঈশ্বরী?'

আদ্যি কালের বুড়ী। ওর বয়সি কেউই বেঁচে নেই এখন। বুড়ী এখনও বনে যায় কাঠ কুড়োতে।

হাড়সালীর কালো পাথরের চাঙ্গড় ঢাকা সমাধিগুলি দেখিয়ে মানুষ চেনায়। হাড়সালী অর্থাৎ শ্মশান। সেখানে ভূমিজরা মৃতের এক টুকরো হাড় পাথর চাপা দিয়ে তার স্মৃতির সমাধি রচনা করে।

হাড়সালীতে স্মৃতিচারণ করে মাতালী বুড়ী। ইটো হল উপর কুলীর বাসুদেব নায়েকের। যার লাতিটি ওলাউঠায় মরলেক খবার বছর। পাকুড় গাছের লীচে কালো পাথরের উপরে বেরাহ্মণ দের পৈতার মত সাদা-সাদা দাগ, উখেনে আছে খঁড়া কালিদাস। খঁড়া কালিদাসকে আর তুরা দেখবি কুথায়—কম বয়সি কাঠ কুড়োনীদের বলে তুরা ত্যাখন মায়ের গর্ভে। চৈতের গাজনে গজাল খিক্কে পড়্যে গেছলেক। পা টি ভাঙ্গ্যে গেছলেক তাই খঁড়া কালিদাস নাম—।

কথার সূত্রে অনেক গল্প মনে পড়ে বুড়ীর। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। বলে কাজ আছে বুড়ী মাঈ, সাঁঝের বেলায় গরুগুলিনকে ঘর পানে ডহরাতে হবেক।

তবু বুড়ী বক বক করে। কেউ না শুনলেও নিজের মনেই বলে আহা হা, সেসব দিনের বেত্তান্ত বেবরণ কাকেই বা বলি। হই যে

মহল হলে শুয়ে আছে ঝুমুরওয়ালা সুচাঁদ সিং, অমন সুমেষ্ট গলা নিয়ে আর কেউ জন্মালনি ভূমিজদের ঘরে। যেমন মনসার ঝাঁপান গাইত সুচাঁদ, বনের হরিণও তুদণ্ড দেঁইড়ে যেত। মরদরা বউদের চোখে চোখে রাখত, কে কখন জাত কুল মান খোয়াবে ঘর থিকে বেরোয় যায়। সাপ্পকে যেমুন বাঁশি বাজায় বশ করে বাইদারা, তেমুনই।

কাঠকুড়োনীদের কাছেও অজানা নেই মাতালী সুচাঁদ উপাখ্যান। এই বিশ্ব-বিমোহন কারীকেও বস করেছিল মাতালী। মাতালীর তখন ভরা যৌবন বর্ষার শ্যাম তরঙ্গী নদীর মতন উথালি পাথালী।

সুচাঁদের সঙ্গে মন মজেছিল মাতালীর। ওদের তুঃসাহসিক প্রেমের কাহিনী আজও তিয়াসির যুবক যুবতীদের কাছে গল্প-কথা রয়ে আছে। আর এর জন্য কোন অহেতুক লজ্জা নেই মাতালী বুড়ীর। সুচাঁদের সঙ্গে ওর রঙের কথা ও অকপটে স্বীকার করে। তবে ওদের প্রেমে মালিন্য ছিল না কোথাও। ছিল না কোন ছলনার অবকাশ।

ঈশ্বরীর বাপকে বলেছিল মাতালী মন এক জিনিষ, দেহ আরেক। আমি পাপিনী। দেহটী ভূমাকে দিয়েছি। মনটি দিতে লারলম। আবার তুমাকে যা দিয়েছি, সুচাঁদকে তা দিতে লারব। এই ভাবে দেহ ও মনকে পবিত্র রেখে দেহাতীতকে লাভ করেছিল মাতালী। ঈর্ষার আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলেছিল সুচাঁদের বাপ। কিছু বলেনি ও। কারণ ও জানত বাধা দেওয়া নিস্ফল। বর্ষার তুরন্ত জলকে বালির বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা যায় না। তাছাড়া ঈশ্বরীর বাপ তখন পুত্রার্থে দ্বিতীয় বিবাহ করেছে। অবশ্য মাতালীর সম্মতি নিয়েই, সেই জন্য মাতালীর প্রতি ঈশ্বরীর বাপের একটু করুনা মিশ্রিত অনুরাগ ছিল।

মিথ্যে নয়। সেকালে সুচাঁদের মত অনেক গুণী লোক ছিল। সুচাঁদের দোয়ারকিছিল মধুরাই। মাদলে ফুল ফোটাতে পারত মধুরাই। সুচাঁদের মৃত্যুর পর অভাবের তাড়নায় আটকাঠিদের সঙ্গে রাণীগঞ্জের কয়লা খাদে কাজ করতে চলে গিয়েছিল ও। আর ফেরেনি।

তিয়াসিতে এখনও ঝুমুর গানের চর্চা আছে। কেউ কেউ ঝুমুর বাঁধে ও। তাদের পথিকৃত সুচাঁদ।

'আমাদের স্বজাতি ছিল, স্বকুটুম, যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে সুচাঁদের কথা বলে মাতালী। অমন মইষের মত জুয়ান মরদটি এক ঝড়-জলের রেতে হঠাৎ মর্‌্যে গেল—তারপর উদাস হয়ে যায় সুঁচাদ। ওর ঘসা কাচের মত অসচ্ছ চোখ দুটো ভাবলেশ হীন। যেন মরা মাছের চোখ। বুকটা শুধু ব্যথায় গুমরে ওঠে।

সুচাঁদের মৃত্যু কি ভাবে হয়েছিল একথা আর সবারই জানা। শুধু বিশ্বাস করে না মাতালী। প্রেমিকার মন। প্রিয়তমের কথাই বার বার মনে পড়ে। যে ওর শুন্য হৃদয়কে ভরে তুলতে চেয়েছিল। মাতালীর বিশ্বাস সুচাঁদের আত্মা এখনও সালোই ডহরের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। কান পেতে শুনলে এখন ও শোনা যায় তার সেই ঝুমুরের সুর লহরী। হায় হায় রে।

দিনের মধ্যে হাজারবার অতীতের কথা বলে মাতালী। যে দিন গুলো জড়িয়ে আছে ওর জীবনের সঙ্গে। তিয়াসির ইতিহাসের সঙ্গে।

সন্ন্যাসির আগমণ বার্ত্তাতে মাতালী ও পুলকিত হয়। গল্প করার ও সুত্র খুঁজে পায়।

সন্ন্যাসি ত আর লতুন লয় ই গেরামে বুঝলি বাপ ঈশ্বরী, মাতালী বলে আর একবার সন্ন্যাসি অ্যাসেছিল ই-গেরামে। তুর ত্যাখন দুধ-খাওয়ার বয়স, তু ত আটমাস্যা ছেল্যা। হাত-পা গুলিন পাঠ কাঠির মতন সরু সরু ছিল। রঘু সিং এর বউ আমাকেবললেক, খামল্যা বউ, হাত পা গুলিন কচড়া তেল দিয়ে মালিশ কর। আটমাস্যা ছেল্যা ত। সিদিন তুকে খাটুলীতে সুয়্যাই তেল দিছি, এমন সময়ে—'

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় বুড়ী-বুড়ো বয়সের যা রোগ।

ঈশ্বরীর আর ধৈর্য্য থাকে না। বলে এ বুড়ী মাঈ, তুর গপ্প ঘুর্‌্যে আস্যে শুনব। এখুন সময় নাই। সন্ন্যাসিকে সিধা পাঠাতে হবেক। তার পর মনসা থানটি মেরামত করতে হবেক। চড়কের ঢেঁড়া ডাঙ্গাটি ভাঙ্গ্যে গেছেন, সিটি আনতে হবেক জঙ্গল থিকে—"

ঈশ্বরীর কাজের ফিরিস্তী শুনে গুরুত্বটা উপলব্ধি করে মাতালী। ঈশ্বরীর জন্য একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আছে মাতালীর। নাই বা হ'ল নিজের ছেলে। তবু মানুষ করেছে তো।

যা বাপ যা। তু হলি গেরামের মাথা। গেরামবাসীদের সুখ-দুখের মুস্কিল আসান। কত কাজ তুর—

মাতালী বুড়ী লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে চলে যায়।

শশীকমলের বউএর প্রাণে সুখ নেই। তার ওপর চৈত্রের গরম। মেয়েটি একটু আয়েসি। তাছাড়া সচ্ছল বাড়ীর মেয়ে। কষ্টের জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত নয়। তবে ভারী সরল। শ্বশুর বাড়ীর সংসারে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। স্বামির সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ততায় অনুযোগ ও করতে পারে না। এদিকে সারা ক্ষণ দজ্জাল বউ কাঁটকী শাশুড়ীর কটু বাক্য মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। চোখের জলে ওর দিন কাটে।

শশীকমল ছিলিমটি পরিপাটী করে সেজে দাওয়ায় বসে সবে দম দেওয়ার উদ্যোগ করছিল। ঠিক সেই সময় সুরু হল।

গলার জোরের খ্যাতি আছে শশীকমলের মা ফুলমতীর। হেঁটকুলী পার হ'য়ে উপর কুলী পর্য্যন্ত পৌঁছে সে আওয়াজ। পাড়ার লোকদের বিশ্বাস হেঁটকুলীতে যে কাকের সংখ্যা কম তার প্রধান কারণ ফুলমতীর গলা। সে গলা আষাড়ের মেঘ গর্জনকেও হার মানায়।

বড় একটা জালায় গোবর গুলে উঠোনটা নিকোতে আরম্ভ করেছিল ফুলমতী। অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল একাজটি তো ওর করবার কথা নয়। ঘরে ডাগর বউটি আছে। আর গতরটিও নেহাৎ মন্দ নয়। বাঁজা শরীরের বাঁধুনী শক্ত। সে থাকতে বুড়ী শাশুড়ী নিকোবে কেন ?

হঠাৎ আসা হড়পা বানের মত বিনা ভূমিকায় বিনা পুবার্ভাসে ফুলমতীর উদ্বেগ উথলে উঠল।

'বলি হ্যাঁরে শইশা, তুর বহুটায় কি এখনও পড়্যে পড়্যে ঘুমাছেন নাকি ?

শশী কমল তটস্থ হ'ল। ওর এত আরামের মৌতাতটা বুঝি টুটে

যায়। বউএর কোন দোষ নেই। কাল রাতে বউকে একটু বেশি সোহাগ করে ফেলেছে ও। কাল রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত দুজনেই জেগে ছিল। কিন্তু সেকথা তো ফুলমতীকে বলা যায় না।

একটা যুতসই অজুহাত খুঁজছিল শশীকমল। এমন সময় আবার ফুলমতীর গলা শোনা গেল।

'বলি রাজনন্দিনী সাড়া দিচ্ছিস নাই যে? বিয়া দিয়েছি কি ভাতারের সঙ্গে শুয়ে কাটাবার লেগে।'

শশীকমলের কান দুটো লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ভাগ্যিস কুলী দিয়ে এখন ও লোক চলাচল সুরু হয়নি। কিন্তু কেউ শুনতে পেলে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

'উয়ার শরীলটি ভাল নাই মাঈ কাল রেতের বেলার দুবার 'জলঘাট' গেছল।

ফুলমতী এবার শশীকমলের কাছে এসে দাঁড়ায়। 'হ্যাঁ বাপ কখুন কখুন রে? কাল রেতে যে আমি দুদণ্ড ও ঘুমাই নাই। আমাকে ডাকে নাই কেনে?'

'বোধ হয় লাজায়ছিল' শশীকমল নিভন্ত কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে বলে।

ফুলমতী খেঁকিয়ে ওঠে আহা আমার লজ্জাবতী লতারে। বলে মরদের সঙ্গে শুতে লাজ নাই। ঘুমের থেকে উঠতে লাজ।

শঙ্কিত হয় শশীকমল। আঃ মাঈ, কুলী দিয়ে এখন লোকজন বেরায়। শুনলে কি বলবেক?

'কি আর বলবেক বাছা। ব্যাটার বিয়া দিয়ে আমি কেমন সুখে আছি তাই জানবেক। ফুলমতী আবার তার স্বরে চেঁচায় 'বলি ও ভাল মানুষের ঝিটি, তুর বাপ কি তুর লেগে বছরে দশ কুঁচড়ী ধান পাঠায় যে বস্যে বস্যে খাবি? গরীবের ঘরে খেট্যে খেতে হবেক। গতরটি ত' ডাগর করলে চলবেক নাই। সাত পহর বেলায় ঘুম ভাঙ্গল রাজ কইন্যার। আহা হা, মর্যো যাই মর্যো যাই।'

খাওয়ার আর বাপের সোহাগের খোঁটা সইতে পারে না শশীর বউ। ওর ঘুম ভেঙ্গেছিল অনেকক্ষণ। কিন্তু ফুলমতীর ভয়ে ও বেরোতে পারেনি, এর পরের ভয়াবহ অবস্থাটার কথা অনুমান করে আর বসে থাকতে পারল না। বেশ খানিকটা ঘোমটা টেনে কলসীটা কাঁখে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায় কদম।

'উদিকে যাস কুথায়?'

'ঘাটে'

'তু কি ভাবছিস এখুনও মুরগী ডাকা ভোরই আছে? হারে আমার কপাল।'

কাঁখের কলসীটা দাওয়ার একপাশে নামিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'ইবার কি পুজা করতে হবেক? মা দশভূজার ল্যাথান দাঁড়াই আছিস যে?

আর সহ্য করতে পারে না কানে। দাঁড়িয়ে থাকলেও জ্বালা, ঘাটে গেলেও জ্বালা।

অতিষ্ঠ হয়ে কদম জবাব দেয় 'আমি ত আর অন্তর্যামী লই যে বলার আগে জানতে পারব। কি করতে হবেক বললেই ত হয়'।

হায় মা, এ মেয়ে বলে কি গো? ফুলমতীর চোখ কপালে ওঠে। কি বাড় বেড়েছে। এবার আর শাসন না করলেই নয়। শেষ বয়সে ত বউএর হাত তোলার ওপর নির্ভর করেই ত দিন যাপন করতে হবে কিন্তু এখন থেকে কর্ত্তৃত্ব হারালে কি নিয়ে বেঁচে থাকবে ফুলমতী।

ফুলমতী চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে 'ওরে আমার বউ-সোহাগ্যা পুত, বউএর মুখটি সামাল দে।

শশীকমল বউএর দিকে তেড়ে যায়। থাম বে, থাম বে মাগী, মাঈএর মুখের উপরে চোপা। ব্যাঁতটি ভেঙ্গে দিব।

তাই দাও। অভিমানে কদমের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।

ফুলমতীর মুখ ক্ষুরধার ছুরীর মত। 'রাজার বিটটির ঢং দেখ। তাও যদি না বাঁজা হতিস। একটি ছেল্যা ধুনাবার ত আকেল নাই।'

এই খানেই সব চেয়ে বড় দুর্বলতা কদমের। কদম নিঃসন্তান। বারো বছর বিয়ে হয়েছে ওদের। এই খোঁটাটা শশীকমলকেও সমান বিদ্ধ করে। কিন্তু ও গায়ে মাখে না। নেশাখোর মানুষ। নেশার খোয়ারী ভাঙ্গবার আগেই আবার নতুন করে নেশা করে ও। অতশত ভাববার সময় কোথায়।

কদমের চোখের জল আর বাধা মানে না। শেষ পর্য্যন্ত শশীকমলও ওকে গঞ্জনা দিচ্ছে। স্বামি, যার কর্ত্তব্য অন্ন দিয়ে স্ত্রীর প্রতিপালন করা। বস্ত্র দিয়ে তার লজ্জা নিবারণ করা, সেও আজ কদমের মিথ্যে অপবাদ আড়াল কয়বার জন্য এগিয়ে এল না। এর চেয়ে লজ্জার আর কি আছে।

অবশ্য ঘুম থেকে উঠতে আজ সত্যিই দেরী হয়েছে কদমের। কিন্তু সেকি তার দোষ? রাত দুপুরে নেশাখোর লোকটা ইনিয়ে বিনীয়ে সোহাগ জানাতে লাগল। তাকে তো আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাকে তো বলা যায় না যে রাত হ'য়েছে। আর জ্বালিও না এবার ঘুমোও। আর রাত্রিতে সত্যি সত্যি তো আর পুকুরে যায়নি কদম। ওটা শশীর বানানো কথা। কদমের সুস্থ সমর্থ শরীর। রাত দুপুরে পুকুরে যাবে কেন?

কদম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

ফুলমতী তবুও নির্দ্দয়। 'কাঁদ! খুব কাঁদ! কেঁদে কেঁদে পাড়া পিতিবাসীদের জানান দে যে তুর শাউড়ী তুকে কত কষ্ট দেয়। কিন্তুক উপরে ভগবান আছেন, ইয়ার পিতিফল তু পাবি-পাবি-পাবি।'

'ফুলমতী আঙ্গুল মটকায়। শশীকমল মৌজ করে সবে একটা দম চড়িয়েছিল। বেমক্কা মৌতাতটা কেটে গেল ফুলমতীর চিৎকারে। কদমের ওপর ভারী রাগ হ'ল শশীকমলের। ভর সকালে কিযে ল্যাঠা লাগালি মায়ে-বউএ। তুরা থামবি না দুজনকেই দুয়ার সিনি পার করে দিয়ে আসব?

ফুলমতী কথাটা গায়ে মাখে না। কিন্তু কদমের চোখের সামনে যেন একরাশ আঁধার নেমে আসে। যে লোকটা মাত্র কাল রাতে

ইনিয়ে বিনিয়ে অত আদর করেছে, আজ সে লোকটা কত অবলীলা ক্রমে বলল যে মা-বউকে গ্রামছাড়া করবে। হায় হায় রে, দুনিয়ায় কেউ কারো নয়। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কদম বলে 'বেশ, ই জীবন আর আমি রাখব নাই।'

ভারী ভারী পা ফেলে কদম গোলা ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। যত সব ছেনালী। শশী ভাবে মনে মনে। তারপর কল্কেতে ফুঁ দেয়।

ফুলমতী কিন্তু মনে মনে ভয় পায়। ইতিউতি তাকায়। তারপর গোলঘরের দিকে যায়। ফিরে এসে শশীকে বলে 'বাপ শশী বহুটি যে গোলা ঘরে ঢুকে 'হুড়কা' দিয়েছেন।'

'ত হইছে টা কি। ভুখ লাগলেই বাইরাবেক।' শশী ঝাঁকিয়ে ওঠে।

'যদি গোসার বশে কিছু করো ফেলেন।'

'তাহল্যে ত ল্যাঠা চুকে যায়' কণ্ঠে রাগের সুর এনে শশীকমল বলে 'এখুন যা, চিল্লল্যাস না কানের কাছে।'

শশীকমলের চোখ দুটো কৌতুকে নৃত্য করে। ফুলমতী ভয় পেয়েছে। কিন্তু শশীকমল ভালো করেই চেনে কদমকে।

জীবনের ওপর কদমের অসীম মমত্ব। কদম সুখ চায়। সমৃদ্ধি চায়। কদমের চোখে অনেক স্বপ্ন হৃদয়ে অনেক আকাঙ্খা। গোলা ভরা ফসল। আঘন মাসে পাকা ধানের সুবাস। ঘর আলো করা পুত। মুহুর্ত্তে যেন নেশাটা খান খান হ'য়ে যায় শশীর।

কদমের ন্যূনতম আকাঙ্খা একটি সন্তান। শশীকমলের মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হ'য়ে যায়। এই বঞ্চনা আর কতদিন চলবে? আর কতদিন শশীকমল এই ভাবে—

কিন্তু না। কদম বাঁচুক। ওর সব স্বপ্ন, সব আকাঙ্খাকে বুকের মধ্যে নিয়ে কদম বেঁচে থাক।

সব আকাঙ্খা যদি জীবনে কোনদিনই পূর্ণ না হয়। যদি সব স্বপ্ন

সত্যতায় সম্ভব না হয়, তবু কদম বেঁচে থাক কল্পনায় স্বর্গের ইন্দ্রানী হ'য়ে।

ফুলমতীর ডাকে ঘোর কেটে যায় শশীকমলের।

'এ বাপ, একটুকুন দেখ কেনে, বহুটি হুড়কা খুলছেন নাই। গোলা ঘরের আঙ্গাটি মাথা ছুয়া লীচ। আর কিছু না থাক পরনের শাড়ীটা ত আছেন।'

ঈঙ্গীতটা হ'চ্ছে, যদি গলায় দড়ি দেয়।

ফুলমতীর এই ভয়টা রসিয়ে রসিয়ে আস্বাদন করে শশীকমল। তারপর কল্কেটা পেড়ে যত্ন করে দাওয়ার এককোনায় রেখে গোলাঘরের দিকে এগোয়। গোলাঘরের দরজা বন্ধ। দরজায় কান পেতে শোনে শশী।

একটা ফোঁপানীর আওয়াজ শোনা যায়। কদম কাঁদছে। গলাটা যতদূর সম্ভব ভারী করে শশী হাঁক দেয়, এই মাগী দরজা খুল।'

ভেতর থেকে কোন আওয়াজ শোনা যায় না। শুধু ফোঁপানীর শব্দটা বেড়ে যায়।

'খুল বলছি' শশীর কণ্ঠে শাসনের আভাস। 'মানে মানে হুয়ারটি না খুললে হুয়ার ভেঙ্গ্যে ঘরে ঢুকব। আর আমার দেড়কুড়ি টাকার হুয়ার ভাঙ্গল্যে তুর গতরটিও আস্ত রাখব নাই।

দরজা খুলে যায়। ভেতরে ঢুকে আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দেয় শশী। তারপর কদমের মুখটা নিজের বুকের কাছে নিয়ে আসে। কোঁচার খুঁট দিয়ে ওর চোখহুটো মুছে দেয়। কদম আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

কদমের মুখটা বুকের ওপর চেপে ধরে শশী বলে 'উটি আমার মুখের কথা। অন্তরের কথা লয় বউ। মাঈএর কাছে উরকম না বললে আরও হেনস্থা ছিল তুর কপালে।'

'আমার কপালে চেরকালই হেনস্থা। কাকেও সুখ দিতে লারলাম ; না সোয়ামিকে না শাউড়ীকে। কিন্তুক একটি সন্তান? সে কি আমার দোষ।'

শশীকমলের বুকটা ধক করে ওঠে। একটা অপরাধ বোধ পীড়া দেয় শশীকমলকে। একটা মিথ্যে আশা দিয়ে শশীকমল ভুলিয়ে রেখেছে কদমকে। কিন্তু কতদিন আর চলবে এই মিথ্যার মালা গাঁথা।

'কবে তুমার মানত শোধ হবেক দেবতার কাছে? আমি যে আর পারছি নাই।'

প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করে শশী। উকথা এখন থাক 'শশী বলে' মায়ের কাছে তুকে অকথা-কুকথা বলি তু দুঃখ করিস না কদম। তুকে ভাল রাখবার লেগেই বলি।

ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার গোড়ায় আবার সুরু হ'ল ফুলমতীর সোচ্চার বিলাপ। ফুলমতী প্রথমে ভেবেছিল বুঝি বেয়াড়া বউকে শাসন করছে শশী। তারপর, অনেকক্ষন পরে দুজনার কাউকেই না বেরুতে দেখে সন্দেহ হল ফুলমতীর। দরজায় কান পেতে নিশ্চিত হ'ল ফুলমতী। না শাসন নয়। সোহাগ হচ্ছে।

ফুলমতী দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে 'কুলীর লোক্ দেখ্যে যাক আমি কি সুখে আছি। বেটা বহুতে মিলে ষড়যন্ত্র করছে গো। এমন বউ সোহাগা ব্যাটা যেন কারও না হয়।'

শশীকমল ঝটিতি বাইরে আসে। তটস্থ হয়ে বলে 'হেই মা গো, দোহাই তুর, চুপ দে মা।'

'চুপ দিব কিসের লেগে? কারও খাই না পরি? কুলীর লোক সুনুক। ফুলমতী আবার নতুন করে সুরু করতে যাচ্ছিল। এমন সময় কুলীর দিকে তাকিয়ে আশার আলো দেখতে পেল শশী। মাতব্বর হেঁটে যাচ্ছে মাঝ কুলীর দিকে।

শশী তারস্বরে চীৎকার করে ডাকে 'মাতব্বর খুড়া, হেই ব মাতব্বর খুড়া!

ঈশ্বরী থামে। পিছু ফিরে বলে 'কিরে ডাকছিস কেনে?'

'একটা কথার মীমাংসা কর্যে দিয়ে যাও ব'। নিত্যিদিন কলহ ক্যাচক্যাচি ভাল লাগে না।

ফুলমতী সমীহ করে ঈশ্বরীকে। ঈশ্বরী দাওয়ায় উঠতেই মাচুলী দেয় বসতে। ঘোমটা টেনে নিজে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকে।

'কি বেত্তান্ত?' মাতব্বর শুধোয়।

'মা বহুর কলহটি তুমি মেটাও দেখি ব'। আমি লারছি।'

'কি হইছে?'

'বউএর সন্তান হয় নাই বল্যে মা উয়াকে খোঁটা দিছে। আর বউএর ও 'অসঠা' দেখ দিকিনি, শাউড়ী হল গুরুজন, উয়ার মুখের উপর কথা?'

'ইটি তুমাদের দুজনারই অন্যায়' মাতব্বর বলে 'তুমি সন্তান হয় নাই বল্যে বউটাকে খোঁটা দিওনা শশীর মা, সন্তান ভগবানের দান খোঁটা দিলে ভগমানকে অপমান করা হয়। আর বহু, শাউড়ী গুরুজন। শাউড়ীর মুখের উপর কথা বল্য না।'

কদম পায়ের আঙ্গুল দিয়ে মাটী খোঁড়ে।

ঘোমটার আড়াল থেকে ফুলমতী বলে 'ছেল্যার আমি আবার বিয়া দিব।'

মাতব্বর মুচকি হেসে বলে 'দশের মজলীশ অনুমতি দিবেক নাই।

'তাহল্যে ই বাঁজা বউ লিয়ে আমি কি করব?'

'ঘর করবে। বউ লিয়ে লোকে কি করে? আর বাঁজা বলে বউকে হেনস্থা করছ কেনে? কে বলতে পারে তুমার ছেল্যাটি বাঁজা লয়? তার চেয়ে ওঝা টোঝা দেখাও। আমাদের গাঁয়েও ত একজন লতুন সন্ন্যাসী এসেছে। দেখ তার কাছে যেয়ে, যদি মাদুলী তাবিজ দেয়।'

কদম ও ফুলমতী দুজনার মুখই আনন্দে উজ্জ্বল হয়। শুধু কোন অজ্ঞাত কারণে শশীকমল মিইয়ে যায়।

তবু, শশী কমলের মনে হয় যাক, আপাতত: ঝামেলা চুকল। তারপর ঝামেলা তো লেগেই আছে সারা জীবন। সংসার মানেই ঝামেলা। দেখা যাক নতুন সন্ন্যাসীর আখড়ায় একছিলিম দম দেওয়া যায় কি না।

কে যায় ?

পদ্ম।

কোন পদ্ম ?

জল পদ্ম নয়। স্থলপদ্ম নয়। মাতব্বরের গরবিনী মেয়ে। কিন্তু জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় না। হেঁট কুলী, উপর কুলী বা মাঝকুলীতেও চোখ বুজে ঠাহর করা যায়। পদ্মর সুবাস যেমন অন্ধকেও পুকুরের নিশানা বলে দেয়।

পদ্ম যেন আগুনের শিখা। দপদপ করে জ্বলে। দূর থেকে ওর তাত লাগে। ওর ভারী ভারী পায়ের দাপে আর পাঁইজরের ঝমঝমানীতে মরদদের বুক চিরে শুধু দীর্ঘশ্বাস ঝরে। কাছে যাবার সাহস নেই কারো। পুড়ে যাওয়ার ভয়। ওরা আক্ষেপ করে। হায় গো, রূপবতী কারও ঘরনী হলেক নাই।

হেঁটকুলীর নটবরের ছেলে চম্পাই একবার গাঁয়ের কারো কারো নামে গান বেঁধেছিল। ঈশ্বরী, শশীকমল, কিষুণ এমন কি ওর বাপ নটবরের নামেও গান বেঁধেছিল। পদ্মর নামেও ছিল এক কলি। 'মকর পরবে, পদ্মর পা পড়ে না গরবে।'

কেউ রাগ-রোষ করেনি কারণ মকর পরবের দিনটা রঙ্গরসের দিন।

সত্যি, গরবেই মাটীতে পা পড়ে না পদ্মর। কিন্তু কিসের এই গরব ? কি আছে পদ্মর ? মাতব্বরের মেয়ে বলে ? না। রূপ ? তা অবশ্য পদ্মর আছে। পদ্ম শ্যামলী। গায়ের রং কালো জামের মত চিকন কালো। দীর্ঘ সুঠাম দেহ। বুকের সীমান্তে হাঁসুলীটা চিকচিক করে। রূপোর বিছে কাঁকালটা আঁকড়ে থাকে। সারা দেহে যেন মরনের হাতছানি। সর্বনাশের ডাক। কিন্তু রূপই পদ্মর একমাত্র অহঙ্কার নয়। আঠাশ বছর বয়সেও পদ্ম অনূঢ়া। আঠাশটি তাজা ফুলের ডালি সাজিয়ে পথ চলে পদ্ম। এই তার অহঙ্কার। কিন্তু কেন ? পদ্মর জীবনে কি কোন জ্বালা নেই ? যন্ত্রনা নেই যৌবনের ?

একসময় তিয়াসির যুবকদের কাছে এটা বাস্তবিকই কৌতুহলের কারণ ছিল। অনেকে অসীম আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেছে। কিন্তু পদ্ম নিষ্ঠুর ভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের।

ধিকৃত পৌরুষ নিয়ে তারাই রটনা করেছে, পদ্ম গরবিনী, পদ্ম অহঙ্কারী।

কিসের জন্য পদ্মর এই পুরুষ বিদ্বেষ তা কেউ জানে না। পদ্মই কি জানে?

ভোরের আলো ফুটেছে সবে। ভারী ভারী পা ফেলে মাঝকুলী দিয়ে পথ হাঁটে পদ্ম। পদ্মর মাথায় একটা গামছা বাঁধা পুঁটুলী, মাথার সেই দেখন শোভা বোঝাটা যেন পদ্মর শরীরকে আরও উদ্ধত করে তুলেছে। হাঁটার ছন্দে ছন্দে তরঙ্গিত হয় কূল ছাপানো যৌবন।

কালিন্দী সায়র থেকে জল নিয়ে ফিরছিল ভোমর বউ। পথে পদ্মর সঙ্গে দেখা। ভোমর বউ ভিন গাঁয়ের মেয়ে। এই গাঁয়ে বিয়ে হ'য়েছে ওর। ভোমর বউএর সঙ্গে পদ্মর বিশেষ অন্তরঙ্গতা। এ গাঁয়ে যারা পদ্মর শৈশব কৈশোরের সাথী তারা কেউই আর কুমারী নেই। কেউ কেউ বিয়ের পর ভিন গাঁয়ে গেছে শ্বশুর ঘর করতে। যাদের গাঁয়েই বিয়ে হয়েছে তারাও যে যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। সে মন ও নেই সে মেজাজও নেই।

ভোমর বউ একটি ব্যতিক্রম। ওর সংসারে অভাব অনটন নিত্য-নৈমিত্তিক। স্বামী মাসের মধ্যে পনের দিন নানা ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। ছেলে-মেয়ে গুটি কয়েক। কিন্তু তারই মধ্যে কি এক অপূর্ব কৌশলে চটুল মনটাকে এখনও ধ'রে রেখেছে ভোমর বউ। ওকে দেখে মনে হয় না ওর কোন দুঃখ আছে। কোন অভিযোগ আছে। পদ্মকে দেখে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল ভোমর বউ। ওর ভিজে কাপড় বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কাঁখে জলভরা কলসী।

পদ্মকে দেখে সকৌতুকে শুধোয় ভোমর বউ, বিহানে কুথা যাস পদ্ম?

পদ্ম গম্ভীর মুখে জবাব দেয় 'যমের বাড়ী।'

"যমের বাড়ী ত' দক্ষিণে। তুই যাস উত্তরে। উত্তরে শিবের ঘর। বুড়ী বয়সে শিব পেলি নাকি?'

'আমি বুড়ী হই কুন দুঃখে। বুড়ী ত তুমি।' ভোমর বউ সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয়। 'তা ঠিক। পাঁচ পুত্তুরের জননী। শিব বল আর ভূত বল, যা কপালে ছিল পেয়েছি। তুর সুয্যি যে পশ্চিমে।'

'তুমার সঙ্গে কথায় পারা যায়! পথ ছাড়! কাজ আছে।'

'কাজ ত' থাকারই কথা, জুয়ান বয়সে আমাদেরও অনেক কাজ থাকত গো।'

'এখন আর জুয়ান নাই? তুমি যে আমারই বয়সি।'

ভোমর বউ জিভ কাটে। 'ছিঃ ছিঃ পদ্ম। তাই কি হয়। তুর চেয়ে আমি অনেক বড়। আমি পাঁচপুত্তুরের জননী। আর কমাস পরে আর একটা পুত্তুরের লেগে আঁতুড়ে ঢুকব। বয়স যাই হোক পদ্ম, যতদিন বিয়া না হয় ততদিনই জুয়ান।'

'বিয়া করেত তুমি ঠকেছ বউ।'

'কে বললেক? বিয়ার অনেক জ্বালা, কিন্তুক অনেক আনন্দ। আমি ত শুধু তুর দাদার ছেল্যার মা লই। উয়ার বউ। ই কথাটি তু বুঝতে লারবি পদ্ম।'

'থাক। কাজ নাই বুঝে। পথ ছাড়।'

ভোমর বউ পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। তারপর বলে 'আজ সাঁঝের বেলায় জলকে যাবি পদ্ম, অনেক কথা আছে।'

'দেখি' পদ্ম যেতে যেতে উত্তর দেয়। তারপর দুজন দুদিকে চলে যায়।

ভোমর বউএর সঙ্গে গল্পে গল্পে অনেক দেরী হ'য়ে গেল। বেলা বাড়ছে ক্রমশঃ। ওর বাপ ব'লেছিল ভোরের বেলাতেই সিধেটা পৌছে দিতে। কাল দেড় পহর রাতে এসে পৌচেছে লোকটা। তারপর খেয়েছে কি খায়নি।

যজ্ঞডুমুরের তলায় যখন পৌছাল পদ্ম, সূর্য্য তখন বুড়োবুড়ী পাহাড়ের ফাঁকে উঁকি মারছে। ভীড় জমেনি তখনও। সন্ন্যাসী পিছন ফিরে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। পদ্ম সন্ন্যাসীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

তারপর একটু শব্দ করেই সিধেটা নামাল। চমকে পিছনে ফিরে তাকাল সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী পদ্মর চোখে চোখ রেখে তাকাল।

পদ্মর হঠাৎ মনে হ্‌ল ও যেন অতল অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। কে যেন অনেক দূর থেকে পদ্মর নাম ধরে ডাকছে। একটা বিশাল মাঠ। পদ্ম যেন ছুটতে ছুটতেও তার নাগাল পাছে না। তারপর অনেক ক্লান্তিতে পদ্ম যেন ক্রমশ একটা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগল।

প্রথম দিনই একি বিপত্তি। সন্ন্যাসী ভাবল। তারপরে পদ্মকে সুস্থ করে তোলার পালা। যজ্ঞডুমুরের তলায় তখন কৌতূহলী জনতার ভীড় জমতে আরম্ভ করেছে। তারপর সুস্থ হওয়ার পর পদ্ম যখন দুর্বার লজ্জায় কোন দিকে দৃক্ পাত না করে চকিত হরিনীর মত যজ্ঞডুমুরের তলা ছেড়ে গাঁয়ের দিকে চলে গেল তখন সন্ন্যাসী পরম আত্মীয়ের মত গাঁয়ের মানুষ জনকে কাছে ডাকল।

ওর নাম কিস্নুন। অবিন্যস্ত চুলে জটা বেঁধেছে। চোখ দুটো উদাস। কোন ভাষা নেই সে চোখে। মলীন বেশ ভূষা। মাঝে মাঝে অকারনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আলাপ একটু জমে উঠতেই কিস্নুন পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে 'দুটি ভাবের কথা শুনাও সন্ন্যাসী'।

কিস্নুনকে গাঁয়ের লোকে বলে রস খ্যাপা। ওর সাম্প্রতিক নাম জটাধারী কিস্নুন। কিস্নুনের স্ত্রী, এই গাঁয়েরই মেয়ে। নাম তার মালতী, মাত্র ছমাস আগে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছে। তাই কিস্নুনের এই পরিবর্ত্তন। কিস্নুন জটা রেখেছে। নিরামীষ খায়। এগুলো বৈরাগ্যের নিদর্শন। অবশ্য এখন ও গেরুয়া নেয় নি। কিছুটা গৃহস্থ, কিছুটা সন্ন্যাসী ভাব। কিস্নুনের ভাব-সাব দেখে সবাই বলে ওগুলো রসের তড়পানী।

কিস্নুনের হাত থেকে পা দুটো ছাড়িয়ে সন্ন্যাসী বলে 'পৃথিবীটাই যে অভাবের কিস্নুন। অভাবের সংসারে কি কেউ ভাব ধার দেয়? ভাব ও নিজের, অভাব ও নিজের।'

কিস্নুন কিছু বোঝে না। গদ গদ হ'য়ে বলে 'আহা। আহা হা।'

ছিলিমে কষে একটান দিয়ে শশীকমল বলে 'কিস্নুন যে এখুন ভাবের সাগরে ডুব দিয়েছে সন্ন্যাসী।'

'কেনে ? বউটি মারা পড়্যেছেন বল্যে ?'

কিস্নুন চমকায়। 'তুমি কি করে জানলে ?'

'তুমাদের মনের অঙ্গে যে আমার বিনি সুতোর যোগ আছে হে। তাই ত' কথা গুলিন জানলম। তুমাদের ত' ভালবাসা কর্যে বিয়া হয়্যেছিল ?'

ঠিক কথা। কিস্নুন বিস্মিত হয়। কিন্তু সে কথা সন্ন্যাসি জানল কি করে? এই তো গত রাতে এসেছে। তাহলে কি গাঁয়ের সবাই কার খবরা খবর নিয়ে এসেছে? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব। কিস্নুনের মনটা আকুলী বিকুলী করে।

আবার সন্ন্যাসীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে কিস্নুন। 'তুমি ভগমান। অন্তর্যামি। আমি পাপী, আমাকে উদ্ধার কর।'

সন্ন্যাসি সঙ্কোচের সঙ্গে বলে 'আহা-হা-ই কি কর কিস্নুন। আমার পাপ লাগবেক হে।'

নেশাটা সবে জমে এসেছে এমন সময়ে এই সব অবিশ্বাস্য প্রসঙ্গ। ঘোর ঘোর চোখে শশীকমল বলে 'সন্নাসী, তুমি ভুত না ভগমান ?

সন্ন্যাসী হাসি মুখে শুধোয় 'কেনে' ?

'যে অ-সম্ভব কাজ করতে পারে সে বেটা হয় ভগমান, না হয় ভুত। তুমি কে ?'

'আমি মানুষ' সন্ন্যাসী জবাব দেয়।

হেসে গড়িয়ে পড়ে শশী কমল। 'ইটি একটি ডাগর মিছা কথা বললে সন্ন্যাসী। আমি ভগমান ই কথাটি বরং বলা যায়, কিন্তুক আমি মানুষ ই কথাটি, বলা যায় না। মানুষ হওয়া কি এত সহজ ? তুমি যে মানুষ তার পমাণ কি ? পাট্টা-কবুলিয়ত আছে ?'

সন্ন্যাসী বিব্রত বোধ করে। নেশাখোর মানুষকে বোঝানো দায়। নগাই শুধু কোন কথা বলে না। অন্তহীন বিস্ময় নিয়ে বিমুগ্ধ চোখে

তাকিয়ে থাকে। অবাক হ'য়ে ওদের কথা শোনে। যেমন অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে ও শহরে প্রথম রেল গাড়ী দেখেছিল, বা কলের গান শুনেছিল।

'দেবতা হওয়া কঠিন লয় সন্ন্যাসী, কিন্তুক মানুষ হওয়া বেতাক কঠিন।' শশী কমলের চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু। এবার নগাই শশী কমলের দিকে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। শশী ও এত জানে? শশী কমলের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় নগাই এর।

পৃথিবীতে একদল মানুষ আছে যারা সব কিছুতেই আশ্চর্য্য হয়। সুর্য্যের বর্ণালী, পাখীর ডাক বা ভোরের শিশির। সব কিছুতেই তারা বিস্ময়ের খোরাক খুঁজে পায়, নগাই সেই দলের।

স্ত্রী গত হওয়ার পর পৃথিবীর সার সত্যটি স্পষ্ট হ'য়েছে কিস্নুনের কাছে। সংসার অসার। মানুষ পৃথিবীতে এসেছে মুসাফিরের মত। দুদিন বাদেই আবার সব মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হবে। প্রয়োজন শুধু পথ আর পথের দিশারীর। সন্ন্যাসীকে দেখে কিস্নুনের মনে হয় এই তার পথের দিশারী। এতএব সন্ন্যাসীর চরণ আকড়ে পড়ে থাকারই সিদ্ধান্ত নেয় সে অবশেষে।

এদের মধ্যে বেজ বা ব্রজবিহারী একটু বেশি সংসারী। বলতে গেলে সংসারী হয়েই ও জন্মেছে। বাল্যকালটা স্বভাবতঃ ই নিশ্চিন্ত আরামের সময়। নানা আনন্দ ও বৈচিত্রে গা ভাসিয়ে দেওয়ার সময়। কিন্তু বেজ তখনও সংসারী। ওর বয়সি ছেলেরা যখন মোষের পিঠে শুয়ে তার স্বরে ঝুমুর গাইছে ও তখন একটা নিম কাঠের গুঁড়ি চেঁছে লাঙ্গল তৈরী করছে। বকুলনগরের হাটে বেচলে পয়সা হবে। তাই আজ স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে একটি পরিতৃপ্ত সংসারের অধিকারী বেজ। ওর মেয়ে প্রথম পোয়াতি। তার সুপ্রসবের জন্য কোন শেকড় বাকড়।

'নাহে। কুন ওষুধ-বিসুধ শেকড়-বাকড় আমার জানা নাই। ভগমানের নাম করি আর পথে পথে ঘুরে বেড়াই। ওষুধ পাব কুথা থেকে?'

প্রত্যয় হয় না বেজর। কেনে ছলনা করছ সন্ন্যাসী। দাও না কেনে কুন শেকড়-বাকড়।

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বলে 'পেত্যয় কর ভাই বেজ। কুন শেকড় বাকড় আমার কাছে নাই। তুমার কন্যার লেগে আমি ঠাকুরের কাছে পার্থনা করব। সব ঠিক হয়্যে যাবেন। তুমি লিভাবনায় ঘর যাও।'

সন্ন্যাসীর কথায় মনে জোর পায় বেজ। সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলো মাথায় নেয়। সুর্য্যি তখন যজ্ঞডুমুরের মাথায়। চৈত্রের রোদ্রের তাত লাগছে গায়ে। শশী কমল ভাম হয়ে বসেছিল। হঠাৎ আলটপকা জিগ্যেস করে 'কিন্তুক মেয়্যাটি মুচ্ছা গেলেন কেনে?'

'কে?'

'পদ্ম, মাতব্বরের বিটি।'

জিজ্ঞাসাটা সবাইকে কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল করে তোলে। অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা যায়। পদ্ম। পদ্ম। পদ্ম।

তারপর সবাই ভুলে যায় কথাটা।

তিয়াসির দুটো পাড়া। ওরা বলে কুলী। উপর কুলী আর হেঁট কুলী। মাঝ কুলী নাম আছে বটে তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই। সে কেবল হেঁট কুলী আর উপর কুলীকে চিহ্নিত করার জন্য। মাঝ কুলীতে বাবার থান। ওখানে পূজো হয় শিবের। গাজনও হয়। আর হয় দেশের দশ জনের মজলীস। গাঁয়ে দশজন মুরুব্বি লোক গাঁয়ের কোন দুরুহ সমস্যার মিমাংসা করে, অথবা কোন গুরুতর সামাজিক অপরাধের বিচার করে বা কোন উন্নতিমূলক পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেয়। বাবার থানটি একটি ছায়াঘন অশ্বত্থ গাছের পাদমূলে। ভাল ক'রে নিকোন। পরিস্কার তক তক ক'রছে। এটি গ্রামদেবতা বা সিনি ঠাকুরের থানও বটে। তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত রাশি রাশি পোড়ামাটীর হাতী ঘোড়া এক কোণে জড় করা। দু পাড়ারই মাতব্বর ঈশ্বরী। দু পাড়াতে রেশারেশির অভাব নেই। তবে এর থেকে কোন গুরুতর কলহের সূচনা করে না। উপর কুলীর কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর কথা নিয়ে হেঁট কুলীর লোকেরা ছড়া বাঁধে। আবার হেঁট কুলীর কোন ঘটনা নিয়ে উপর কুলীর লোকেরা ঝুমুর গায়,

কাপের দল বার করে। এই আনন্দ উৎসব দুপাড়ার লোকেরাই প্রাণ ভরে উপভোগ করে। উপর কুলী আর হেঁট কুলীর মাঝ দিয়ে রাস্তা। গ্রামের যেখানে শেষ, বুড়োবুড়ি পাহাড়ের লাগাও কালো কালো বিশাল পাথরের চাঙ্গড়গুলোরও প্রায় সেখান থেকেই শুরু। একটার পর একটা। এই দীগন্তবিসারী পাথরের তরঙ্গ দেখে মনে হয় যেন স্নেহময় মা বাপের কোলে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে আছে গুটি কয়েক সন্তান।

তিয়াসির মাতব্বরের মাথায় অনেক চিন্তা। কাঁধের ওপর অনেক দায়ীত্ব। তার ওপর 'লতুন কুটুম্ব' এসেছেন গাঁয়ে। যে সে কুটুম্ব নয়, অত্যন্ত মানী কুটুম্ব। সন্ন্যাসী। সংসার ছাড়া বিবাগী। ভগবানের 'কেরপা' পেয়েছেন।

ঈশ্বরী আর নীলকণ্ঠ পথ হাঁটছিল। ঈশ্বরী নীলকণ্ঠকে সর্বদা সাথে রাখে। ছেলেটার মাথা ভারী সাফ। হাজার হোক, ইস্কুলে পড়া তো। তবে ভারী গোঁয়ার। ইসস্কুলে পড়া ছেলেদের রোগ আর কি। লঘুগুরু জ্ঞান নেই। 'পবীন'দের খাতির করতে জানে না। লাঙ্গল ধ'রতে কোদাল চালাতে লজ্জা। সেই জন্যেই তো ওর বাপ ওকে ছাড়িয়ে দিল ইসকুল থেকে। কি দরকার। হিতে বেপরীত। 'ইয়ার পর হয়ত আমাকে বাপ বলতে লাজাবেক' বলেছিলে নীলকণ্ঠর বাপ। ওকে হাজার ব'লেও বোঝান যায়নি। এমন কি মাতব্বরও পারেনি। 'না ব' ঈশ্বরী, আমি লারব। উ যখন মাটীকে হেনস্থা কর্‍্যেছে তখন লক্ষ্মীকে হেনস্থা করেছে। সিখেনে সরস্বতীর সেবা করে লায়েক হতেই লারবেক। ঘরেই থাক চাষ বাস দেখুক বরং।'

তা যে যাই বলুক। ছেলেটির মাথাটি খুব সাফ। বেশ পাটোয়ারী বুদ্ধি আছে মাথায়।

নীরবে পথ হাঁটছিল ওরা। মাতব্বরের মাথায় চিন্তাগুলো কিলবিল করছিল। তিয়াষি বাবার থানটি মেরামাত করতে হবে, মনসা-মেলার চালে খড় দিতে হবে। সন্ন্যাসীর জন্য 'পালা সিধার' ব্যবস্থা ক'রতে হবে। একটা কথা বলার জন্য বেশ খানিক ক্ষণ ধরে

উসখুস করছিল নীলকণ্ঠ। শেষে বলেই ফেলে, 'তা হল্যে সন্ন্যাসী ই গেরামেই থাকবেক? কি বল মাতব্বর কাকা?'

'কে জানে বাপ। সন্ন্যাসীদের মতি গতি বুঝতে লারি। পথ উয়াদিকে 'চিরকুন' এর মতন টানে। কবে সেই টানেই বেরাই পড়ে তার কি ঠিক আছে।' মাতব্বর জবাব দেয়। সাধু সন্ন্যাসীদের পথ চলাতেই আনন্দ। কোন জায়গায় স্থিতি হয় না। ডেরা বাঁধতে পাবে না গ্রামে গঞ্জে।

'তবে ই সন্ন্যাসীটি তাদের মতন লহেন।'

'কেনে? তু বুঝলি কি কর‍্যে?' মাতব্বরের কণ্ঠে বিরক্তির আভাস স্পষ্ট।

নীল কণ্ঠ অত্যন্ত চতুর। মাতব্বরের বিরক্তিটা বুঝতে পেরে ঝটিতি নীল কণ্ঠ বলে 'না, না, সে লয়। আমি বলছিলম যে আমাদের গেরামটিকে ইনার বড় ভাল লেগেছে হে। না গেলে নাও যেতে পারেন।'

কথাটা শুনে ঈশ্বরী যেন একটা স্বস্তী অনুভব করে। 'তাহল্যে তো ভালই রে বাপ। গেরামের মঙ্গল হবেক। গেরামে যদি একটি সাধু সন্ন্যাসী থাকে তা হল্যে কত উপকার? রোগ জ্বালা আছে, মহামারী আছে, বাবার কোপ অছে। সে সব থেকে রক্ষা করবেক। উনারাই ত হ'ল্যেন ভগমানের বাহন।'

মাতব্বরের কথা গুলো মার্জিত ও সুসংবদ্ধ না হলেও সত্য, এ কথা নীলুও অনুভব করে। কিন্তু কি যেন একটা অজানিত সন্দেহ মনটাকে খোঁচা দেয়। এ বোধ হয় ওর ইসকুলে পড়া ঈর্ষাতুর মনটার বিকার। মাঝে মাঝে নীলকণ্ঠরও মনে হয় ওর মনের মধ্যে দুটো মন আছে দুটো মানুষ বাস করছে ওর হৃদয়ে। একজন গ্রামের নীলকণ্ঠ, অপরজন ইস্কুলে পড়া নীলু। এই দুটো মনের প্রায়ই বিবাদ বাধে। মাঝে মাঝে সংঘর্ষটা অত্যন্ত গুরুতর হয়। আবার কখনও কখনও রফাও হয়। ইদানীং দুটো মনই অত্যন্ত শান্ত হ'য়ে প'ড়েছে। সব সময়েই

প্রায় রফা হ'য়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাপার নীলুর ইস্কুলে পড়া মনটা কেমন যেন ভেড়ী লড়াই এর ভেড়ার মত সিং উঁচিয়েই থাকে।

'তবে একটি কাজ কর কেনে মাতব্বর কাকা' নীলু বলে।

ঈশ্বরী সাগ্রহে তাকায়। নীলুর মাথায় অনেক বুদ্ধি।

'সন্ন্যাসীকে ই গেরামে অটক রাখবার একটি ব্যবস্থা কর কেনে?'

'সিটি কি রকম?'

'গেরামের লোকদের কাছে মাগন কর্যে বাবার থানে একটি মন্দির কর্যাই দাও কেনে। সি মন্দিরটির ভার লিবার জন্যে আমরা পার্থনা করব সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে।'

"বা বেটা। বেশ বল্যেছিস। সাবাস। এই না হল্যে ইসকুলে পড়া ছেল্যা।' বাস্তবিকই ঈশ্বরী চমৎকৃত হয়। ভালো কথা বলেছে নীলু। একমাত্র এই বুদ্ধিতেই সন্ন্যাসীকে গ্রামে আটকে রাখা যায়। কিন্তুক সন্ন্যাসী যদি রাজী না হয়?

'হবেক, হবেক সি ব্যবস্থা আমি করব' পরম নিশ্চয়তার সঙ্গে বলে নীলু। আশ্বস্ত হয় ঈশ্বরী। নীলুর ওপরে ওর অগাধ আস্থা।

মাতব্বরকে এই পরামর্শটা দিয়ে নীলুও বেশ খুশিই হয়। যদিও ওর ইসকূলে পড়া মনটা ঠিক সায় দিচ্ছিল না। তবুও নীলু মনটাকে এই বলে বোঝাল যে মাতব্বর তার মূক অবচেতনে ঠিক এইটাই চাইছিল। এবং এই চাওয়াটার কথা অনুমান করেই এই পরামর্শটা দিয়েছে। না দিলেও এই সম্ভাবনাটাকে সফল করে তুলত হয় মাতব্বর, নিজেই অথবা অন্য কেউ। কারণ কারো না কারো মাথায় এ বুদ্ধি খেলবেই, সেখানে এই অনিবার্য্য সম্ভবনাকে সফল করবার জন্য নীলু পরামর্শটা দিয়ে ভালই করেছে। এই কথাতে খানিকটা কৃতিত্ব আর প্রসংসা অর্জন করা গেল। তাছাড়া মাতব্বরের স্নেহ ভাজন হওয়াটাও কম কথা নয়। নীলুর মনের নিভৃত কোটর থেকে দীর্ঘলালিত বাসনাটা হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছিল। নীলু সেটিকে ধুয়ে মুছে পরম যত্নে আবারসেই গোপন কোঠায় রেখে দিল। তারপর সমস্ত রাস্তা শুধু সেই, আনন্দটুকুই তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করতে লাগল। কিন্তু

সেদিন কত দূরে? যতদূরেই হোক তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হ'তে হবে। এখন থেকেই নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে।

হেঁটকুলীর মাঝামাঝি জায়গায় একটা বাজপড়া বহড়া গাছ। যেটার কথা কাল সন্ন্যাসি ব'লেছিল। তার পাশে উমাশশীর ভিটে। আগাছায় ভ'রে গেছে। বোকা ভেঁড়রা আর বন কুটুসের ঝোপ। সাদা, সাদা, নীল নীল ফুল। উঠোনের তুলসি তলাটা এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। কাঁটা ঝোপে ঢেকে গেছে, শুধু কুলুঙ্গীতে প্রদীপের শীষের কালো দাগ এখনও তার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

হেট কুলীতে যখন পৌঁছাল সুর্য্য তখন মাথার উপরে। নটবর সিং এর বাড়ীতে গাজনের ছো নাচের মহড়া চলছিল। বাইরে থেকে শুধু ধামসার আওয়াজ আর তালে তালে ভারী ভারী পা ফেলার শব্দ শোনা যায়।

'গেড়েন্ গেড়েন, গিজতা গেড়েন'

নটবরের ছেলে চম্পাই ধামসা বাজাচ্ছিল। নটবর নির্দেশ দিচ্ছিল। ভুল শুধরে দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। মাতব্বরকে দেখেই ওরা থেমে যায়। ওকে সবাই সমীহ করে। বটব্রেক্ষর মতন মানুষ।

'চলুক, চলুক, এলম যখন, তখন মহড়াটি দেখেই যাই। পালাটি কি হবেক ব?'

পালা অর্থাৎ নৃত্যাভিনয়ের বিষয় বস্তু। সাধারণতঃ রামায়ণ মহাভারতের খণ্ড কাহিনী থেকেই নৃত্যের বিষয় বস্তু সংগ্রহ করে ওরা। তার থেকে তৈরী হয় গান। কখনও বা কথকতা ও। নাচের দৃশ্যগুলো কাহিনী অনুযায়ী সাজিয়ে নেয়।

'ইবারে ভাবছি 'কিরাতার্জ্জুনটি' পালাটি করব হে। গড়-জয়পুরের মধু রায় ইটি বকুল নগরের সাহেবদের কাছে দেখ্যাই নাম কিনেছে খুব।'

'বেশ, বেশ,' মোড়ল খুশি হয় তা, 'আরম্ভ কর দেখি।'

ধামসায় ঘা পড়ে। একদিকে কিরাত বেশী শিব ও অন্যদিকে শিকারী অর্জ্জুনের ভূমিকায় একটি ছেলে তালে তালে নাচছে। সবই

আছে, কেবল ছো নাচের মহড়া, অর্থ্যাৎ মাটীর মুখোশটি নেই। কাজেই মুখে কোন ভাবের প্রকাশ নেই। ওরা গোটা দেহটা দিয়ে ভাবের সামগ্রিক রূপটাকে প্রকাশ করে।

গেড়েন···গেড়েন···ঐক্যতান ও বাজনার বোল আশ্চর্য্য বীরত্ব পূর্ণ। তেমনী নাচের ঋজু ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। রক্তে যেন তুফান তোলে। মোড়লের সামনে ভুল শোধরাবার লোভটা সম্বরণ করতে পারে না নটবর। 'উহুঁ হল নাই, হল নাই, পাটী তালে তালে ফেল হে, ধা গোড়েন, গোড়েন, গিজতা গেড়েন, এক, দুই, তিন, চার······'

যে সে লাচ লয় বাপ। ই হল্যাগে দেবনৃত্য। দেবতাদের যথাথ বোপটি মানুষের কাছে দেখাবার লেগে আমরা মহড়া পরে লাচি।

তারপর নিজেই গান সুরু করে

হের দেখ হে অর্জ্জন-অ
হাতে লয়ে ধনুর্বান-অ
আসিতেছে কোন জন-অ দ্বৈরথ সমরে···

আগে গণেশ বন্দনা। তারপর পালা আরম্ভ। বরাহ অনুসরণ, তারপর বরাহ শীকার, কিরাত বেশী শিবের সঙ্গে অর্জুনের সাক্ষাত, পার্বতীর আবির্ভাব, উভয়ের দ্বন্ধ যুদ্ধ ও পরে আত্ম পরিচয় দান। বেশ নাচে ছেলে দুটি। গোটা শরীরটি নাচের তালে তালে দোলে। মাতব্বরের মনটা দুরে সরে যায়। আবছা হ'য়ে আসে নাচের মুদ্রা, গানের সুর···কামিনী ফুলের গন্ধটাই যেন বার বার ভেসে ভেসে আসে, সেই তুলসি তলায় প্রদীপ···প্রদীপের স্বল্প আলোকে একটি ম্রিয়মাণ মুখ···আবার সেই ব্যথাটা যেন বুকের মধ্যে গুমরে বেড়ায়। কি যে হয় ওর মাঝে মাঝে ঈশ্বরী বুঝতেই পারে না। বিশেষ করে চৈত্র মাসে। যখন বাতাসে ভারী হাওয়ার আমেজ। গাছে গাছে সোনালী মৌ, চূর্ণ পলাশ সমস্ত মাটিটাকে রাঙ্গিয়ে দেয় তখন। কি যেন একটা ব্যথা, কি যেন একটা শুন্যতা মোড়লের মনটাকে তোলপাড় করে তুলতে থাকে। তখন প্রয়োজন হয় লায়া গুনীনের সঙ্গ। না, ঝাড় ফুঁকের জন্য নয়। ওসবে মোড়লের বিশ্বাস নেই। লায়া গুনীন ভাল মহুয়ার

মদ তৈরী করে। তাছাড়া মদ খাওয়ার সঙ্গী হিসেবেও গুনীনের সাহচর্য্য মনোরম। 'মাতব্বর কেমন দেখলে ব' নটবর শুধোয়। অন্যমনস্কতা ভাঙ্গে ঈশ্বরীর 'আহা বিভোর হয়ে গেছলম হে'।

এটি অবশ্য মিছে কথা। কিন্তু মাতব্বরকে 'এই ধরনের মিছে কথা কিছু বলতে হয়। এতে দোষের কিছু নেই। নটবর মনে মনে পুলকিত হয়। নটবর উসখুস করে মাতব্বরের আগমনের কারণ জানতে। সেটা অনুমান করেই বলে ঈশ্বরী "নটবর হে, তুমরা কে জান্ শুন্যেছ, ই গাঁয়ে একজন সন্ন্যাসী অ্যাসেছেন ?'

'হঁ, হঁ, শুন্যেছি বটে।'

'ইনি আপাততঃ এই গেরামেই থাকবেন। ইটি আমাদের গেরামবাসীদের ভাগ্যির কথা।'

এবার আখড়ায় সবাই সময় দেয়। 'ঠিক কথা, হক কথা।'

'কিন্তু সন্ন্যাসী তো লিখাকু বাবা লয়। আহারী বটেন। অবশ্য ভগমানের কেরপায় আমার সংসারে লোকজন কম, আর আহারও কিছু বাড়তি আছেন কিন্তুক ইয়াতে গেরাম বাসীদের সন্ন্যাসি সেবার পুন্যটি ত হবেক নাই। ই জন্যে আমি ঠিক করলম গেরামের সবাই একদিন পালা কর্যে সন্ন্যাসীকে সিধা পাঠাবেক। ইয়াতে গায়ে লাগবেক নাই কারুরই।"

"সন্ন্যাসীর সেবায় কি কারো গায়ে লাগে। সবাই খুশী মনে রাজী হয়। ঠিক হয় হেঁট কুলীর সিধাটা পাঠাবার ব্যবস্থাটা করবে নটবরের ছেলে চম্পাই।

'আরও একটি কথা ছিল ব লটবর। গুরুবারে বাবার থানে একটা মজলীশ হবেক। তু হেঁটকুলীর মুরুব্বিদের লিয়ে আসবি বাপ।'

নটবর ঘাড় নাড়ে। নীলু এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। এবার খানিকটা বিস্মিত হয়। কই মজলীশের কথা তো মাতব্বর আগে বলেনি। এটি বোধ হয় হঠাৎ মনে জেগেছে। মাতব্বরের মনের কথা বোঝা ভার।

'উঠি হে তবে লটবর'

'একটি চুটি ধর‍্যাই লাও। বকুলনগর থেকে তামুক এন্যেছি।' শুকনো শাল পাতায় গুঁড়ো তামাক ভরে মাতব্বরকে চুটি পাকিয়ে দেয় নটবর। চকমকি ঠুকে আগুন ধরায়। তারপর মোড়লের দিকে পিছন ফিরে একটা চুটীকে ও আর নীলকণ্ঠ ভাগাভাগি করে টানে। মোড়ল হ'ল পবীন, বেচক্ষণ লোক।

চুটীটা টানা শেষ হ'লে মোড়ল নীলুকে তাড়া দেয়। 'চল বাপ চল, বেলাটি উতরাই গেল যে।'

বেলা উতরে যাওয়ার জন্য নয়। আসলে মোড়লের ওপর সেই অজানা ভূতটা ভর করেছে। একবার লায়া গুনীনের কাছে যেতে হবে। না ঝাড় ফুঁকের জন্য নয়। গুণীনের কাছে এর অন্য ওষুধ। লায়া গুণীনের আসল নাম হয়ত একদিন ছিল। কিন্তু আজ সেটা হারিয়ে গেছে ওর নানান পরিচয়ের আড়ালে। আসল নামটা হয়ত লায়া গুণীনের নিজেরও মনে নেই। লায়াটা ওর নাম বা পদবী কিছুই নয়। ভূমিজদের পুরোহিতকে বলে লায়া। এই উপাধীটি উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত। সব লায়াই গুণীন নয়। এটি পার্শ্ব জীবীকা। ভিন্ গাঁ থেকে গুণীনের গুনটি আয়ত্ব করেছে ও।

বার মাসে বছর হয়। বারো বছরে যুগ। পদ্মকে লোকে বলে অহঙ্কারী। পদ্ম গুমরী। কিন্তু ওরা পদ্মর দুঃখ বোঝে না। এক ফুলে এক দেবতারই পুজো হয়। পদ্ম তার হৃদয়ের ফুল দিয়ে যে দেবতাকে পূজো করেছে সে পাথরের দেবতা। দিতে জানে না। শুধু নিতেই জানে। কেন যেন সে সব দিনের কথা আজ বড় বেশী মনে প'ড়ছে পদ্মর। আজ আর পদ্মর মনে কোন দ্বিধা নেই। নেই কোন সংশয়। কিন্তু বুকের জ্বালা নেভে কই? স্মৃতির জ্বালা বড় জ্বালা। ওঝা-গুনীনে ও সে জ্বালার ওষুধ জানে না। কিন্তু সে অন্য কথা। অন্য দিনের কথা। আজ সে কথা বার বার মনে পড়ার কারণ আছে বৈকি। শালুক ডুংরীর ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে, বাঁকা পোলের ভাঙ্গা সিঁড়িতে

সালই ডহরের ফাঁকা মাঠে আর হেঁটকুলীর বাজ পড়া বহড়া তলায় সে সব দিনের স্মৃতি গুলো ছড়ানো আছে। ছোট বেলায় বাপের হাত ধ'রে উমাশশীর বাড়ী যেত পদ্ম। উমাশশীর সঙ্গে ওর বাপের কি সম্পর্ক তা তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি পদ্মর কাছে। শুধু লোকের কানা কানিতে একটা অনুমান মনের মধ্যে গুণগুণ করত। পান্নুর সঙ্গে পদ্মর পরিচয় কবে হ'য়েছিল সে কথা পদ্মর মনে নেই। বাপের বড় ন্যাওটা ছিল পদ্ম। পদ্মর মা মারা যাওয়ার পর আর বিয়ে করেনি ঈশ্বরী। যদিও বিয়ে করার বয়স তার পার হয়ে যায়নি। তাছাড়া পুরুষের আবার বয়স কি? মহাদেবের কি কম বয়স। তা সত্ত্বেও পার্ব্বতীর সঙ্গে কি বিয়ে হয়নি? উমাশশীর বাড়ীতে এনে পদ্মকে ছেড়ে দিত ঈশ্বরী। উমাশশী বলত 'আহা, দেখ দেখি মাতব্বর, কেমুন মানায় দুটিতে'

ঈশ্বরী জবাব দিত না। আপন মনে দাওয়ায় হেলান দিয়ে চুটী টানত আর ঘরের মুধন টার দিকে ধোঁয়া ছাড়ত।

পান্নু একান্তে টেনে নিয়ে যেত পদ্মকে। 'শুনলি পদ্ম, মা বুলছে কেমন মানায় আমাদিকে।'

'হি হি হি' পদ্ম হাসত। 'গোবর গাদায় পদ্ম ফুল।'

পান্নু আহত হয়। কেম সে কি অসুন্দর? গুম হ'য়ে বসে থাকে পান্নু। পদ্ম বাঁকা চোখে একবার দেখে, তার পর ফিক্ করে হেসে বাঁকাপোলের আসে পাশে প্রজাপতির পিছেনে ছুটে বেড়ায়। পান্নু চুপ করে ব'সে থাকে। প্রজাপতিটা ধরতে পারে না পদ্ম। পান্নু ভাবে এও যেন প্রজাপতির পিছনে মিথ্যে ছুটে বেড়ানো। পদ্মর মনের নাগাল পায় না পান্নু। হয়রান হ'য়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে পদ্ম এসে বসে পান্নুর পাশে। আড় চোখে একাবার পান্নুর মুখের দিকে তাকায়, তারপর অনেক্ষনে পর একটা চোর কাঁঠার শীষ চিবুতে থাকে। পান্নু একসময় উঠে যায়। পদ্ম দেখে, কিছু বলে না। পান্নু একবার দেখে আর এগিয়ে যায়। একটা মহুয়া গাছের তলায় এসে হঠাৎ পা ধরে বসে পড়ে পান্নু। 'কি হল?' পদ্ম ছুটে আসে।

'হোঁচট খেয়েছি পাথরে।' পান্নু জবাব দেয়। রক্ত পড়ছে ওর পা কেটে।

'গোঁসাইয়ের গোসা দেখে বাঁচিনা।' পদ্ম বলে 'এখন থাক খোঁড়া হয়্যে।' পদ্মর চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠে। 'তুমি কি গো, তামাসা বুঝ না? তামাসা কর্য়ে যি কথাটি বল্লম সিটি কি আমার অন্তরের কথা?' পদ্মর চোখ রেয়ে দু ফোঁটা জল পান্নুর পায়ের উপর পড়ে।

'তুই কাঁদিস না পদ্ম, তুই কাঁদিস না। তোর চোখে জল আমি দেখতে লারি।'

পদ্ম জবাব দেয় না। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়। 'দাঁড়াও খানিক দুব্বা ঘাস আনি। রক্ত পড়া বন্ধ হয়্যে যাবেক এক টকে।'

পদ্ম বাঁকা পোলের নীচে দুব্বা ঘাস খুঁজতে চলে যায়।

পান্নু ভাবে পদ্মর মনের সাগরে ডুব দিয়ে তল খুঁজে পাওয়া যায় না। হায়রে মে'য়্যা মানুষের মন।

পদ্ম চিবিয়ে চিবিয়ে কচি কচি দুর্ব্বা ঘাস পান্নুর পায়ে লাগিয়ে দেয়। বেশ একটা আরাম লাগে। সুর্য্য তখন বুড়ো-বুড়ী পাহাড়ের মাঝ ছুঁই ছুঁই করছে। পদ্ম জানে এবার ওর বাবা উঠবে।

'চল ইবারে,' পান্নু বলে, পদ্ম বলার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়।

'অত জোরে-জোরে হাঁটিস না পদ্ম। আমি তোর নাগাল পেছি নাই।'

'আমার নাগাল পাওয়া অত সোজা ন কি। আমি আতব্বরের মেইয়্যা।' পদ্মর ভুরু দুটো কৌতুকে নেচে উঠে 'তখন গোসা করতে কে বলেছিল?'

পান্নুর আবার মুখ ভারী হয়। পদ্মর ভারী মায়া হয় দেখে। পান্নুর কাছে এসে পদ্ম বলে 'আমার কাঁধের উপর ভর দিয়ে চল গোসা করার গোঁসাই' পদ্ম গজ গজ করে। বেশ ভাল লাগে পান্নুর শুনতে।

সবরীর তিয়াষ—৪

আমলকী আর কুসুম গাছের ফাঁকে ফাঁকে তখন আঁধার ঘনিয়েছে। যেখানে সুর্য্য অস্ত গিয়েছিল, সেই বুড়োবুড়ী পাহাড়ের ফাঁকে চাঁদ উঁকি মারে।

পানুর অন্তরটা কেমন যেন আকুলী লিকুলী করে। 'চের কাল আমার খোঁড়া হয়্যে থাকতে সাধ হচ্ছে রে পদ্ম।' আবেগে বলে উঠে পানু।

'কেনে গো? এমন সাধটি হয় কিসের লেগে?'

'তোর কাঁধে ভর দিয়ে চলবার লেগে'।

'বাপ লো এমন ধুমসো গতরের ভার আমি বইতে লারব' পদ্ম জবাব দেয়। আবার নিঃশব্দে পথ হাঁটে ওরা।

'তুই এমন করে বলিস না পদ্ম' পানু বলে। একটি আতুর হৃদয়ের ব্যথা যেন ঝরে পরে ওর কণ্ঠে।

'কেনে গো? ব্যথা লাগে? আহা হা।' পদ্ম বলে সকৌতুকে।

'তা লাগে বৈকি' পানু জবাব দেয়। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনায় পহাড়তলিতে। শাল, পলাশ আর আমলকির পাতায় পাতায় যেন অন্ধকার আরও ঘনীভুত হয়। দূর থেকে একটা নিবু নিবু প্রদীপের আলো দেখা যায়।

'মাসী বোধ হয় সাঁঝের প্রদীপ দিছে তুলসী থানে।' পানু বলে।

'একটুকু খর খর চল' পদ্ম তাড়া দেয়' 'সাঁঝের প্রদীপের পরে বাপ আর থাকবেকনি। উ প্রদীপটি দেওয়ার অপিক্ষায় বস্যে থাকে।'

পানুও লক্ষ্য করেছে বহুবার। প্রদীপ দেওয়ার পরই মাতব্বর কাকা উঠে যায়।

অবসর সময়ে ঈশ্বরী উমাশশীর বাড়ীতে আসত। এটা সহ্য করতে পারত না পদ্মর মা।

'তুই কেনে গেছলি উ ডাইনের ঘর?' পদ্মকে তাড়না করত ওর মা। 'ডাহিন বটে উ। বশ কর্য়ে লিবেক তোকে। তোর বাপকে ও ছিনেয় লিয়েছে আমার কাছ থেকে।'

পদ্ম বুঝতে পারত না। উমাশশী তো ভালই বাসে ওকে। ওকে দেখে তো ডাইনির মত মনে হয় না। শনের মত চুল নেই ওর।

চোখে নেই বাজ পাখীর মত দৃষ্টি। বরং কেমন সুন্দর পাতা পেড়ে চুল বাঁধে উমাশশী। চোখ দুটো যেন বর্ষায় ভরা কালিন্দি সায়রের মত টলটলে, তা'হলে ?

ঘরে পা দিয়ে'ই ওর ডুরে শাড়ীর আঁচল থেকে চোর কাঁটার শীষ গুলো ছাড়াতে থাকে পদ্ম।

"আহা বিটির মুখটি সুকাই গেছে গো। ড্যাকরা ছেল্যাটা ঘুর্যাই ঘুর্যাই হয়রান করে দিয়েছে মেইয়াট'কে, মাতব্বর, ইবার তুমি ঘর যাও।'

মাতব্বরও উঠবার উদ্যোগ করছিল। পদ্মর হাত ধরে ওরা উপর কুলীর দিকে হাঁটতে থাকে।

দিন গুলো যেন কোথায় হারিয়ে গেল। প্রতি বছরই গাঁয়ে নবান্ন হয়। সবাই গান গেয়ে নতুন ফসলকে ঘরে তোলে। আজ পুরোতনেরও আদর নতুনের ও আদর। সুর করে সবাই বলে

পুরনা ছেড়ে লতুন ধরো
পুরনা দিনকে আদর করো।

অথচ পদ্ম প্রাণ ভরে সেকথা ব'লতে পারে না। পদ্মর জীবনে যে নতুন পুরোন সব একাকার হয়ে গেছে। যে পেয়েছে, পুরোনর প্রতি তার অশেষ কৃতজ্ঞতা, যে পায়নি ? নতুনের আলোতে যে পাওয়ার আশা করে তার অশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু যে পায়নি, যার পাওয়ার সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে সে কোন আশা নিয়ে বলবে পুরানো দিনকে আদর করো ?

পদ্মর মনটা মাঝে মাঝে ব্যথায় গুমরে ওঠে। ভোমর বৌ মিথ্যে বলেনি। তোর সুয্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। ওর বয়সের সূর্য্য। যৌবনের সূর্য্য। কিন্তু এ জমানো সম্পদ কার জন্য অপচয় করল পদ্ম ? কিন্তু আজ কি সত্যিই এতদিনের স্বপ্ন সফল হ'ল ওর ? সত্যিই কি সার্থক হ'ল শবরীর প্রতীক্ষা···

"পদ্ম—পদ্ম" কার যেন মিঠে গলা শোনা যায় ছাঁচ তলায়। ভোমর বৌ। ও ছাড়া এত সুরেলা গলা অন্য কারও নয়। পদ্মর সম্বিৎ ফিরল সঙ্গে সঙ্গে। পদ্মর মনে প'ড়ল কালী-ধলী গোঠ থেকে

ফিরেছে তাদের গোয়ালে তুলতে হবে। মুরগী কটি এখনও বোধ হয় খামার বাড়ীতে ধান খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে ওগুলোকেও খুপরীতে তুলতে হবে। তুলসি থানে সাঁঝের প্রদীপ দেওয়া হয়নি। উঃ বিশ্বের কাজ বাকী।

'পদ্ম—ও পদ্ম'

'যাই বৌ'

পদ্ম বাইরে বেরোয়। ওর আলুথালু বেশ দেখে আশ্চর্য্য হয় ভোমর বৌ, 'অসময়ে ঘুমাতেছিলি ন কি ?'

চোখ রগড়ে পদ্ম বলে 'না তো'

'বুকের কাপড়টি গোছ কর' ভোমর বৌ পদ্মর এই অন্যমনস্কতায় আশ্চর্য্য হয়। পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে পদ্ম অত্যন্ত মার্জিত রুচি ও পরিচ্ছন্ন। তাহলে হঠাৎ এমন বিশ্রস্ত বেশে ও বাইরে বার হ'ল কেন ? আর কেনই বা হঠাৎ সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে মুর্ছিত হ'য়ে পড়েছিল পদ্ম ? তাহলে কি এই বয়সে পদ্মর মন ফিরল ? কোন মনের মানুষ খুঁজে পেল পদ্ম ? তাও সুখের কথা।

এতক্ষণ পরে পদ্মর চৈতন্য হয় ভোমর বৌ এক দৃষ্টে ওকে নিরীক্ষণ করছে। স্মৃতির তন্দ্রাটা কেটে যায় পদ্মর। ও ত্রস্তে কাপড়টা গোছ করে পরে। তারপর হাসি মুখে বলে 'না ঘুমাই নাই বৌ, একটুকু ঢুলুনী অ্যাসে ছিল বটে।'

'এখনও সাঁঝ দিস নাই।'

পদ্ম লজ্জিত হয়। 'দিব ইবারে'

'জলকে যাবি নাই' ?

'যাব' পদ্ম ঘরের ভেতর থেকে একটা পিতলের কলসি কাঁখে নিয়ে বেরিয়ে আসে। তার পর দুই সঙ্গিনী কালিন্দী সায়রের দিকে হাঁটতে থাকে।

কিন্তু মাতব্বরের কি হল আজ ? মাতব্বর নিজেই বুঝতে পারে না। শুধু আবছা অনুভব করে, ঠিক এমনী দিনে পলাশের গাছে গাছে যখন

কেউ আবীর ছড়িয়ে দেয়, সকালের মনোরম মন্থন আলোক যখন একটা মিঠে আরামের প্রলেপ বুলিয়ে দেয় সর্ব্বাঙ্গে; শালুক ডুংরীর হিমেল বাতাসে ভেসে আসে পাহাড়িয়া ফুলের সুগন্ধ, তখন কি একটা না পাওয়ার ব্যথ্যা, কি একটা হারানোর বেদনা ওকে ক্লান্ত করে। ক্লান্ত করে আর ক্লান্ত করে। তখন নেশার মাঝে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। মনটা যেন নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। মনে হয় সমাজে সংসার প্রতিপত্তি, সম্মান সব মিছে। সত্যি শুধু একটি প্রেমের স্মৃতিকে আঁকড়ে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা।

আজ সারা দিন কামিনী ফুলের গন্ধটা যেন মনের মধ্যে ভেসে বেড়ায়। কেমন যেন একটা মদির সুগন্ধ। পচাই এর উগ্রগন্ধকেও ম্লান করে দেয়।

বাটীর পর বাটী পচাই খায় ঈশ্বরী। লায়া গুণীন পচাই টা তৈরী করে ভাল। ওঝা মানুষ। নানা প্রকার শেকড় বাকড় ওর নখদর্পনে তাই মিশিয়ে পচাই টা বেশ তেজী করে গুণীন। মাতব্বরকে দেখে খুশী হয় গুণীণ।

এক গাল হেসে মাতব্বরকে অভ্যর্থনা করে 'অ্যাসো ব মাতব্বর অনেক দিন পরে যে?'

'কাজ, বুঝলে হে গুণীণ, কাজ। ফুরসত নাই এইটুকু। মাতব্বর হওয়ার অনেক জ্বালা।' শেষের কথাটা একটু আত্ম স্তুতির। গুণীণ জানে মহাদেব বেলপাতায় সন্তুষ্ট। তাই মাতব্বরের কথাটারই পুনরাবৃত্তি করে "তা বটে বৈকি। দশজনের মাথা হওয়ার কি কম জ্বালা? সবাইকার সুখ, দুখ বেপদ আপদের দিশারী। তা কি খবর বল?'

'খবর আর কি, তুমার কাজ কম্ম কেমন চলছে বল।'

'আমার আর কাজ' আফশোষ করে গুনীণ 'এখন হাঠে হাঠে ডাক্তার, কুবরেজ হাতুড়ের দল। ওঝা গুণীণকে সাপে কাটা আর ডাহিন লাগা ছাড়া কে ডাকে বল। তুমি তো জানো মাতব্বর আগে কতদূর দুর থেকে ডাক পাড়ত, দুই রাইড়ি, বেড়াদা, ছড়দা, লক্ষণপুর।

এখন বড়জোর দাসপাড়া' কি চন্দনপুর। এই তো সেদিন চন্দনপুরের সদগোপ ঘরের মাঝলা বেটাকে ডাহীনে ধরেছিল। তা এমন সর্ষে পোড়া দিলম যে—'

এতসব শোনবার ধৈর্য্য নেই মাতব্বরের। মাতব্বর ঈশারায় জিগ্যেস করে 'আছে'

'তা আছে বৈকি। তবে দশের মাল। তুমার জন্যি একটু ভাল করতে হবেক তো। একটুকু কস্তুরী মেশাল দিতে হবেক। শাহীর হাড় ঘষতে হবেক। তবে তো তেজী হবেক।'

'যাও তবে লিয়ে আস। শরীলটি ভাল নাই আজ।'

গুণীণ বোঝে শরীর নয়। মন ভাল নেই মাতব্বরের। এমনীতে মদ খায় না মাতব্বর। গুণীণ ভেতরে চলে যায়। মাচুলীর ওপর বসে মাতব্বর। এরই মধ্যে ঘুর্ণি হাওয়া সুরু হয়েছে। শালই ডহরের মাঠে একটা ঘুর্ণি হাওয়ায় সুকনো পাতাকে শন্যে উড়িয়ে দিল। পত্ররিক্ত পাকুড় গাছটার ডালে একজোড়া ডাহুক ডাহুকী বসে আছে। মাতব্বরের মনটা যেন কেমন কেমন করে ওঠে। না, বড় দেরী করছে গুণীণ। ভেতরে উঁকি মেরে মনটা প্রসন্ন হয়। হুটো ভাঁড় আর হুটো কলাই করা বাটী আনছে গুণীণ। গুণীণও মদ খাবে মাতব্বরের সঙ্গে। একা মদ খেয়ে আরাম নেই। হুজন হুটো মাচুলীতে বসে তার পর আস্তে আস্তে চুমুক দেয় বাটীতে। মাঝে মাঝে শালপাতার ঠোঙ্গায় রাখা ছোলা ভাজা নিয়ে চিবোয়। না হ'লে মুখটা তেত হ'য়ে যাবে। জ্বালা ধ'রবে গলায়। শুরুতে হুজনেই স্বাভাবিক। সুখ হুঃখের কথা হয়। দেশের কথা। সমাজের কথা। জিনিষ পত্রের দুর্মূ্ল্যতার কথা। হুস্প্রাপ্যতার কথা। তারপর আস্তে আস্তে নেশা ধরে। চোখহুটো আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে আসে। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চ'লে যায়। হুজনে হুটো ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে অথচ মনে করে একই বিষয়ে কথা ব'লছে ওরা। পরস্পর পরস্পরকে সাক্ষী মানে। অসংলগ্ন কথা বলে। মাঝে মাঝে জিগ্যেস করে 'কি, লেশা হনছে না কি ?'

গুণীণ হি হি করে হাসে 'কি যে বুলছ মাতব্বর। ইয়াতে কি লেশা হবেক হে? এক কলসি মদ তো আমার কাছে জলঘাট। আমার পেস্যাবটি দেখ, সিটিতেও মদের গন্ধ পাবে।'

এটা একটা দারুণ হাসির কথা বলে মনে হয় মাতব্বরের। মাতব্বর হাসে। প্রথমে আস্তে আস্তে। তারপর হো-হো করে উচ্চৈস্বরে এবং সেই হাসিতে অকারণে গুণীণও যোগ দেয়। এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে। তারপর অকস্মাৎ দুজনেরই মনে হয় যে ওদের নেশা হ'য়েছে এবং দুজনাই গম্ভীর হ'য়ে যায়। মাটীর ভাঁড় দুটো মাটীতে গড়াগড়ি যায়।

গুণীণ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ঝিমোয়। মাতব্বর গুণীণের উঠানে কুর্চ্চি গাছের গুঁড়িটাতে হেলান দিয়ে কি যেন ভাবে, আর ভাবে।

কিন্তু 'বুকের সেই মিঠে মিঠে ব্যথাটা যাচ্ছে না কেন। আর সেই কামিনী ফুলের গন্ধ?

উমাশশীর সঙ্গে মন মজেছিল ঈশ্বরীর সত্যি কথা। কিন্তু তাতে ঈশ্বরীর অপরাধ কোথায়? অপরাধ শুধু এই যে ঈশ্বরীর বিয়ের পরও ভুলতে পারেনি ওদের ভালবাসার কথা। উমাশশীও না। অথচ ওদের বিয়ে হ'তে বাধা ছিল না। কিন্তু কি যেন একটা 'ভায়াদি' ঝগড়া ছিল উমাশশীর বাবার সঙ্গে ঈশ্বরীর বাবার। কিন্তু ভালবাসা কি কোন বাধা মানে? ওতো নদীর বানের মত। একুল ওকুল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সে কথা বোঝেনি ঈশ্বরীর বাপ।

ঈশ্বরীর বাপ সান দিচ্ছিল টাঙ্গিটাতে। কোথায় যেন হাটের ইজারা নিয়ে একটা ল্যাঠা লেগেছিল মানকিদের। ঈশ্বরীর বাপের নামে তখন সারা পরগণার লোক কাঁপত। না, চোর ছাঁচড় ছিল না তবে অসীম শক্তি আর দুর্জয় সাহস ছিল ওর, যার জন্য সশস্ত্র জনতার মাঝে একা লাফিয়ে পড়তে ভয় পেত না আর আশ্চর্য, ঈশ্বরীর বাপকে দেখলেই ভয়ে দিশেহারা হ'য়ে ছুটত ওরা। খনিকটা গোঁয়ারও ছিল। ঈশ্বরীও পেয়ে ছিল বাপের স্বভাব। বন্য মহিষের মত স্বাস্থ্য সমুদ্ধত

চেহারা। বড় বড় চোখ। কাঁধ পর্যন্ত বাবরী চুল। ওদের গাঁয়ের ছো নাচের দলে ও মহিষাসুরের ভূমিকায় নামত। ওর চেহারার কেউ প্রশংসা করলে ঈশ্বরীর বাপের বুকটা ফুলে উঠত কিন্তু সে ভাব গোপন করে ও ব'লত 'চেহারাটি ত' ভালই বটে ব', তবে জীদটি আছে বন শূয়রের মতন। তার পরেই হেসে বলত 'তা হবেক নাই কেনে, শূয়রের বাচ্চার বাপের 'রোষ' টি ও তো কম লয়।'

ওর ছো নাচ দেখেই মুগ্ধ হ'য়েছিল মাঝ কুলীর চুনারাম সিংএর মেয়ে উমাশশী। তারপর ঘাটের কাছে কয়েক বার দেখা, কয়েকটি সলজ্জ চাউনী আর চোখে চোখে কথা কওয়ার মাঝে মন বোঝাবুঝি হ'য়েছিল পরস্পরের। কিন্তু তখন কি ঈশ্বরী জানত ওদের ভায়াদি ঝগড়ার কথা। আর জানলেই কি সম্ভব ছিল মনের সেই দুরন্ত জোয়ারকে রোধ করবার। ওদের নিয়ে গাঁয়ে কানা কানি সুরু হ'য়েছিল অনেক দিন। সে কথা ঈশ্বরী জানত। উমাশশীও। এবং ওরা হাসাহাসিও করত। গাঁয়ের লোক যা বলে তাই বলুক। দুদিন বৈ তো নয়। আর কদিন পরেই তো উমাশশীকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবে ঈশ্বরী। ওদের কানা কানি ভালই লাগত ঈশ্বরীর। কেমন যেন একটা উন্মাদনা জাগত মনের মধ্যে। তাছাড়া, আরও আশা ছিল ঈশ্বরীর, ব্যাপারটা যখন সবারই জানা তখন ওর বাপের কানেও নিশ্চয়ই উঠেছে। আর ওর বাপ যখন কিছু বলেনি তখন এটা পূর্ণ সম্মতির লক্ষণ। সুতরাং হতাশ হওয়ায় কি আছে? কিন্তু ঈশ্বরীর বেহিসেবী মন মাঝে মাঝে দুর্বার হ'য়ে উঠত। সবই যখন জানে ওর বাপ তখন ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করছে না কেন? এ রকম উঞ্ছবৃত্তি করে আর কতদিন চলবে। তাছাড়া উমাশশী সেদিন বলছিল কালিন্দীর ঘাটে মেয়েরা ওকে দেখে হাসে চোখ ঠারা ঠারি করে। কাজেই সে প্রেম স্বীকৃতির অভাবে সমাজের অপরের উপহাসের বস্তু। সুতরাং সেদিন প্রচুর সাহস সঞ্চয় করে ঈশ্বরী ওর বাপের পাশে ঘুরঘুর করছিল। ওর বাপের মেজাজটা বোধ হয় ভাল ছিল না। আপন মনে টাঙ্গীটাতে শান দিচ্ছিল ও। ঈশ্বরী যে পাশে পাশে ঘুর ঘুর করছে খেয়াল করেনি।

হঠাৎ এক সময় মনে হ'ল ঈশ্বরী বোধ হয় কিছু বলতে চায়। এবং আরও মনে হ'ল ঈশ্বরীর বাপের, যে ঈশ্বরী জোয়ান হয়েছে আর তার বিয়ে দেওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল, সেদিন বকুল নগরের হাঠে রাইডির অর্জুন সিংএর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পান তামুকের পর ট্যাক্স বাবুর চালাটার ছায়ায় বসে বসে নানান্ সুখ দুঃখের কথা হ'য়েছিল ওদের। তখনই একটা প্রস্তাব দিয়েছিল অর্জ্জুন সিং। আর সে প্রস্তাবটা ভালই লেগেছিল ওর। অর্জ্জুন বলেছিল ওর মেয়েটিও বেশ ডাগর ডোগর হ'য়েছে। এবার বিয়ে দেওয়া দরকার। তাছাড়া, আক্ষেপ করেছিল অর্জ্জুন, একালের যে সব ব্যাপার স্যাপার তাতে ছেলে মেয়েরা জোয়ান হ'লেই বিয়ে দেওয়া উচিত। বরং আগে তাও পরে নয়। বুড়ো ময়না যেমন পোষ মানে না, ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে গেলে আর বাপ মায়ের বাধ্য থাকে না। তাছাড়া জোয়ান বয়স। তখন যে যাকে দেখে তাকেই ভাল লেগে যায়। জোয়ানির চোখই আলাদা।

কথাটা মনে ধরেছিল ঈশ্বরীর বাপের। ঈশ্বরী জোয়ান হ'য়েছে একথা ওর বার বার মনে প'ড়েছে কিন্তু ওর বিয়ের কথা মনে জাগেনি একবারও। ছিঃ ছিঃ নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল এবং ঠিক করেছিল হাঠ থেকে ফিরেই ঈশ্বরীকে বলবে সে কথা। কিন্তু কি রকম মনের ভুল। ঠিক করা কথাটি পাসর্য়ে গেছি।

ঈশ্বরীকে দেখে কাছে ডাকল ওর বাপ 'ইদিকে শুন ত বেটা।'

ঈশ্বরী ওর বাপের কাছে এগিয়ে এল। ওর বাপ একবার ওর সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে বোধ হয় ওর যৌবনের পরিমাণটা ঠাহর করবার চেষ্টা করল তারপর বলল 'এ বাপ, ইবার তুই বিয়া কর।'

ঈশ্বরীর মুখটা হঠাৎ উল্লাসে ঝলসিয়ে উঠল। একটা পুলকের শিহর বয়ে গেল ওর সর্ব্বাঙ্গে। সহসা কোন জবাব দিতে পারল না ঈশ্বরী। ওর হঠাৎ কৌতুহল হ'ল ওর মনের কথাটি ওর বাপ জানল কি করে? ঈশ্বরী আরও নিশ্চিত হ'ল যে কানা ঘুষায় নিশ্চয়ই সবাই শুনেছে ওর বাপ, তাই এই প্রশ্রয়।

ঈশ্বরীর বাপ ভাবল এ কালের ছেলে গুলো কেমন? কোন শরম ভরম নেই? বিয়ের নাম শুনেই এমনী ধরো ধরো ভাব, তাহলে বিয়ে হ'লে তো…।

'রাইডিহির অর্জ্জুন সিংএর মেইয়্যাটি বেশ ডাগরটি হয়্যেছেন। সংক্রান্তি বাদ আমি দেখ্যে আসব। পছন্দ হল্যে উখেনেই তুর বিয়া দিব।'

ঈশ্বরীর সব উৎসাহ সব উল্লাস হারিয়ে গেল মুহূর্ত্তে। একটা সুতীব্র আবেগকে রোধ করবার চেষ্টা করে ঈশ্বরী বল্ল 'কিন্তুক বাপ, আমি'

'কিন্তুক কিসের? জুয়ান হয়্যেছিস ইবার বিয়া করবি ইয়াতে কিন্তুকএর কি আছে? আর অমন খনেক খনেক রঙ্গ পাল্টাবার কি আছে?'

কি আছে ঈশ্বরীর বাপ জানে না। কিন্তু ঈশ্বরী জানে। ঈশ্বরীকে এখনও অনেক দিন বাঁচতে হবে। এবং উমাশশীকে ছাড়া বাঁচার কথা ঈশ্বরী কল্পনাও করতে পারে না। যদি নিতান্তই উমাশশীকে না পাওয়া যায় তাহ'লে? তাহলে?

উমাশশী পরে এর উপায় বলেছিল। হয় ধুতুরার বীজ, না হয় কালিন্দী সায়রের জল।…

ঈশ্বরী লজ্জা শরম সব বিসর্জ্জন দিয়ে বলেছিল ওর বাপকে 'কিন্তুক বাপ, আমি মাঝ কুলীর গোলাপ সিংএর বিটি উমাশশীকে বিয়া করব ঠিক করেছি।'

খেঁকিয়ে উঠল ঈশ্বরীর বাপ 'তু ঠিক করবার কে রে শুয়রের বাচ্ছা? পিরীত করবার লোক পেলি নাই তুই? উয়ার কাকাকে খুন কর্য়ে আমার বাপ সাত বছর জেইল খাট্যেছিল? তুই শত্তুরের বিটির কাছে মাথা নুয়ালি?'

ঈশ্বরী অবশ্য জানত না। কিন্তু জানলেই কি সম্ভব ছিল ভরা বর্ষার বানের মত সেই দুরন্ত প্রেমের স্রোতকে রোধ করবার। কিন্তু ঈশ্বরী সেদিন সত্যিই ভয় পেয়েছিল ওর বাপের হাতের ধারাল চকচকে

টাঙ্গিটা দেখে। সেদিন মনে হয়েছিল ওর বাপ ওর হৃদয় টাকেই ধারাল টাঙ্গিটা দিয়ে কেটে ফালা ফালা করে দিয়েছে।

কিন্তু তারপর? তারও পর আছে। ঈশ্বরী আর উমাশশীর প্রেমের স্ফুটোনোন্মুম কুঁড়ি টাকে দু পায়ে দলে পিষে মাটীর সঙ্গে একাকার করে দিয়েছিল ওর বাপ।

উঃ আর ভাবতে পারছে না ইশ্বরী। বুকের ব্যথাটা বাড়ছে ক্রমাগত···আ

তবুও যেন দিন গুলো মনের দরজায় উঁকি মারতে লাগল। তারপর ঈশ্বরীর বুকটাকে খাক করে দেবার জন্য গাঁয়েরই সোনাই সিংএর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল উমাশশীর। তারপর জ্বালা ভরা সেই দিনগুলো আর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি।

কিন্তু একটা অপরাধ বোধ পীড়া দেয় ঈশ্বরীকে, ওদের প্রেমকে ওর বাপ স্বীকার করতে পারেনি, কিন্তু ঈশ্বরীই কি পেরেছিল পদ্মর প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে? সব বাপই বোধ করি এমনী ক্ষমাহীন। ঈশ্বরীর মনে হয়েছিল। কি যেন নাম ছিল ওর? উমাশশীর ঘরে যখন পদ্মকে নিয়ে যেত ঈশ্বরী তখন হাত ধরে ওকে খেলাতে নিয়ে যেত ও। তারপর কবে ছেলেখেলার বয়স পার হয়ে গেছে খেয়াল ছিল না অথচ···পদ্মকে ঈশ্বরী প্রাণের চেয়েও বেশী স্নেহ করে। কিন্তু পদ্ম কোনদিন এতটুকু অনুযোগ করেনি ঈশ্বরীর কাছে। ব্যথা সেই খানেই। অথচ সেই পদ্ম আজও অনুঢ়া। কিন্তু কি যেন নাম সেই ছোঁড়াটার? নামটা ভাবতে চেষ্টা করল না ঈশ্বরী। স্মৃতির বেদনায় ওর বুকটা যেন টন টন করে।

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের সোনালী আলো এসে পড়েছে। পাখীরা নীড় ছেড়ে বেরিয়ে গেছে আকাশের সন্ধানে। হাঠুরেরা সামনের পথ দিয়ে হাঠে চলেছে। ইতি মধ্যেই সন্ন্যাসীর এ গাঁয়ে আসার খবরটা জেনে গেছে সবাই। তাই কারো চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি নেই বরং খানিকটা কৌতুহল ভরা চোখে

ওরা তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে ফিস ফিস করে গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। সন্ন্যাসী ওর ঝুলিটা গাছের কোটরে রেখে সবে গঙ্গামাটীর অলকা তিলকা কেটে কল্কেটি সেজে ফুঁ দিচ্ছিল, এমন সময় শশীকমল এল।

সন্ন্যাসী ফুঁ দিতে দিতেই ভুরু তুলে বলে "শশী ভাই যে, এত সকালে।'

'চল্যে এলম হে তুমার কাছে। ঘরটি ভাল লাগল নাই।' শশীকমলের মুখ বেজার। অসীম বিরক্তির সঙ্গে শশীকমল যজ্ঞডুমুরের ছায়ায় বসে পড়ে।

সন্ন্যাসী মৃত্থ হেসে বলে 'কেনে হে, হঠাৎ ই রকমটি মনে হছে কেনে? তুমার অভাব কিসের? জমি আছে, চাষ আছে, ঘর আছে, গেরস্থ আছে, তুমার আবার ভাবনা কিসের? পায়ের উপর পা দিয়ে খাও আর নেশা ভাং কর।'

'না হে না, উটি তুমি বুঝবে নাই। সংসারী দের জ্বালা তুমি বুঝবে নাই। তুমিই বরং ভাল আছ সন্ন্যাসী, কোন ভাবনা নাই চিন্তা নাই। পিছু টান নাই। আজ কিছু না থাকলেও দুঃখু নাই। কাল না থাকলেও দুঃখ নাই। নিজের কোন আশ্রয় নাই। সারা পৃথিবীই তুমার আশ্রয়। যিখেনে ইচ্ছা যাও। কত লোকের সঙ্গে পরিচয়। কত দেশের সঙ্গে চেনাজানা। আমরা শালা জন্মেছি কুয়ার ব্যাঁ হ'য়ে মরব ও কুয়ার ব্যাঁং হয়্যে। স্রোতের আনন্দটি বুঝতে পারলাম নাই হে।'

সন্ন্যাসি বোঝে এখনও কোন নেশা ভাং করেনি শশী কমল, তাই কথা বার্ত্তা গুলো মোটামুটি স্বাভাবিক ভাবেই বলছে। আর কিছুক্ষণ পরেই শশীকমল হারিয়ে যাবে।

'সিটি তুমি ঠিকই বল্যেছ হে।' আগের কথার সুত্র ধরে সন্ন্যাসী জবাব দেয়। 'কথাটি মিথ্যা লয়। মানুষের সব চেয়ে বড় ভাবনা পেটের ভাবনা। তারপর আশ্বয়। তা সন্ন্যাসীদের কোন ভাবনাই নাই। সমস্ত দুনিয়াই তো তার আশ্বয়। ঘরে ঘরে তার অন্ন বাঁধা।' কল্কেতে সজোরে টান দিয়ে নিঃশব্দে হাতটা বাড়ীয়ে দেয় সন্ন্যাসি।

সঙ্গে সঙ্গে কল্কেটা হাতে নেয় শশী। এটা নেশা খোরদের ইশারা। সন্ন্যাসি খানিকক্ষণ ধোঁয়াটা বুকে রেখে বুঁদ হয়ে থাকে তারপর আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ছাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়াটাও নাক মুখ দিয়ে বেরোয়। ততক্ষণে শশীকমল টান দিতে সুরু করেছে।

মেয়েরা কলসী কাঁখে ঘাটের দিকে চলেছে। সন্ন্যাসী থাকলে সাধারণতঃ ঘোমটার অনুশাসনে মুখটা সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে না। কিন্তু শশীকমলের উপস্থিতির জন্য প্রায় সবাই কলা বৌ সেজে পার হয়ে চলে যায়। কিন্তু ওদের উচ্ছ্বসিত হাসিটা গোপন থাকে না।

কল্কেটা ভাল করে মাটীতে ঝেড়ে শশীকমল বলে 'মেইয়্যা গুলিন হাসছেন হে সন্ন্যাসী। উয়ারা তো কুন দিনই লেশাটির মম্ম বুঝবেক নাই। লেশা করলে বড়জোর পচাই খাবেক। মদ খাবেক। কিন্তুক গাঁজা? সেটি লারবেক। উটির জন্যে কলিজার জোর দরকার।'

পাছে মৌতাতটা কেটে যায় এইজন্য ভাম হ'য়ে বসেছিল সন্ন্যাসী। শশীকমলের কথার ও কোন জবাব দেয় না।

শশীকমলের নেশাও জমতে সুরু করেছে ততক্ষণ হঠাৎ একটা জটীল দার্শনিক তত্ত্ব মনে পড়ে শশীকমলের। 'ই শালা সংসারটি বড় কঠিন ঠাঁই হে।' শশশীকমল বলে শাঁখারীর করাতের মতন। দুদিকেই কাঁটা। মায়ের সঙ্গে হেসে কথা বল্লে বৌএর গোসা। বৌএর সঙ্গে হাসি তামাশা করলে মায়ের মুখ ভারী। ত' আমি শালা করি কি? মা হ'ল্য গভভধারিনী। আমাকে জনম দিয়েছে। উয়ার সঙ্গে কথা বলব নাই ত' কথা বলব কি তোর বাপের শাউড়ীর সঙ্গে? বৌ শালা ইটি বুঝবেক নাই। আর মায়েরও 'অসঠা' আছে। বিয়া দিলি কিসের লেগ্যে যদি বৌএর সঙ্গে তামাশা করায় তোর চোখ টাটাবেক? আর বৌএর সঙ্গে হাসি তামাশা করব নাই ত' কার সঙ্গে করব? লৌতুন পিসীর সঙ্গে?'

এ গুলো শশীকমলের আক্ষেপ। শশীকমল স্বাভাবিক থাকলে এসব কথা গুলো বেরোয় না। কিন্তু দিনের মধ্যে কতক্ষণ স্বাভাবিক থাকে শশীকমল?

সন্ন্যাসী শুধু ঘাড় নাড়ে। মাঝে মাঝে শশীকমল জিগ্যেস করে 'তুমি শুনছ সন্ন্যাসী ?'

সন্ন্যাসী চোখ বুজেই জবাব দেয় 'শুনছি তুমি বল্যে যাও।'

মাঝে মাঝে হঠাৎ খেয়াল হয় শশীকমলের, এসব কথা কাকে বলছে ও। সন্ন্যাসী মানুষ কি বুঝবে সংসারের জ্বালা। শশীকমলের বিরক্তিটা আরও বেড়ে যায়। 'না তুমাকে বল্যে লাভ নাই হে সন্ন্যাসী। তুমি ইসব বুঝবে নাই।'

সন্ন্যাসী চোখ খোলে এবার। 'বুঝব নাই কেনে ?'

'তুমি তো সন্ন্যাসী হে'

'সন্ন্যাসী কি মানুষ লয় ?'

'না'

'তবে'

'সন্ন্যাসী'। দেবতা।'

'কিন্তুক জন্মেই তো কেউ সন্ন্যাসী হয় না ভাই। গেরস্থর ঘরেই ত' সন্ন্যাসীর জন্ম।'

'না হে। যে সন্ন্যাসী হবার। সে শালা মায়ের পেটেই সন্ন্যাসী হয়। তা না হ'লে আমি হলাম নাই কেনে ? হল নাই কেনে হেঁট কুলীর লটবর ?'

এ তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। এর মীমাংসা সন্ন্যাসীর ভাণ্ডারে নেই। কিন্তু সন্ন্যাসী সংসারের জ্বালা বুঝবে না এ কথা বললে বোধ করি সন্ন্যাসীর প্রতি অবিচার করা হয়।

'কিন্তুক সকাল সকাল তুমার কলহের কারণটি কি, আর কার সঙ্গেই বা তুমার কলহ, সিটি তো বল্লে নাই।'

"কলহ দুজনার সঙ্গেই। মা আর বৌ। দুজনারই এক কথা। একটি ছেল্যা চাই। ত' ছেল্যাটিকি গাছের ফল বটে যে 'হিল্যাই' দিলম আর পড়্যে গেল।'

'তা ইয়ার জন্যে আর ভাবনা কিসের হে ?' সন্ন্যাসী হাসি মুখে বলে।

'ভাবনা নাই?' যেন আশ্বস্ত হয় শশীকমল। তাহলে নিশ্চয়ই কোন বিভূতি আছে কাছে।

'কতদিন বিয়া হ'য়েছে তুমাদের?'

'তা হবেক বছর দশ।'

এবার সন্ন্যাসীর মুখ চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়। 'তাহল্যে ত' তুমাকে কুবরেজ্ দেখতে হয় হে।'

'কুবরেজ?' শশীকমল কেমন যেন মিউয়ে যায়। 'কুবরেজ আমি দেখতে লারব হে।'

'কেনে?' সন্ন্যাসী অবাক হয়। শশীকমলের অবস্থা ভাল। খরচ পত্র করে স্ত্রীকে কবরেজ দেখতে আপত্তির কারণ কি বুঝতে পারে না সন্ন্যাসী।

শশীকমল আমতা আমতা করে। না, মানে ই বছর তেমুন ধান হয় নাই। তা ছাড়া ধর কেনে, পাহাড় ক'লের দু বিঘা জমি কাটতে হবেক ইবার।

'জমি কাটানর থিকে তুমার বৌকে দেখান বেশি দরকার শশী ভাই। তুমি বকুল নগরে কুন ভাল কুবরেজকে দিয়ে চিকিৎসা করাও। ভাল হয়্যে যাবেক। ভগমান আছেন।'

'কিন্তুক—' কি বলতে গিয়ে যেন এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে শশী। তারপর ভাবে থাক। কি হবে বলে। নিজের দুঃখ নিজেরই থাক। তাকে সকলের কাছে প্রকাশ করলে দুঃখ আরও বাড়বে। তার চেয়ে এই বেশ আছি। নেশা ভাং মাঝে বুঁদ হ'য়ে থাকা আর দু বেলা মা-বৌ এর সঙ্গে কলহ করা। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত কথাটা বলেই ফেলত শশীকমল। কিন্তু নিকটেই ঢোল ধামসার শব্দ শোনা গেল। নিশ্চয়ই হেঁটকুলীর নটবরের দল। গ্রামেরই কোন ব্যাপার নিয়ে ঝুমুর বেঁধেছে। তাই গাইছে হয়ত। ধীরে ধীরে শব্দটা কাছে এগিয়ে আসে। ঠিক শশীকমলের অনুমান অভ্রান্ত। ঢোল ধামসার পাশে পাশে একটা সুরেলা কণ্ঠের রেশ আসছে।

সন্ন্যাসীও কৌতূহলী হয়। 'কিসের বাজনা হে?'

'বোধ হয় হেঁটকুলীর লটবরের কাপের দল বেরাইছে।'

'সিটি কি বস্তু হে?' সন্ন্যাসী শুধোয়।

'লটবরের দল ঝুমুর বাঁধে। ছোলাচ লাচে। গাঁয়ের কুন কেচ্ছা কেলেঙ্কারী হল্যে কাপের দল বার করে, ঝুমুর বাঁধে আর সমস্ত গাঁয়ে ঢোল ধামসা বাজায়ে ঝুমমুরটি গেয়্যে বেড়ায়।'

'ইয়াতে ঝগড়া বিবাদ হয় না?' সন্ন্যাসী শুধোয়। 'ঝগড়া বিবাদ কেনে হবেক হে? ইটি তো একটি তামাসার ব্যাপার। সবাই হাসাহাসি করে। মস্করা করে। যাদের লিয়ে গান তারা লজ্জায় লুক্যাই থাকে। ততক্ষণ নটবরের দল এসে প'ড়েছে।

ঢোল বাজাচ্ছে চম্পাই। দুটো ছেলে একটা লাঠিতে ধামসাটা বয়ে নিয়ে আসছে তার ওপর কাঠি দিয়ে বাজাচ্ছে আর একজন। দুজনার হাতে কর্ত্তাল। মোটামুটী বেশ জমাট ব্যাপার। তামাশা দেখার জন্য সঙ্গে এসেছে ছেলে বুড়ো মিলিয়ে প্রায় জনা পঞ্চাশ। ওরা যজ্ঞডুমুরের তলায় এসে থেমে যায়। তারপর নতুন উদ্যমে গান সুরু করে। না, কোন কেচ্ছা-কাহিনী গান নয়। সন্ন্যাসীরই প্রশস্তি। সন্ন্যাসীর আগমনে ওরা কতখানি খুসি হ'য়েছে এবং এই গ্রামের অধিবাসীরা সন্ন্যাসীর কাছ থেকে কতখানি উপকৃত হতে পারে মুটামুটী তারই একটা স্বতঃস্ফুর্ত্ত প্রকাশ। রচয়িতা নটবর নিজেই। গাইছিলও সে। অন্যান্যরা সব দোহারী।

হই রে, মাথায় হুটা, কোমরে বাঘছাল
ত্রিশুল ডম্বরু দুই হাতে,
হই রে, কানে গুঁজা ধুতুরু, ঢুলঢুল ত্রিণয়ন
ধর্ম বাবা রয় সাথে।
হই রে, বাবা ব্যোম ভোলা তার যে চ্যালা
আশ্বয় লিলেক এই গাঁয়ে।
হই রে দুদিনের মুসাফির, কুথাও থাকে না থির
আস সবে তড়িঘড়ি এই ঠাঁয়ে।

গান থামতেই মাদলিয়া সুর করে বোল ধরে,

ধা গেড়েন গেড়েন না, গিজতা গেড়েন না

দু'থালা ভাত খান শালা, এক পয়সা দেন না।

গিজতা গেড়েন না, গিজতা গেড়েন না

যত করি হেলা ফেলা শালা যে নড়েন না।

মাদলের বোল থামতেই নটবর সন্ন্যাসীর কাছে এসে দণ্ডবৎ করল। 'পন্নাম সন্ন্যাসী। তুমার নামে গান বেঁধ্যেছি বল্যে অপরাধ লিও না হে।'

'অপরাধ? অপরাধ কিসের?' সন্ন্যাসীর মন খুশির আমেজে ভরে ওঠে। তিয়াসির লোক তাকে আপন করে নিয়েছে। তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার করে নিয়েছে।

'বস্য, বস্য, তুমরা।'

'বস্য হে, বস্য সবাই' নটবর সবাইকে বসতে অনুরোধ করে। 'দুটী ধম্মের কথা শুনাও দেখি সন্ন্যাসী। আমরা বড় অধম পানী। ভগমানের নাম করব এমন জিহ্বাও ভগমান দেন নাই। তুমি শুনাও। পরানটি সাথ্থক করি।'

সন্ন্যাসী বিব্রত হয়। 'তুমি আমাকে বেপদে ফেল্লে হে। আমি নাম ধাম কিছু জানি না। শুধু তেনার চরণ ধ'রে পড়্যে আছি। আমি ধম্ম কম্ম কিছু জানি না। শুধু তেনার নাম গানই আমার ধম্ম। তেনার চরণ সেবাই কম্ম।' সন্ন্যাসীর দু চোখ দিয়ে আবেগে জল বেরিয়ে আসে।

'আহা। আহা' ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠে নটবরও।

সন্ন্যাসী আবার বলে 'আমার সাধন নাই ভজন নাই। নিশিদিন ঠাকুরের নাম করি আর গরীব দুঃখীর সেবা করি। এই আমার সাধন ভজন।" জনতা এই ভাবের কথায় বিমুগ্ধ। আহা। এমন মধুর কথা তো আর কেউ শোনায়নি। বকুল নগরের হপ্তা হাঠে তো অনেক সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে কেউ তো এমন ভাবে, এমন ভাষায় আধ্যাত্মিক কথা শোনায়নি ওদের।

ওরা আকুল হয়ে শোনে। ঘর সংসারের হাজার বাঁধন 'চিহড়' বাকল অর্থ্যাৎ চিহড় বন্ধলের দড়ির মত। পাকের পর পাক। সেই বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা কি সহজ কথা?

'ভাই, ভগমান জিহ্বা দিয়েছেন 'সুশ্রেষ্ঠ' কথা বলবার জন্যে। গালি দিবার জন্যে লয়। চোখ দিয়েছেন পৃথিমিকে দেখবার জন্যে, কাঁদবার জন্যে লয়। হাত দিয়েছেন তেনার আরাধনা করবার জন্যে, হাতা হাতি করে মরবার জন্য লয়।'

'কিন্তুক যে অঙ্গের যা কম্ম তাই কি আমরা করি? আমি ভাই ধম্মাধম্ম বুঝি না। যে অঙ্গের যে কাজ তাকে সেই কাজ করতে দিলেই ভগমানের সেবা করা হবেক। না কর্য়ে যে উপায় নাই। মুখ দিয়ে তুমি গান গাইবে। কিন্তুক সবার সেরা গান, ভগমানের নাম গান। তুমার অজান্তেই ভগমানের সেবা করবে তুমি। জানতেও পারবে নাই।"

আহা। সন্ন্যাসীর কথাগুলি হেঁটকুলীর ভূমিজদের ভারী ভাল লাগে। না, বাস্তবিকই সন্ন্যাসী। শুধু ভেকধারী নয়। তাছাড়া মাতব্বর নিজে যখন ভিন গাঁ থেকে নিয়ে এসেছে তখন তো সন্দেহের কোন কারণই নেই। তবু একবার সচক্ষে দেখে, স্বকর্ণে শুনে পরখ করে নেওয়া গেল। এরপর আর কোন সংশয় নেই। কোন দ্বিধা নেই। সন্ন্যাসীকে এই গ্রামেই রাখতে হবে। গাঁয়ের বিপদ আপদ, সুখ দুঃখের মুস্কিল আসান তো সেই হবে। সময় অসময়ে পরামর্শ, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে দুটো মিষ্টি কথা। আহা, পরান যেন জুড়িয়ে যায়।

স্যূর্য্য মাথার উপরে। রোদ বাড়ে। যজ্ঞডুমুরের ছায়া হ্রস্বতর হয়। ঘাটের মেয়েদের পথে দেখা যায় না আর। কাঁচের চুড়ীর রিনিঝিনির মত ওদের টুকরো হাসির ঝঙ্কার শোনা যায় না। হেঁট কুলীর লোকেদের কাজের কথা মনে পড়ে।

মাথা চুলকে নটবর বলে 'কি কপাল দেখ সন্ন্যাসী, দুটা যে ভগমানের নাম শুনব, কি, ধর্ম্মের কথা শুনব তার উপায় নাই। দেখ

কেনে, আমার বিহালা গাইটি বড় বেবশ হইছে। হঠ হঠ ঘরকেই চল্যে আসবেক। আস্যেই বাছুরটিকে ডাকবেক—ম্মা—ম্মা একদম মানুষের লাখান হে·:····। তারপর ধর কেনে, পিঁয়াজ বাড়ীর মাটীটি কালকে সরস কর্য়েছি উটিতে চারা ফেলতে হবেক। তুমার কাছে যে দুর্দণ্ড বসব তার উপায় নাই।'

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বলে 'তুমি যে কাজ করছ হে উটি তো তুমার 'কত্তব্য' কাজ। সংসারের প্রতি কত্তব্য কাজ। ভগমান উয়াতেই খুশি হবেন। অবসর সময়ে দুবার তেনার নাম লিবে। উনি তাতেই সন্তুষ্ট। তাই তো উনার নাম আশুতোষ হে।'

'তাহল্যে যাই সন্ন্যাসী। ইব্যর সেই গাজনের দিন ছৌলাচে দেখা হবেক। তখুন অবিশ্যি তুমি চিনতে লারবে। আমাদের মুখে 'মহড়া' থাকবেক তো। তবে চিনাই দিবেক। গাঁয়ের লোকেরা চিনাই দিবেক। আমাদের লাচটি অ্যানেক বার দেখ্যেছে ত'। তাহল্যে চলি সন্ন্যাসী। সবাই গড় হয়ে প্রণাম করে সন্ন্যাসীকে। অস্ফুট স্বরে সন্ন্যাসী কি যেন বলে। হেঁটকুলীর লোকেরা আবার ঢোল ধামসা বাজাতে বাজাতে চলে যায়। এতক্ষণ নিঃঝুম হয়ে বসেছিল শশীকমল। ঢোল ধামসার শব্দে আচ্ছন্ন হ'য়ে সেও ওদের পিছু পিছু চলে যায়।

সন্ন্যাসীও ওঠার উদ্যোগ করছিল। সহসা কে যেন ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে 'সন্ন্যাসী তুমি ভগমান। তুমি ভগমান। আমি অতি অধম পানী। আমাকে মুক্তির উপায় বল্যে দাও।'

সন্ন্যাসী বিব্রত। এ কি গেরো। পা দুটো সজোরে আঁকড়ে ধর্য়ে আছে কিশুন। জটাধারী কিশুন।

'আহাহা ছাড়ো হে। ইকি হল্য তুমার।'

কিশুনের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ে। 'আমার পাণে বড় জ্বালা সন্ন্যাসী।'

'জ্বালা? জ্বালা কিসের হে?' সন্ন্যাসী অবাক হয়। দুবার স্ত্রী বিয়োগ হ'য়েছে কিশুনের। এবং তারপর কিশুনের মনে বৈরাগ্য এসেছে। কোন পিছুটানও নেই কিশুনের দুটী স্ত্রীই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছে। তাহ'লে? কিসের জ্বালা কিশুনের প্রাণে?

'বড় জ্বালা হে সন্ন্যাসী। আমার তেষ্টা এখনও মেটে নাই সন্ন্যাসী। অথচ ভেক নিয়ে আমি জ্বলে পুড়ে মরছি। ভেবেছিলম ভেক নিলেই বুঝি মনে শান্তি আসবেক। কিন্তুক সব ব্রেথা। আমার মনের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলছে।'

কিশুনের এই অকপট স্বীকারোক্তিতে সন্ন্যাসী খুশি হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের একটা নিভৃত জায়গা হঠাৎ যেন টনটন করে ওঠে। সেটুকু সন্তর্পণে গোপন করে সন্ন্যাসী বলে 'উয়াদের ভুল্যে যাও কিশুন যে যায় সে আর ফিরে আসে না। পৃথিমিতে আমরা তো দুদিনের মুসাফির। কেউ আগে যায় কেউ পরে।'

না হে সন্ন্যাসী না। উয়াদিকে আমি কবে ভুল্যে গেছি। কিন্তুক আমার বেবশ মনের জ্বালাটি তো ভুলতে লারছি। আমার মাথার থেকে পা পর্য্যন্ত বিছার কামড়ের মতন জ্বলছে সন্ন্যাসী। আমি কি করব বল্যে দাও।'

'কিসের জ্বালাটি হে তুমার?' সন্ন্যাসী অবাক বিস্ময়ে জিগ্যেস করে। কিশুনের কথাগুলো যেন খানিকটা দুর্বোধ্য বলে মনে হয়।

'উ লাজের কথা আমাকে শুধায়ো না হে। আমি শরমে মর‍্যে যাব। দু দু বার আমি বিয়া করলাম কিন্তুক আমার কামনার আগুনটি লিভল নাই হে। সেই জ্বালাতেই জ্বলছি। তেষ্টায় আমার গলাটি সুক্যাই গেছে, কিন্তুক এক ফোঁটা জল পান করতে লারছি আমি।'

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হয় সন্ন্যাসীর। কিশুন এখনও অতৃপ্ত। ওর কামনার নির্ব্বান হয়নি। বৈরাগ্যের আড়ালে কামনার আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিল ও, কিন্তু পারেনি। সন্ন্যাসীর করুনা হল ওর প্রতি।

'তুমি আর একটি বিয়া কর কেনে' সন্ন্যাসী বলে।

কিশুন মরমে মরে যায়। 'না হে, ইটি বড় লোকহাসির ব্যাপার হবেক।'

'লোক হাসাহাসি দুদিনেই বন্ধ হয়্যে যাবেক কিশুন। কিন্তুক লিজেকে কষ্ট দিয়ে তুমার ইকূল উকূল—দুটাই যাবেক। তুমি

ভগমানকেও পাবে নাই। লিজেকেও হারাবে। তার চেয়ে একটি বিয়া কর। লিজেকে কষ্ট দিয়ে ভগমানকে পাওয়া যায় না হে।'

একটা গুরুতর সমস্যার মধ্যে পড়ে কিশুন। বেঁচে থাকতে হলে ওর একটা অবলম্বন চাই। আর তাই এই মিথ্যে বৈরাগ্যের আবরণ, যা ওকে নিশিদিন চোর কাঁটার মত বিঁধছে সর্বাঙ্গে। সন্ন্যাসীর পা ছেড়ে দিয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে কিশুন।

পিছন ফিরেই কাকে যেন দেখে চ'মকে ওঠে সন্ন্যাসী। 'কে'? সন্ন্যাসীর হৃৎস্পন্দন অকারনেই দ্রুততর হয়।

'আমি নীলকণ্ঠ সিং। মাতব্বর আজ সাঁঝের বেলায় দশের মজলীশে পায়ের ধুলা দিতে বল্যেছ্যে।'

'আমাকে? আমি অতি নগণ্য পানী।' অতশত শোনবার সময় নেই নীলকণ্ঠর। কাজের মানুষ সে। 'সে আমি জানি না।' নীলকণ্ঠ বলে 'মোটকথা ইটি সমস্ত গেরাম বাসীরই পাথ্থনা বটে।'

'বেশ তো যাব। গেরামবাসী যদি চায়, যাব। লিচ্চয় যাব।'

নীলকণ্ঠ চলে যায়। সন্ন্যাসী ভাবে অকস্মাৎ নীলকণ্ঠকে দেখে বুকটা ধক্ করে উঠল কেন?

গোঠালীর দিনগুলি মনে পড়ে পদ্মর। মনে পড়ে, আর একটা অসহ যন্ত্রনায় বুকটা যেন মুচড়ে ওঠে। পদ্ম ভেবছিল জীবনটা বুঝি এমনী কেটে যাবে। বুঝি বা এমনী। বাঁকা পোলের আশে পাশে ছুটে ছুটে প্রজাপতি ধরে আর শালই ডহরের মাঠে রাখালী করেই জীবনটা কেটে যাবে। এ ছাড়া পদ্মর জীবনে অন্য কোন আকাঙ্খা ছিল না। ছিল না অন্য কোন স্বপ্ন। কিন্তু, তবু চৈত্রের এই ছায়া ছায়া অপরাহ্নে নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে পদ্মর সহসা নিজেকে বড় একা বলে মনে হল। মনে হল এই নিত্যদিনের গোঠালীর ফাঁকে ফাঁকে চুরী করে মন দেওয়া নেওয়ার ইতিকথায় কোথায় যেন একটা ফাঁকি আছে। কোথায় যেন স্থিতির জন্য মনের মধ্যে একটা আকুল বাসনা ছটফট করে। মন যেন আরও কিছু চায়, অন্য কিছু। চায়

নিরুদ্বেগ আশ্রয়ের আশ্বাস। পরিতৃপ্ততার খুশির সাহসে মন যেন চায় কারো অনুক্ষণ সাহচর্য্যের প্রশ্রয়। সেদিন পদ্মর মনে হ'ল মানুষের মনের মধ্যে আর একটা মন আছে যার খবর পদ্মর নিজের কাছেও অজানা। সেই খেয়ালী মনটা হঠাৎ হঠাৎ এমন বায়না করে বসে যা সব সময় অনুভবও করা যায় না। সেখানে এত মানুষের আনা গোনা নেই। এত আলো, এত বাতাস, এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য নেই। আছে শুধু মাত্র তুজনার মত আধো আলো আধো অন্ধকারে ঢাকা একটি উষ্ণ প্রকোষ্ঠ। দিনের উজ্জ্বল আলোতে প্রিয়জনকে যে কথা বলা যায় না এই নিস্তরঙ্গ আবছা আলোর ইশারাতে বুঝি বা সব বলা যায়। সব দেওয়া যায় নিঃশেষে। তাই যেদিন পদ্মকে নিবিড় করে পাওয়ার আকাঙ্খায় পানু আকুল হ'য়ে উঠল সেদিন ওর যৌবনের বৃন্তে সদ্য ফুঁটে ওঠা তুএকটা আধ ফোঁটা কুঁড়ি পাপড়ী মেলার সলজ্জিত অনুরাগে থর থর করে কেঁপে উঠল। পদ্মর ডাগর তুই চোখের তারায় তখন অন্য এক ভাষা, অন্য এক জিজ্ঞাসা। দেহের তুকুল ছাপিয়ে বন্যা নেমেছে শ্যামলা রূপের। মেঠো পথের তুপাশে ক্ষেত কদমের নরম ফুল গুলো পায়ে পায়ে লুটো পুটী করে অরণ্য কন্যার।

'তুই আমাকে যাতু করেছিস পদ্ম' গরু চরানো 'পয়না' টা তু হাতে লুফতে লুফতে পানু বলে।

পদ্ম অবাক হওয়ার ভান করে। কপট রোষে বলে 'বাপ গো, উঁকি কথা বলছ গো? যাতু করে তো বকুল নগরের বাইদা মেইয়্যারা। আর কামরূপ কামিখ্যার পরীরা। চোখের ছটায়, সাজ বেশের বাহার উয়ারাই তো মরদ দের ভেড়া বনায় বল্যে শুন্যেছি। আমি গাঁয়ের মেইয়্যা। গোধালী করি, ঘরের কাজ দেখি। আমার না আছে রূপ, না আছে ঢং। আমি কি যাতু করব গো?'

পদ্মর কথায় কৌতুক অনুভব করে সবাই। কিশুন, মালতী, কুশমি, ললিতা, আরও অন্যান্যরা সবাই। এদের মনেও নাকি রং লেগেছে। ভাল বাসার রং। যে রঙ্গ ফাল্গুনের দিবাবসানের সূর্য্যের অস্ত রাগে। যে রং রক্ত পলাশের শাখায় শাখায়। গোঠালীর

মেয়ে পুরুষের মনে সেই রং গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে। সেই রং কেউ মুখে মাখে, চোখে লাগায়। রঙ্গীন দেখে সমস্ত পৃথিবী। কেউ দূর থেকেই দেখে এই রংএর মেলা।

এ রঙ্গের ছোঁয়াচ বড় খারাপ। বড় সংক্রামক ঘর ভাঙ্গে। মন ভাঙ্গে। কূল ভাঙ্গে।

তিয়াসির ভুমিজরা তাই সদাই সাবধানে থাকে। তবু অবাধ্য মন বাধা মানে না। ঘুরে ফেরে সেই নিষিদ্ধ গণ্ডির আশে পাশে। পাহাড়তলীর নির্জ্জন কন্দরে, বাঁকা পোলের নিভৃতে অথবা কাশ বনের ফাঁকে ফাঁকে। কিশুন আর মালতীর মনেও সেই রং লেগেছে। গোঠালীর ছেলে মেয়েরা দূর থেকে দেখে। এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে। 'আহা, লাজও নাই।' আর লজ্জাই বা থাকবে কি করে। যারা পিরীতের রসে মজে তারা কি শরম ভরমের তোয়াক্কা করে। তখন তো আমার আর তোমার দুনিয়াদারী।

কিশুন আর মালতী, পদ্ম আর পানু একসঙ্গে ঘোরে। সব প্রেমিকেরই জাত এক গোত্র এক।

আগের কথার খেই ধ'রে কিশুন বলে 'ই কথাটি মানতে লারলম পদ্ম দিদি। বকুলনগরে বাইদা মেইয়্যা আছে। উয়াদের চোখের ঠাট আছে, সাজের গমক আছে, আর আছে সাপিনীর মতন মন। সাপের বিষ তুলে মুখ দিয়ে আর সে বিষ রাখে জীভের আগায়। পুরুষদের বুকে ঢ্যেলে দিবার লেগে।'

"তবে আমাদের মুখে কি আছে মালতী শুধোয়।

কথা ফুরোবার আগেই পানু বলে 'মধু গো। পদ্ম মধু'।

কথাটার অন্তর্নিহিত ইঙ্গীতটা বুঝতে পেরে খিল খিল করে হেসে ওঠে মালতী।

পদ্মর মুখ লজ্জায় আরক্তিম 'আহা, লাজও নাই।' পদ্ম বলে সরোষে।

'লাজ যে আমরা বাঁধা দিয়েছি গো'

'কুথায়'

'ভূমিজ মেইয়্যার যৌবনের কাছে।'

'আহা লাজও নাই।'

পাহাড়তলীর ডুংরীতে গরু গুলো আপন মনেই চরে। ওদের পিছনে সব সময় নজর রাখতে হয় না, শুধু আফর ফেলার সময় ছাড়া। পদ্ম আর মালতী হিঠ্ হিঠ্ করতে করতে গরু গুলোকে ডুংরীর কিনারের দিকে সরিয়ে দিয়ে কালো পাথরের চাঙ্গড়ের উপরে বসে বসে গল্প করে। গেরোয় বাঁধা নুন বার করে কুসুম চুক চুক করে ফলের রস চোষে। মাঝে মাঝে টকের জন্য চোখ মুখ কোঁচকায়। এখন আফর ফেলার সময়। এখন মাঠে মাঠে সবুজ ঘাস। কচি শ্যামল আফর গুলো মৃদু হাওয়ায় দোল খায়।

'আহা যেমুন ভূমিজ মেইয়্যার ঢল ঢল যৈবন। পরোয়া নাই কাউকে।' আফর গুলির উদ্ধত স্বভাব দেখে মন্তব্য করে কিশুন।

অতশত বোঝে না পান্নু। যৈবন তো মেয়ে পুরুষদের। ব্রেক্ষ লতাব আবার যৈবন কি। পান্নু বিরক্ত হয়। একটুকু চুপ করে যে ভাববে অথবা স্বপ্ন দেখবে সোনালী দিনের, তার উপায় নেই।

'তু বড় বকিস কিশুন।'

'তুর ভাল লাগছে নাই?'

'না, তু চুপ দে'

গুম হয়ে বসে থাকে কিশুন। ওদিকে জীভ আর তালুর ঘর্ষণে একটা বিচিত্র চুক চুক শব্দ করে মালতী ডাকে কিশুনকে।

'হি রে কিশুন, তুর ধলাটা আফরের খেতে নামছে।'

'কই কই' সচকিত হয় কিশুন

'ইদিকে আসবি তবে ত'

কিশুন পাহাড়তলীর দিকে ছোটে। যেতে যেতে গাল দেয় গরু গুলোকে। 'হি শালার গরু, খালি ক্ষেতেই নামবেক, ক্ষেতেই নামবেক।'

পদ্ম আর মালতী খিল খিল করে হেসে ওঠে। ওদের হাসির শব্দে চ'মকে ওঠে কিশুন। ব্যাপারটা আঁচ করতে পারে সহজেই। 'ও, তামাশা করলি। আমার সঙ্গে তু তামাশা করলি মালতী।'

বাঁপ গো, বড় 'অসৈরনের কাজটি করেছি। তামাশা করেছি তুর সঙ্গে। তা তুর সঙ্গে তামাশা করব নাই ত কি তামাশা করব হেঁটকুলীর রঘু পিসার সঙ্গে?'

না। গরুগুলো ক্ষেতে নামেনি। নামলে অবশ্য 'ক্ষেতরাখা' তাড়া করে আসত। রাখালের বাপ চৌদ্দপুরুষ তুলে গালি গালাজ করত। তারপর আবার মাচায় উঠে শুয়ে পড়ত।

আফরের সময় ক্ষেতেরই একপ্রান্তে মাচা বেঁধে ক্ষেত পাহারা দেয়। পাকা ধানের সময় কুঁড়ে বেঁধে থাকে ধান কাটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত। রাখালরা নিজেদের গোঠের গরু ছাগল সামলে রাখে। অনেক সময় অসাবধানে গরু ছাগল ক্ষেতে নামলে বকুল নগরের খোঁয়াড়ে দিয়ে আসে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। পাহাড়তলীর গাছের পাতাগুলো শির শির করে। সূর্য্যাস্তের রঙে ছেয়ে যায় সমস্ত পাহাড় তলী। সেই রঙ বিন্দু বিন্দু ছড়ীয়ে পড়ে ওদের সর্ব্বাঙ্গে। আবেগে গদ গদ হয়ে কিশুন বলে 'মালতী, একটা ঝুমুর গা শুনি'

'আরে ছোঁড়া, ই ভর বিকালে 'ব্রহ্ম ট্যাড়ের' মাঝে তুকে ঝুমুর না শুনালেই লয়। কথা শুন্যে অন্তরটি শেতল হল্য আমার।'

'তু বড় লিঠুর মালতী, তুর পানে দয়া মায়া নাই।' ব্যাথায় মনটা কেমন যেন মুচড়ে ওঠে কিশুনের। চোখ দুটো ছল ছল করে। পানুর হাসি পায়। 'তু ছোঁড়া মরদ না? তবে মেইয়া মানুষের মতন কাঁদিস কেনে?'

'মালতী, তু দুঃখু দিলে হেদয়টি ফালা ফালা হয়্যে যায় আমার।'

'চুপ দে ত' পানু বিরক্ত হয়। পরে বলে তা গাও কেনে একটি ঝুমুর। কিশুন যখুন বুলছে অত কর্যে।

'মাতব্বরের কানে উঠলে তখুন?'

কিশুন উৎসাহিত হয়। ভালই ত, লতুন কর্যে কথাটি পাড়তে হবেক নাই।'

গালে হাত দেয় মালতী 'ইকি বলে গো। লাজে মর্যে যাব নাই আমি।'

'লাজ কিসের? বিয়া করব তার আবার লাজ কিসের? চুরী ডাকাতি তো লয়।'

তা অবশ্য ঠিক। তাছাড়া ওদের প্রণয়ের ব্যাপারটা যখন সবাই একদিন জানতে পারবে। ওদেরই জানাত হবে সে কথা। তাই নিয়ম। গ্রামের ছেলের সঙ্গে গ্রামেরই কোন মেয়ের যখন প্রণয় হয় অথবা বিবাহের ঠিক হয় তখন দশের মজলীশের একটা সামাজিক অনুমতি নিতে হয়। দশের মজলীশ অর্থ্যাৎ গ্রামের দশজন মুরব্বি লোকের সভা।

মালতী ভাবনায় মাথায় হাত দেয়। 'নিলাজ ছোঁড়া দিলেক বুল্যে। এখন পদ্ম যদি উয়ার বাপকে বুল্যে দেয়? পদ্মর বাপের সঙ্গে উয়ার বাপের এক সঙ্গে ওঠা বসা।'

কিশুন নিজের র্নিবুদ্ধিতায় মাথা চাপড়ায়। 'হেই পদ্ম তুই বলিস না।'

পদ্ম পরম নির্লিপ্ততায় একটা চোর কাঁটার শীষ চিবোয় আর পা দোলায়।

'হেই পদ্ম, পদ্ম……'কিশুনের কণ্ঠ ভয়ে কম্পমান।

'তবে তু একটি ঝুমুর শুন্যা মালতী, তারপর দেখি। দেখি………

কপট ক্রোধে মালতী বলে 'কুটনী মেইয়া'

মালতী আর কিশুন দুজনেই ভাল ঝুমুর গায়। সেই সুত্রেই এদের জীবনে রঙ্গের সূচনা। মহুয়া কুড়োতে গিয়ে আট বছরের মালতী কোমরে ডুরে শাড়ী জড়িয়ে, পায়ে পাঁইজর, কোমরে রূপোর বিছে, কানে রূপোর ঝুমকো, পরে মাজা দুলিয়ে ঝুমুর গাইত। কিশুন দেখত। দেখত আর ভাবত, আহা, ভূমিজ মেইয়্যার রোপ, যেন নিশির ডাক। ঘর ভুলায়, সংসার ভূলায় সব ভুলায়।

তখন ওর সঙ্গে সুর মিলিয়ে কিশুন ও ঝুমুর গাইত। ওদের এই আকৈশোর অন্তরঙ্গতার কথা গোঠালীর সবাই জানে। ওদের ছেলেবেলার সেই হাল্কা গোলাপী রং গাঢ় এখন হ'য়েছে।

গোচারণের ঝাঁকে ঝাঁকে অবসর মুহূর্ত্তগুলি ভরে উঠেছে গানে, গল্পে, রসে, রঙ্গে।

মালতীর মনটা আজ যেন অকারণে কেঁপে কেঁপে উঠছে শরাবিদ্ধ কবুতরের মত। একটা শিরীষ ফুলের হাল্কা পরশের মত পুলকের মত শিহর বইছে সর্বাঙ্গে। মালতীর ঝুমুরে কি এক অজানা বেদনার বানী ঝরে প'ড়তে লাগল। মালতী গাইল

বঁধে প্রেম ডোরে ত্যজিলে আমারে
আর কবে বন্ধু আসে ব্রজপুরে
চাতকিনী প্রায়, আমি তারে চাই,
প্রেমের পিয়াসে মরি গো
শুন সহচরী রহিতে না পারি
কুথা গেল বংশীধারী গো॥

কোথা রহিল বন্ধু মোরে পাশরিয়া
বসন্তের মধু যায় গো ঝরিয়া
জ্বালা যে সহিতে নারি গো,

বাতাসে যেন সঞ্চারিত হ'ল সেই বেদনার সুর। গাছের পাতা গুলোও যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেল অকস্মাৎ। এক জোড়া ডাহুক শুধু একটা নিস্পত্র ডালে বসে ডালটাকে ঠোকরাতে লাগল ক্রমাগত। আর পদ্মর মনে হ'ল ওর মনটাও যেন হঠাৎ কেমন ভারী হ'য়ে উঠেছে। একটা অজানা ব্যথা যেন ওর মনের মধ্যেও গুমরে বেড়াচ্ছে। পদ্ম বুঝল ওর মনেও রঙ্গের ছোঁয়া লেগেছে। সেই হাল্কা নীল রং। যে রং আকাশের অসীমে, যে রং পাহাড়ের গাম্ভীর্য্যে, যে রং অপরাজিতার পাপড়ীতে। পান্নুর উচ্ছাসের কোন প্রকাশ নেই। ঝুমুর ওরও ভাল লাগে। কিন্তু ঝুমুর শুনে মনটা ওর চলে যায় না কোন সুদূরে। চোখ দুটো হারিয়ে যায় না ভাবের সাগরে। গানের দিকে কান থাকলে ওর চোখ থাকে গরুগুলোর দিকে। কখন কে আফরের ক্ষেতে নামছে। আর পদ্ম ঝুমুর শুনলে আবেগে আপ্লুত হ'য়ে ওঠে। ওর মধ্যে একটি চিরন্তণ রাধার বিলাপ গুণগুণ করে। সেসব দিনের কথা ভাবলে বুকটা অত্যন্ত ব্যথায় টনটন করে ওঠে। স্মৃতি তাদের কাছেই মধুর, যারা সেই স্মৃতির উপরে রচনা করেছে সার্থকতার সৌধ। কিন্তু পদ্মর কাছে স্মৃতি শুধুই বেদনা। পদ্মর জীবনে স্মৃতির প্রদীপ সদাই কম্পমান।

…বেলা গড়ীয়ে বিকেল হ'ল। মাতব্বর এখনও ঘরে ফিরল না কেন? পদ্ম চিন্তিত হয়। এত বেলা পর্য্যন্ত গাঁয়ে থেকে কোনদিন বাড়ী ফিরতে দেরী করে না ঈশ্বরী। শুধু মাঝে মাঝে ওর কি যে হয়…তখন যেনও নিজের কাছ থেকেই দূরে সরে থাকতে চায়। নিজের কাছেই যেন কি একটা গোপন করবার চেষ্টায় নেশা করে বুঁদ হয়ে থাকে মাতব্বর। গাঁয়ের লোকের কাছেও একথা অজানা নেই। কিন্তু কেউ কিছু মনে করে না। সবাইকার মনেই 'দুঃখু' থাকতে পারে। যে দুঃখু সবাইকে বলা চলে না। সেই 'দুঃখুকে' ভুলবার জন্যে মদ যেতে হয়। তাছাড়া মাতব্বরের কথা আলাদা। সুর্য্যের কোন ছায়া নেই, গঙ্গার জল অববিত্র হয় না। আর মাতব্বরের কোন কলঙ্ক লাগে না। সমস্ত গ্রামের সুখ দুঃখের মুস্কিল আসান সে।

পদ্মর মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি মারে। তাহ'লে কি আজও? এবং সেই মূহর্ত্তের 'কুলীমূড়া', থেকে কার জড়িত কণ্ঠে গানের সুর শোনা গেল।

'রাধা তোর তরে আমি কদম তলায় বস্যে থাকি।'

পদ্ম কান পেতে ঠাওরাবার চেষ্টা করল। তারপর ওর আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। মাতব্বর। ঈশ্বরী। ঈশ্বরী ছাঁচ তলায় এসে দাঁড়ায় তারপর দরজাটা খুঁজবার চেষ্টা করে। ঈশ্বরী নেশা করে সখে সাধে একবার। তাই নেশাটা বড়জোর লেগে যায়। সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে যায়। আর মনটাও যেন কেমন ওলট পালট হ'য়ে যায়। সব দুঃখ গুলো যেন বন্ধুদের মত হাওয়ায় উড়ে যায় ও গোয়াল ঘরের দাওয়ার ওপর উঠে দরজাটা হাতড়ায়। দরজাটা কাঁপা কাঁপা হাতে খুলে ঘরের মধ্যেঢুকে গোবরের ওপর পা ফেলে পিছলে যায় ঈশ্বরী। তারপর আপন মনেই বলে 'ই শালার দুয়ারটি কুথায় হারাল্য হে। ঘরে ঢুকব বল্যে দুয়ার খুললাম পৌঁছে গেলম গোয়াল ঘরে। হিঃ,হিঃ, মন্দিরে যাব বলে কুলীতে দিয়ে পা শালা পৌঁছে গেলম মদভাটীতে হিঃ হিঃ'…বাইরে বেরিয়ে আবার দরজা হাতড়ায় মাতব্বর। তিয়াসির ভুমিজদের সুখ দুঃখের দিশারী নিজের ঘরের দরজা খুঁজে পায় না। ঈশ্বরীর সাড়া পেয়ে পদ্ম বেরোয়

কেরোসিনের কুপী হাতে নিয়ে। ঈশ্বরীর চোখের সামনে একটী দীপান্বীতা নারীর ঘুম কেঁপে কেঁপে ওঠে। কিন্তু ওর অবচেতনার একটা সত্য সব সময় গুঞ্জরিত হয় সে নেই। সে নেই। তাকে ভুলবার জন্য তার স্মৃতিকে আবছা করবার জন্যই তো এত আয়োজন!

পদ্মকে দেখে ঈশ্বরী নিজের বেসামাল অবস্থার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হয়। মুখটা প্রায় মাটীতে নামিয়ে বলে 'বিটি, আমি আজ মদ খেয়েছি।'

পদ্ম সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলে 'চল ভিতরে চল। সেই দু পহর থেকে ভাতের থালা লিয়ে বস্যে আছি। একটা খবর ত' পাঠাতে হয়। আমি সারাটা দিন ভাবনায় মরি।' 'পদ্মর চোখে জল এসে যায়।

'তু রাগ করিস না বিটি। তু রাগ করিস না। তুর অনেক কষ্ট, আমি জানি। তাই ত' সেসব দুঃখ ভুলে যাবার জন্য মদ খাই।'

পদ্ম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে আমার দুখ আমারই থাক। তুমি এমন কর্যে দুঃখু ভুললে আমার দুঃখের বোঝা বাড়ে। আমার আর কে আছে বল। তুমি যদি এমুন কর, তুমি যদি চোখ বুজো তবে আমার মত দুঃখিনী আর কে আছে?'

পদ্মকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে ঈশ্বরী 'তু কাঁদিস না বিটি। মদ খেল্যে আমার কি হবেক। আমি শালা মদের সমুদ্র পান কর্যে দিলে কিছু হবেক নি। শরীলটি দেখছিস! 'সৎসার' কাঠের মতন শক্ত। এত জলদী চোখ বুজব নাই রে বিটি। দে খেত্যে দে।'

এই লোকটার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের কাছে কেউ মাথা তুলে কথা ব'লতে পারে না অথচ এখন কত মুখর কত প্রগলভ।

ভাত খেতে খেতে ঈশ্বরী বলে 'বিটি, ইবার তু একটি বিয়া কর।'

পদ্ম ঈশ্বরীর বাটীতে খানিকটা আমানী ঢেলে দিতে দিতে বলে 'তাহল্যে তুমাকে দেখবেক কে। কে ভাত রেঁধে দিবেক?'

'উ কথা বল্যে আমার কথাটি এড়্যাস না বিটি। আমার জন্যে ভাবনা কি। তখন তোর ঘরেই দু মুঠা ভাতের জন্যে পাতা পাড়ব।

তোর ছেল্যা গুলিনকে খেলাব। তোর ঘর রাখা করব, গরু ছাগলের তদারক দারী করব।' মাতব্বরের মাতাল চোখদুটো একটা মিষ্টি স্বপ্নে আতুর হ'য়ে ওঠে।

পদ্ম হাসে মিটি মিটি। 'তাকি হয়। তুমি হল্যে তিয়াসির মাতব্বর, তুমার কি ছেল্যা বাগালী সাজে।'

'লিজের বিটির ছেল্যা বাগালী করব তাতে কুন শালার কি? আমি শালা মাতব্বর হই আর ঝাড়ুদার হই?' অকস্মাৎ রেগে ওঠে মাতব্বর। কিন্তু সব কিছুই কল্পনার ইমারত।

মাতব্বরের মনটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। পদ্ম বালিকা, তাই বোঝে না সঙ্গ হীনতার বেদনা বড় দুঃসহ। আর বিশেষ করে প্রিয়জন সঙ্গ। তখন দুনিয়ার সব কিছু থাকলেও মনে হয় কিছুই নেই। এখন যৌবনের উন্মাদনার এই প্রয়োজনীয়তা ঢাকা প'ড়ে যাবে নানান চাহিদার আড়ালে কিন্তু পরিণত বয়সে মন যখন চাইবে একটি নিরুদ্বেগ আশ্রয়ের আশ্বাস, নিশ্চিন্ত আরামের হাতছানী তখন নিজেকে মনে হবে একা। সম্পূর্ণ একা। পৃথিবীর এত মানুষের মাঝেও একা। সে কথা বলা চলে না পদ্মকে। অন্তত আজ, এখন। মাতব্বরের শুধু মনে হয় মনের মতন মানুষ কেন পাওয়া যায় না? মানুষ পাওয়া গেলে তারা মনের মতন হয় না কেন? আর মনের মতন যদি বা পাওয়া যায় তাদের নিয়ে ঘর বাঁধা যায় না কেন? এই জটীল তত্ত্বগুলো ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে মাতব্বর। পদ্ম ওর দিকে একবার স্নেহময়ী মায়ের মত তাকায়। পাটীটা ঠিক করে দেয়। মাথা থেকে গামছাটা খসিয়ে দেওয়ালে গোঁজা সিঁ-এ টাঙ্গীয়ে দেয়। তারপর কেরোসিনের কুপীটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ে।

আজ সন্ধ্যায় বাবার থানে ওদের মজলীস। মাতব্বর সেই সকাল বেলাতেই নীলকণ্ঠকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে। বাবার থানে তালাই বিছিয়ে জল, হুঁকো সব তৈরী রাখতে হবে। তাছাড়া এবারে একটা নতুন ব্যবস্থার সূচনা করেছে মাতব্বর। এবারে কিছু চুটী তামুকেরও ব্যবস্থা রাখতে বলেছে ছেলে ছোকরাদের জন্য। বয়ো

জ্যেষ্ঠদের সামনে প্রাণ খুলে ধূমপান করতে পারে না ওরা। ধোঁয়াটি না হয় দেখা গেল তাই বলে হুকাটিও। যদি দেখা যায় তাহ'লে তা বিষম লাজের কথা। ওটিকে আড়াল করে রাখতে হবে। বেরোবার মুখেই মাতালী বুড়ী বকবক সুরু কুরে 'দেখ্যে এলম বাপ ঈশ্বরী। সন্ন্যাসী ত' সন্ন্যাসীই। কি বা সোন্দর চেহারাটি। কি বা রোপ। আমি 'ভালো' রইলম ত' ভাল্যেই রইলম। আর কি বা সুমেষ্ট বচন। আমি ত' শুনে 'ভাক্যাই' গেলম বাপ। এই কচি বয়সে এত গেয়ান'।

মাতব্বর বুড়ীর কথা শুনতে শুনতে মজলীশে যাবার জন্য তৈরী হয়। ক্ষারে কাচা একটি ধূতি পরে। তার উপরে বকুল নগরের হপ্তা হাটে বাহার মিঞার দোকানের একটা ডোরাকাটা পিরান চড়ায়। পরিপাটী করে চুল আঁচড়ায়। তারপর কাঁচা চামড়ার জুতো জোড়াতে পা গলায়। জুতোগুলো পরলেই পা দুটো কেমন যেন টনটন করে। তা সত্ত্বেও পরে। এটাই মাতব্বরের বিশেষত্ব। মাতালী বুড়ী ব'লেই চলে 'সিবারে যে সন্ন্যাসী আস্যেছিল, সিটি ছিল মহাকালের বছর (মহাকাল অর্থাৎ মহাআকাল)। দেবতার কোধে সি বছর বর্ষায় বিষ্টি নাই। আকাশটি গরম লোহার মতম তপ্ত। গোটা আষাঢ় গেল, শাত্তন গেল এক ফোঁটা বিষ্টি নাই। ধরিত্তির ফেটে চৌচির হ'য়্যে গেলেন। শালুকডুংরীর 'ঘাস-পালা' শুক্যাই 'লিবন্ন' হয়্যে গেল। কানস'নার জঙ্গলটি লিপাতা, লিজস্ত হয়্যে গেল। অমন 'ভয়ানক' 'ভয়ানক' জন্তু জানোয়ার গুলিনও কুথায় হারাই গেলেন। আকাশে পাখী মরল। জঙ্গলে জানোয়ার। লোকে বলল বাবা, ই যে বর্ষা কালেও 'লিরন' হে। কত লোক মরল্য গরমে আর কতোবা মরলেন অনাহারে। পাখ পাখুড়ী গুলিন ও দেশান্তরী হ'লেন। সিবারে একজন সন্ন্যাসী আস্যেছিলেন ই গেরামে। হেঁট কুলীর লটবরের কত্তা বাবা লাগর সিং তখন ই গেরামের মাতব্বর। আহা সন্ন্যাসী বাবার কি বা চেহারা। বট ব্রেক্ষর শেকড়ের মতন ছোঁয়া জটা। হাতে বাবার তিরশুল। সি এসে বল্লেক বাবার তিষ্টা পেয়্যেছে। সি তিষ্টা না মিটাল্যে 'আশ্চয্' নাই।'

সেটা মন্বন্তরের বৎসর। তিয়াসির বাস্তবিকই দুর্দ্দিন। দিনে রাত্রিতে শান্তি নেই। সারাদিন পাহাড়তলীর দুঃসহ গমম আর সারারাত ধরে একটা অশরীরি চীৎকার। আঃ আঃ আঃ চুক্ চুক্ চুক্। একটা অতৃপ্ত আত্মা যেন তেষ্টায় মাটী শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। শালুক ডুংরীতে সেবারে নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে 'চিরকূন' দেখা গিয়েছিল। ওদের ধারণা ছিল যারা এই মন্বন্তরে মারা যাচ্ছে তাদেরই আত্মা চিরকূন হয়ে শালুকডুংরিতে ঘুরে বেড়ায়। সেবারেই বাবার তিয়াস মেটাতে গাঁয়ের লোক সবাই শ্রম দিয়ে কালিন্দী সায়র খনন করল।

তারপর সন্ন্যাসীর বিধান ছিল বাবার থানে একটা নতুন কলসিতে জল ভ'রে নতুন সরা দিয়ে ঢেকে আর একটা নতুন সরায় ভিজে ছোলা দিয়ে বাবার থানে রেখে আসতে হবে। সঙ্গে পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চ গব্য, পঞ্চ পুষ্প ইত্যাদি পঞ্চ উপাচার। গাঁয়ের মোড়লকে তিন দিন উপবাস করে থাকতে হবে তার পর নতুন কাপড় পরে নতুন গামছা দিয়ে গা ঢেকে মাথায় করে সেই সব উপাচার পৌঁছে দিতে হবে বাবার থানে। সেই থেকে আষাঢ় সংক্রান্তির দিন তিয়াসির মাতব্বরকে এই সব নিয়ম পালন করতে হয়ে। এসব কাহিনী দীর্ঘ-দিনের পুরোন। মাতালীর তখন জোয়ান বয়স। সদ্য বিয়ে হ'য়েছে। কিন্তু স্বামির ঘরে মন বসে না। মন পর পুরুষে আসক্ত। সে হ'ল সুচাঁদ ঝুমুর ওয়ালা। সন্ন্যাসীকে দেখার ছল করে মাতালী বাঁকা পোলের কাছে এসে মিলিত হ'ত। সেই হ'ল ওর কাল। এই বাঁকা পোলের কাছেই সুচাঁদ একদিন মাতালীর জন্য প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু তখন শমন ওর শিয়রে। অকস্মাৎ কালসাপে দংশন করল আর—

বুড়ীর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এতসব কথা বলে না বুড়ী। শুধু বলে 'সন্ন্যাসীকে নিয়ে একটি ঝুমুর বেঁধেছিল সুঁচাদ ওয়ালা। কি যেন কলীটি…'বুড়ী স্মরণ করবার চেষ্টা করে। সুঁচাদের কথা উঠলেই মোড়লের মনটা যেমন যেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। একটা লজ্জা মেশানো বেদনায় মনটা যেন কেমন গুমরে গুমরে ওঠে। নাই বা হ'ল নিজের মা। কিন্তু মানুষ করেছে তো। তারই

কলঙ্ক কালিন্দী। অথচ মাতালী এটা কলঙ্ক বলে স্বীকার করে না। 'একজনের সঙ্গে ভালবাসা হ'ল্যো কি কলঙ্ক হয়' মাতালী বলে 'কলঙ্ক হয় বারসোহাগীদের। বার জনের মন ভুলায়।'

এবারে তিষসির সুবৎসর বলা যায় গত বর্ষাতে বৃষ্টি হ'য়েছে ভাল। ফসলও ভালই উঠেছে। তাছাড়া গরু ছাগল যারা পোষে তারাও খুশী। শালুক ডুংরীতে প্রচুর ঘাস। সে ঘাস খেয়ে গরুর দুধ বেড়েছে। ছাগলের ঝাড় বেড়েছে। একসঙ্গে চারটে বাচ্চা বিইয়েছে। কাজেই সন্ন্যাসীর আসাটা শুভ ব'লেই মনে হ'চ্ছে। নীলকণ্ঠর কথাটা মনে পড়ল। সন্ন্যাসীকে এই গাঁয়েই রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। গাঁয়ের বিপদ আপদ, কল্যাণ অকল্যাণের মুস্কিল আসান। এই সুত্রে আর একটা কথা মনে হয়। মালতী বুড়ীর বয়সে হয়েছে। তাছাড়া মাতব্বরের মাও বটে ব'লতে গেলে ওই সব চেয়ে 'পবীন'। ওর একটা অনুমতি নেওয়া দরকার।

'বুঝলে মাঈ' ঈশ্বরী আসল কথাটির ভূমিকা পাড়ে 'আমাদের গাঁয়ে বিপদ আপদ, আবিষ্টি অজন্মা ত' লেগ্যেই আছে। কথায় বলে নাই পাহাড় ক'লে বাস, দুঃখু বার মাস, সি জন্যেই আমি ভাবছি আমাদের গাঁয়ে যে সন্ন্যাসী এস্যেছে তাকে গাঁয়েই থাকতে বল্লে কেমন হয়?'

আহারে এই না হলে মাতব্বর। কথাটা বুড়ীর খুবই ভাল লাগে। গাঁয়ের ধরম, করম পাপ পুণ্যি সবই ত ওরই মাথার উপর।' আরও ভাল লাগে বুড়ীর অনুমতি চাইছে বলে। আহা হা। 'রীত করণ' না জানল্যে কি মাতব্বর হওয়া যায়?

'ঠিক বুল্যেছিস বাপ। তুই গেয়ানী লোক। তুর উপরে আর আমি কি বলব।'

'না, না তবুও তুমি হল্যে গে গাঁয়ে সব থিকে পবীন লোক।'

বুড়ী পুলকিত হয়। আহা। বেঁচে থাক। মাতব্বর চালায় গোঁজা পাকা বাঁশের লাঠিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

লোকজন জমতে সুরু করেছে বাবার থানে। উপর কুলীর দ্বিজপদ, বেজ, লখীন্দর, হেঁটকুলীর যোগীন্দ, লটবর, চম্পাই তাছাড়া কিশুন,

শশীকমল, এরাও সবাই এসেছে। তালাই এর এক প্রান্তে একটি ছোট মত জল চৌকি। একটি কলসি আর একটি কাঁসার গেলাস। কোনায় ঠেসানো একটি হুঁকো। আয়োজন পরিপাটী। নীলকণ্ঠর উপরে ভারী সন্তুষ্ট হয় মাতব্বর। বাঃ চমৎকার।

'ই যে যাত্রা দলের আসরটি করো দিয়েছে হে বলিহারী। মাতব্বর আসার সঙ্গে সঙ্গেই বেজ, জটাই, লটবর ইত্যাদি কয়েকজন উঠে এসেছিল। বসেছিল কিশুন আর শশীকমল। শশীকমলের মেজাজটা সকাল থেকে ভাল নেই। আবার সেই শাশুড়ী বৌ এ ঝগড়া। না জীবনটা তেত বিরক্ত করে দিল। কোথাও শান্তি নেই। এমন কি নেশা করেও শান্তি নেই। যা গলার আওয়াজ নেশা ঢাকীর ঢোলের মত চড়াৎ করে ফেটে যায়। মুখ ব্যাজার করে বসেছিল শশী। আর কিশুনের দৃষ্টি উদাস। সন্ন্যাসীর জন্য অপেক্ষা করছে ও। সন্ন্যাসী আজ ওর চঞ্চল মনটাকে শান্ত করেছে।

'উ জল চৌকিটাতে কি সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঠাঁই হয়েছে ন কি?' শুধোয় লখীন্দর।

'হবেক কে জান্' বেজ বলে।

'নীলু ছেল্যেটির বুদ্ধি আছে ব, ইটি মানতেই হবেক।'

লটবর বলে 'তাত বটেই ব খুড়া। বকুল লগরের ইস্কুলে পড়্যেছে। হাজার হোক আমরা হলম মুখ্যু মানুষ, আমাদের সঙ্গে উয়ার তফাৎ থাকবেই নাই।'

উপর কুলীর লখীন্দর আর ঈশ্বরী প্রায় সমবয়সি। তবে লখিন্দর নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। জাতে ভূমিজ হলেও ও ছুতারের কাজ করে। গ্রামের সবারই হাল, কোরল, গরুর গাড়ীর চাকা, দুয়ার বন্ধ কাদাপাটা, ইত্যাদি ওই তৈরী করে। লখিন্দর মিত ভাষী। তবে সমাজ সংসার ছাড়েনি। যেখানে যতটুকু করা প্রয়োজন তাই করে।

'তা ই মজলীশটি ডেকেছে কিসের লেগ্যে হে মাতব্বর? লখিন্দর শুধোয়।

মাতব্বর ওর স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলে, 'কারণ আছে লখিন্দর। অতি গুরুতর কারণ। আর সিটি সম্বন্ধে তুমরা গেরাম বাসীরা মত না দিলে আমি লিজে একার মতে কিছু করতে লারব।'

'কিন্তুক বেত্তান্তটি কি?' বেজ, লখীন্দর, আর লটবর, তিনজনাই জানতে উৎসুক।

'জানতে পারবে আর খানিক পরেই। অত হুড়বড়্যাছ কেনে হে।'

কিছুক্ষণ পরে আসে নগাই আর পীতাম্বর। নগাই এর চোখ দুটো বিস্ময়ে আবিষ্ট। কিসের বিস্ময় কে জানে। তারপর নসীরাম, বৈশাখ্ আর নিশিকান্ত। আস্তে আস্তে আরো অনেকেই। মজলিশ বেশ জমজমাট। সবার শেষে আসে সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে ঈশ্বরী। দেখা দেখি আরও অনেকেই। সবার শেষে নীলকণ্ঠ।

সন্ন্যাসী স্মিত হাসি হেসে বলে 'আমাকে কিসের লেগ্যে তলব হইছে মাতব্বর।'

মাতব্বর লজ্জায় জীভ কাটে। 'ছিঃ ছিঃ উ কথাটি বল নাই হে। আমি 'ক্ষুদ্দ পাণী'। আমি তুমাকে কি তলব করব। তবে আমাদের গেরাম বাসির একটি পাথ্না আছে। সি পাথ্না টি তুমার কাছে নেবেদন করব। তাই তুমাকে দুটি পায়ের ধুলা দিতে ডেক্যেছি হে।'

কথাগুলো বলে ঈশ্বরী বেশ তৃপ্তি লাভ করে। যথেষ্ট সহবতের সঙ্গেই কথাগুলো বলেছে ও। হাজার হোক মাতব্বর তো।

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে সবার সঙ্গে একসঙ্গে তালাই এর ওপর বসে পড়ে। 'তা তুমরা আমার আশ্বয় দাতা ভগবান। তুমাদের কথা শুনতে হবেক বৈকি।'

নীলকণ্ঠ সন্ন্যাসীর কাছে এসে মৃদু কণ্ঠ বলে 'কিন্তুক সন্ন্যাসী, হুই কোনায় 'চৌকি ছা' ওটির উপরে তুমার বসবার জায়গা হইছে হে।'

সন্ন্যাসী সঙ্কুচিত হয়। 'না ভাই। আমি পথের মানুষ। হাজার জনের সঙ্গে এক সঙ্গে পথ চলি, একসঙ্গে উঠা বসা করি। আলাদা

জায়গায় বসলে আবার 'অহং' ভাবটি বেড়ো যাবেক। আর তুমরাও আমাকে আপন ভাববে নাই। কাজ কি বিপাকে পড়্যে।'

কিন্তু নীলকণ্ঠ খুঁত খুঁত করে। সন্ন্যাসীর মনে হয় নীলকণ্ঠর এই আহ্বানটা নিতান্তই লৌকিক। কোথায় যেন অন্তরঙ্গতার অভাব আছে। সন্ন্যাসী আসে পাশের মানুষদের সঙ্গে হাসি মুখেই গল্প করে।

মজলীশ আরম্ভ হয়। খানিকটা গ্রামের সুখ দুঃখের কথা বলে তারপর মাতব্বর আসল কথাটি পাড়ে।

'শুন হে গেরামবাসীরা। উপরকুলী-মাঝকুলী—হেঁটকুলীর পঞ্চজনা, আমাদের ভাগ্যি বশে আমাদের গেরামে একজন সন্ন্যাসী আস্যেছেন, ই কথা এত দিনে জানতে তুমাদের বাকী নাই। কারণ সন্ন্যাসীর সেবার ভারটি তুমরাই নিয়েছ। সন্ন্যাসী হ'লেন গে মানুষের সঙ্গে ভগবানের লেন দেনের ব্যাপারী। ইনাকে গেরামে রাখল্যে গেরামের মঙ্গল। গেরাম বাসীদের মঙ্গল। তবে সন্ন্যাসী মানুষ ভগবানের নাম কর্যে দিন কাটান। সি জন্যি আমি ভেব্যেছি যে তিয়াসি বাবার থানে একটি মন্দির তৈরী কর‍্যাই দিব। সিখেনে সন্ন্যাসী ঠাকুর থাকবেন। গেরামের সুখু দুঃখ বিপদ আপদে সলাপরামশ্য দিবেন। আর মন্দিরে ঠাকুরের নাম গান করবেন।

সন্ন্যাসী কিছু বলার জন্য উদ্যোগ করছিল। সেটা লক্ষ্য করে ঈশ্বরী বলে 'ই কথাটি আমি এখনও সন্ন্যাসী ঠাকুরের চরণে নেবেদন করি নাই। তুমাদের যদি মত হয় তবে ই গেরামে থাকবার জন্যি তুমারা লিজ মুখে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বলতে পারো। তিনি মজলিশে আস্যেছেন। আর এত লোকের কথাটি তিনি পায়ে ঠেলতে পারবেক নাই।'

'ইটি যে বড় বেপদে ফেল্লে হে করুণ সুরে সন্ন্যাসী বলে।' 'আমি চেরকাল পথে পথে ঘুরে বেড়্যাইছি, পথ আমাকে টানে। পথের টানে আমি কি ঘরে রইতে পারি হে? ই যে বনের পাখীকে সোনার শিকলে বাঁধার অবস্থা হ'ল। সে যাই হোক, যদি পথের 'ঠাকুর আমাকে টানে,

আমাকে চল্যে যেতে হবেক, সি দোষ আমার লয়, সি দোষ আমার ঠাকুরের। তবে তুমাদের কথা আমি ঠেলব নাই হে। থাকব, তুমাদের গেরামে যতদিন আমার কপালে তুমাদের দেওয়া পরমান্ন তুলা আছে।'

গ্রামের লোক সমস্বরে হৈ হৈ করে ওঠে। প্রস্তাবটি বড় মনে ধরেছে। বিশেষ করে মন্দির তৈরীর ব্যাপারটাতে ওরা বিশেষ উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে। গ্রামের একটা ওঠা বসার জায়গা হবে। সেইখানেই মজলীস বসবে সেই মজলীশে সব সমস্যার সমাধান হবে। সব আচরণের বিধান দেওয়া হবে।

মজলীশের এককোণে বসেছিল পীতাম্বর আর নগাই। পীতাম্বর হাঁপাচ্ছিল। কি যেন বলার আছে পীতাম্বরের। নগাই পীতাম্বরের বক্তব্যটা মোটামুটী জানত। বিমুগ্ধ নয়নে পীতাম্বরের দিকে তাকিয়েছিল নগাই। পীতাম্বর শ্লেষ্মা জ্বরের রোগী। মাসের মধ্যে পনের দিন শয্যাশায়ী। ভোমর বৌই বলতে গেলে সংসার চালায়। যদিও বছরে একবার করে সন্তানের জন্ম দিতে হয় তাকে। বছরের অধিকাংশ সময় সেই দুরূহ ভার বয়েও সংসার চালায় ভোমর বৌ। কি, যেন খেয়াল হ'য়েছে ভোমর বৌ এর, এবার গাজনে ও 'ভক্তা' হবে। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিল পীতাম্বর কিন্তু শোনেনি। 'ভক্তা' হওয়ার অনেক কষ্ট বলেছিল পীতাম্বর। কিন্তু ওকে থামিয়ে দিয়েছিল ভ্রমর বৌ। বলেছিল এমন বছর বছর বিয়োনোর কষ্ট থেকে তো কম। আর কিছু বলতে পারেনি পীতাম্বর। তবে এসব ব্যাপারে মাতব্বর বা দশের মজলীশের একটা অনুমতি দরকার তাছাড়া ঐ ব্যাপারটা তিয়াসিতে অভূতপূর্ব্ব। মেয়ে মানুষের ভক্তা হওয়াটা অশ্রুত পুর্ব ঘটনাও বটে। হাঁপাতে হাঁপাতেই উঠে দাঁড়িয়ে পীতাম্বর বলে 'মজলীশের কাছে আমার একটী নেবেদন আছে।

'বলে ফেল।' আশ্বাস দেয় মাতব্বর।

'ইবারের গাজনে আমার পরিবারটি ভক্তা হত্যে চলছেন।' সভা বিস্ময়ে হতবাক। শুধু নগাই এর কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। ও চিরবিস্মিত। কিন্তু এ কেমন কথা? মেয়ে মানুষ ভক্তা? আর ভক্তা

হওয়ার কম কষ্ট নাকি? একটা শিক পিঠের চামড়া এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে একটা 'টেড়ঁা ডাঙ্গে' করে শুন্যে ঝুলিয়ে রাখবে। বিস্ময়ের প্রাথমিক পর্য্যায়টা সামলে মাতব্বর বলে

'উ যাই বলুক না কেনে, তুমি কি কর‍্যে কথাটি মজলীশে পাড়ল্যে হে? একটা লায্যালায্য গেয়ান নাই? উ না হয় মেইয়্যা মানুষ বটে, বলি তুমি ত মরদ, না কি?'

পীতাম্বর ঘাবড়ে যায়। 'আমি বুল্যেছিলম মাতব্বর কিন্তুক—'

'কিন্তুক কি?' মাতব্বর ঝাঁঝিয়ে উঠে 'কিন্তুক তুমার কথা শুনে নাই। যে মানুষ পরিবারকে বশে রাখতে পারে নাই, সি তো মেইয়্যা মানুষের অধম হে। আজ বলবেক ভক্তা হব, কাল বলবেক 'ফুল গুঁধা' করব, পরশু বলবেক আরও কত কি—। চট করে কথা আসে না মাতব্বরের মুখে।

'তবে হঁ, দণ্ডি হত্যে পারে। যদি কুন মানত-টানত থাকে তবে দণ্ডি হত্যে পারে।'

পীতাম্বর আর কথা বাড়ায় না। এই কথাই বলবে ও ভোমর বৌকে 'দণ্ডি হবে ত হও' ওসব ভক্তা টক্তা হওয়া চলবেক নাই। মাতব্বর বারণ কর‍্যেছে।'

হঠাৎ মজলীশের পিছনে একটা জোর গোল শোনা যায়। এর মধ্যে শশীকমলের গলাটাই স্পষ্ট।

মাতব্বর কান পেতে শোনে। ব্যাপারটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করে। শশীকমল তারস্বরে চীৎকার করে 'ডাহিনে' খেয়্যেছে ত আমি কি করব? গুনীনকে ডাকুক কেনে? সকাল থেকে চিল্লাই চিল্লাই ত শাশুড়ী বৌ এ ঘর ছাড়া করলেক আমাকে। একটুকু যে লেশা কর‍্যে মনের দুঃখু ভুলব তার উপায় নাই। লে শাল্যা বৌকে ডাহিনে খেয়্যেছে। কেনে, ডাহিন কি আমাকে খেতে পারে না?'

ব্যাপারটা ডাইনী সংক্রান্ত। মাতব্বর ভীড় ঠেলে এগিয়ে যায়। 'কি হইছে কি, অমন বলদের মত চিল্লছিস কেনে?'

মাতব্বরকে দেখে খানিকটা ভরসা পায় শশীকমল' অসঠা দেখ না কেনে, বৌকে ডাহিনে খেয়্যেছে। ডাহিনে খেয়্যেছে ত আমি কি করব ?'

'তুমার বৌকে ডাহিনে খেল্যে তুমি আর কি করবে, যা করবার করবেক শ্রীপতি রজক' মাতব্বর ভেংচে ওঠে 'যা হতভাগা, ঘর যা, 'গুণীণকে' ডেকে এন্যে ঝাড় ফুঁক করা।'

ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীও শশীকমলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। মাতব্বর সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে বল্ল 'যা সন্ন্যাসীকেও বরং লিয়ে যা। তুটি পায়ের ধূলা দিবি। ভাল হয়্যে যাবেক।'

'না, না আমার যাবার পোয়োজন নাই।' সন্ন্যাসী সঙ্কুচিত হয় 'কুন ভাল কুবরেজকে ডাক দেখিনি।'

'কুবরেজ' ? সবাই আশ্চর্য্য হয়। মাতব্বরও। সন্ন্যাসী বলে কি। 'ডাহিনে খেয়্যেছে তার কুবরেজ কি করবেক হে ?'

'ডাহিন টাহিন সব মিছে কথা মাতব্বর। সব আমাদের মনের ভ্রম। আসলে, অসুখ কর‍্যেছে শশীকমলের পরিবারের। মনের অসুখ। মনের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ। দেহটিকে সারালেই মনটিও সারবেক।'

'কিন্তুক ওঝা টোঝা'—সন্ন্যাসী বাধা দিয়ে বলে 'কুবরেজ চিকিৎসা করলে চেরকালের মতন সারবেক আর ওঝাতে ঝাড়ল্যে তুদিনের মতন। তবে হঁ, ওঝা না ডাকলেও তুদিনের মতন সেরে যাবেক। মনের সান্ত্বনা গুণীণ ওঝাকে দেখানো।'

সবাই বিস্মিত হয় সন্ন্যাসীর কথায়। ওদের এতদিনের বিশ্বাস ও সংস্কারের মুলে ঘা দিয়েছে সন্ন্যাসী। ওরা সহসা সন্ন্যাসীর কথা বিশ্বাসও করতে পারে না, ঠ্যাৎও করতে পারে না। ওদের মন দ্বিধা ও সংশয়ে দোলায়িত। ওরা দল বেঁধে শশীকমলের বাড়ীর দিকে যায়।

উঠোনে, শশীকমলের বৌকে ঘিরে বসেছিল পাড়ার মেয়ে বৌরা। ভোমর বউ ওর বিস্রস্ত বেশ বাস বিন্যস্ত করে দিচ্ছিল আর ক্রমাগত

নিজেকে বেআব্রু করে তুলছিল শশীকমলের লাজুক বৌটি। উদোম মাথায় এলো চুলে উঠানে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছিল বৌটা। মাঝে মাঝে একটা অমানুষিক চীৎকারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছিল। যেন একটা বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করছে ও। দাওয়ায় বসে কপাল চাপড়াচ্ছিল শশীকমলের মা। কি যেন একটা দ্রব্যগুণ প্রস্তুত করছিল লায়া গুণীণ। মেয়েরা ফিস ফিস করে জটলা করছিল। শশীকমলের সঙ্গে মাতব্বর ঘরে ঢুকতেই ওরা নীরব হয়ে গেল। শুধু শশীকমলের মা ডুকরে কেঁদে উঠল 'ও বাপ আমার ইকি হল্য রে। বহুকে যে ডাহিনে খেল্য, আমি কাকে নিয়ে ঘর করব রে······'

'ও বাপ শশী, তু একবার কাছে যা বাপ। উযে কাউকে চিনতেই লারছে রে······'

'তু থাম দে ত' ধমকে ওঠে শশীকমল। তারপর মাতব্বর আর ও বৌ এর দিকে এগিয়ে যায়। ভোমর বৌ মাথায় ঘোমটা দিয়ে একপাশে সরে যায়। শশীর বৌ নির্বিকার। একটা শূন্য দৃষ্টিতে ও দুরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুকের আঁচল লুটিয়ে পড়ে মাটীতে।

'বৌ, বৌ' শশী ডাকে।

শশীর বৌ আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় তারপর হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার করে ওঠে 'আমাকে লিয়ে যাস না রে লিয়ে যাস না, আমি ইখেনেই থাকব—আ আ···আ···'

বৌএর মাথায় হাত বুলিয়ে শশী বলে 'না বৌ তুর কুন ভয় নাই। ইখেন থিকে কেউ নিয়ে যাবেক নাই তুকে।'

ঝটকা মেরে মাথাটা সরিয়ে নেয় ওর বৌ তারপর চীৎকার করে ওঠে 'কে তুই? সর্যো যা, দুর হয়্যো যা, মেইয়্যা মানুষের গায়ে হাত দিছিস, তুর শরম নাই?

শশীকমল বিস্ময়ে বিহ্বল। কি বলছে ওর বৌ? এই ত গত রাত্রেও গালে মাথায় হাত বুলিয়ে কত সোহাগ করেছে ও। কি হল আজ?

কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে তা নাইলে ওর মত লজ্জা শীলা মেয়ে যখন মাতব্বরের সামনে উদোম মাথায় বসে আছে, যে মাতব্বরকে দেখলে ও সাত হাত ঘোমটা দেয়।

শশীকমলের মনটা যেন গুমরে গুমরে ওঠে।

'বৌ, বৌ কি হইছে তুর 'শশী ধীর স্বরে বৌএর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে। ওর বৌএর ভ্রুক্ষেপ নেই। ও চেঁচিয়ে চলেছে অবিশ্রাম।

লায়া গুণীণের দ্রব্যগুণ তৈরী শেষ হয়েছিল। 'সর দেখি বাপ শশী' গুণীণ বলে 'উয়াকে ছেড়্যে দে তু। উ এখন তুর বৌ লয়। উয়ার উপর অন্য কেউ ভর করে্যছে।'

'কে ভর করে রবেক ?'

'সিটিই ত দেখতে হবেক। তু সর্যে যা।' শশীকমল সরে দাঁড়ায়। গুণীণ এক আঁজলায় জল নিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন মন্ত্র পড়ে তারপর ছুঁড়ে দেয় শশীকমলের বৌএর গায়ে।

শশীকমলের বৌ চীৎকার করে ওঠে 'ওরে জল দিস না রে, জ্বলে গেল সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল'

গুণীণ এবার ওর কড়ে আঙ্গুলটি শক্ত করে ধরে তারপর কঠিন স্বরে জিগ্যেস করে 'কে বটিস তু ?'

শশীকমলের বৌ খিল খিল করে হেসে ওঠে।

'আমাকে চিনতে লারছিস'

না, কে বটিস জলদী বল না হ'ল্যে আবার জল প'ড়া দিব।'

চমকে শশীকমলের বৌ বলল 'বলছি বলছি, আমি বটি, আমি, তু আমাকে চিনতে লারছিস ? আমি ল'পাড়ার গোবিন্দর মা।'

গুণীণের চোখ দুটো রক্ত বর্ণ। চোখের পাতা ঘন ঘন কাঁপে। ল পাড়ার গোবিন্দর মা ?

'তু ই গাঁয় কবে এস্যেছিলি। ?'

মন্ত্রমুগ্ধের মত শশীর বৌ বলে 'সিদিন গো, সিদিন। বকুল নগরে বিটি ঘর যেতেছিলি, 'কুটমালী' করত্যে

'তু ইয়াকে খেলি কেনে ?

'বাঁজা মেইয়্যার ভরা গতরটি দেখে লোভ লাগল্য কি না, তাই।'

'ছেড়ে দে ইয়াকে।' ধীর অথচ কঠিন কণ্ঠে গুণীণ বলে। এলম বাপ। একটুকুন থাকতে দে।'

'চল্যে যা ইখেন থেকে' গুণীণ হুঙ্কার দেয়।

শশীর বৌ নিশ্চুপ।

'দেখবি শালী, এখনই মরীচের 'ধুঙ্গা' দিব।'

শশীর বৌ তবুও নিশ্চুপ।

'লিয়ে আয় ত'রে একটা মরীচ পুড়্যাই। আর একটা মাদারের ডাল। শালীকে 'জাঙ্গলাই' তাড়াব। 'পাছড়াই মারব এখনই।'

গুণীণের ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় শশীর বৌ। 'যেছি গো যেছি।'

'আর কুনদিন আসিস না!'

'না, আসব নাই।' শশীর বৌ তেমনী আলুথালু বেশে কুলীর দিকে ছুটে যেতে যেতে দরজা গোড়ায় পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও।

গুণীণ নিশ্চিন্ত হয়ে বলে 'যাক। চল্যে গেইছে শালী। উ শালী ঘুরাবার তালে ছিল। লায়া গুণীণ কে ত' চিনে নাই।'

তারপর গল্প করতে করতে লায়া গুণীণ আর মাতব্বর বেরিয়ে যায়।

বেশ খানিকটা হাঁটার পর পিছন থেকে কার যেন ডাক শোনা যায়। 'গুণীণ, গুণীণ-হে, হেই মাতব্বর কাকা, একটুকুন দেঁড়িয়ে যাও।'

ওরা দুজনেই থামে। শশীকমল আসছে ছুটতে ছুটতে। আবার কিছু হ'ল নাকি বৌটার। দুজনেই শঙ্কিত হয়। কাছে এসে শশীকোমল বলে 'মাতব্বর কাকা, তুমি এগাও হে খানিক। আমি গুণীণকে একটা কথা বল্যে লিই।'

ঈশ্বরী মনে করে না কিছু। নিশ্চয়ই এমন কিছু কথা যা মাতব্বরের সামনে বলা চলে না। কথাটা কিন্তু এমন কিছুই নয়। গুণীণকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে শশী শুধোয়

'গুণীণ, মেইয়্যাটি বাঁচবেক ত' হে।

'বাঁচবেক বৈ কি' গুণীণ আশ্বাস দেয়।

'হ ভাই তাই বল। মেইয়্যাটি আমাকে বড় ভালবাসে। আর আমিও উয়াকে ভালবাসি। হঁ, বাসি বৈকি। উ মর‍্যে গেলে আমি বাঁচবনি গুণীণ, আমি বাঁচবনি।'

গুণীণ বহুদর্শী মানুষ। শশীকমল গেঁজেল। ও স্বাভাবিক অবস্থায় খুব কমই থাকে। হয়ত এখনও নেই। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে গুণীণের মনে হ'ল শশীকমল ওর অন্তরটি ওর কাছে তুলে ধরেছে। আর সেখানে এতটুকু দাগ নেই। কালিন্দীর জলের মতই সাদা, স্বচ্ছ, পরিস্কার।

'পদ্ম তোর মনের নাগাল পাওয়া ভার' ভোমর বৌ বলে। পদ্ম হাসে জবাব দেয় না। কিন্তু শুধু কি পদ্মরই না তাবৎ মেয়ে জাতটার? ভোমর বৌএরই কি মনের তল ছোঁয়া যায়। এই যে হাসি খুশি বৌটি সদাসর্ব্বদা ঠাট্টা তামাশা নিয়ে থাকে সবাইকার মন ভুলিয়ে রাখে এর মনেও কি কোন জ্বালা নেই? কোন দুঃখ নেই। আছে। পদ্ম জানে। পদ্মর আরও মনে হয় দুঃখ আছে বলেই এত উচ্ছল। ভেতরের দুঃখটাকে বাইরে একটা খুশির খোলস দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়। আর শুধু পদ্ম, নয় ভোমর বৌ নয়। সবাই। দুনিয়ার সবাই।

কলসিটা কাঁখে তুলে জল আনতে যায় দুই সখা। আগে আগে প্রায়ই তামাশা করত ভোমর বৌ 'এখনি কুলী মূড়ায় চইতের 'বাসাত' বইবেক।

'কেনে?' পদ্ম শুধোয়

'ও মা জান না বুঝি? তুমার চোখ ভুলানো মন ভুলানো রোপ দেখ্যে মরদদের বুক গুলি আকুলী বিকুলী করে। কিন্তুক তুমি যে অগ্নি গো। কারো কি কাছে আসার সাধ্যি আছে। ধূরের থিকে কামারের হাপরের লাখান 'নিকাশ' পড়ে। সেই নিকাশেই তো তুমি বেরা্যালে কুলী মুড়্যায় ঝড় উঠে। বাসাত বয়।'

পদ্ম চ'টে ওঠে। 'আ মর আঁঠকুড়ী'

ভোমর বৌএর চোখ দুটো কৌতুকে নাচে। 'উ গালটি দিও না ভাই।' ভোমর বৌ বলে 'ওই নিয়েই তো বেঁচে আছি গো। আর বছর বছর একটি ছেল্যার জন্যি পরিশ্রম করছি। আটকুঁড়ী গালটি দিও না আমাকে।'

কথাটা তামাশা করে বললেও পদ্ম বোঝে এর মধ্যে কোথায় যেন একটা অন্তর্নিহিত বেদনা আছে। পদ্ম একদিন এর কারণ শুধিয়েছিল ভ্রমরকে। 'এই যে বছর বছর আঁতুড়ে ঢুকা, ই তুমার ভাল লাগে?'

'ভাল?' ভোমর বৌএর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে 'ভাল কি আর লাগে ভাই, 'হিস্কাই' গেছি যে। আর কুন কষ্ট হয় না। তবে মায়া লাগে ছেল্যাগুলিনকে দেখ্যে। দু বেলা পেট ভরে খেত্যে দিতে পারি না। আর দিবই বা কুথা থিকে, এতগুলিন ছেল্যা, তার উপর তুমার দাদাটি ত 'চের রুগী লোক।'

পদ্ম চ'টে ওঠে। 'ইদিকে তো চের রুগী, কিন্তুক বছরে বছরে একটি কর্যে ছেল্যা ত' আসছে ঘরে।'

ভোমর মাথা নত করে। এ গ্লানি শুধু পীতাম্বরের একার নয়। ভোমরেরও। এই অগৌরব ওদের দুজনেরই পাওনা। কিন্তু উপায় কি। মেয়ে হ'য়ে জন্ম নিয়ে সন্তান ধারণ করব না। এ কথা তো বলা চলে না। আর সন্তানের সংখ্যাধিক্য নেহাৎ কপাল ছাড়া আর কিছু নয়। এই ত ভোমরের সঙ্গেই যাদের বিয়ে হ'য়েছে তাদের তিনটি কি বড়জোর চারটি ছেলে মেয়ে। অথচ ভোমরের এই বয়সেই সাতটি। আর একটির স্পন্দন ও শুনতে পাচ্ছে নিজের দেহের মধ্যে। অটুট স্বাস্থ্য ভ্রমর বৌএর। এর জন্য কুমারী বয়সে ভারী অহঙ্কার ছিল। এখন মনে হয় এত ভাল স্বাস্থ্য বোধ হয় না হ'লেই ছিল ভাল। তাহ'লে হয়ত ওর এত ছেলে পিলে হ'ত না। অথচ লোকটার প্রতি রাগ হয় না। মায়া হয়। কি আছে ওই চিররুগী লোকটার। সব আনন্দ থেকে সব সুখ থেকে ও বঞ্চিত। কিন্তু এ তো ওদের স্বামি স্ত্রীর জৈবিক অধিকার। তাই পীতাম্বরকে জীবনের একমাত্র আনন্দ

এক মাত্র বিলাস থেকে বঞ্চিত করতে চায়নি ভোমর। আর সেই বিলাসের মাশুল ওর সাতটি অপোগণ্ড ছেলে মেয়ে। আর একটির সম্ভাবনায় ভ্রমর বৌ শঙ্কাতুর।

সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। ঘাটে লোকজন কম। এই সময়েই সাধারণতঃ ঘাটে আসে পদ্ম আর ভ্রমর বৌ। নিরিবিলীতে গল্প করা যায় আর নিঃসঙ্গ মনে গা উদোড় করে স্নান করা যায়। এই সুঠাম দেহ লাবনি, উত্তুঙ্গ যৌবনের অহঙ্কার ওর স্পর্ধিত বক্ষ, হিন্দোলিত নিতম্ব, সুডোল দুটি উরু একজন কেউ না দেখলে যেন তৃপ্তি পায় না পদ্ম। এই যৌবন, এই রূপ এই লাবণ্য তো ক্ষনিকের। এর পর স্বাদ টুকুও আর থাকবে না, শুধু সৌরভটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। তাই যে সম্পদ ও এতদিন আগলে রেখেছে তারই ভাগ দেয় ভোমর বৌ কে।

একটা নিসঙ্গ বক ঘাটের কিনারে বসে আছে। বোধ হয় সারাদিন কিছুই জোটেনি ওর কপালে।

পদ্ম বুকে ওর ডোরা কাটা গামছাটা জড়িয়ে বুক জলে নামে।

একটু রসিকতা করার লোভ সম্বরন করতে পারে না ভোমর বৌ 'উকি, বুকে আবার গামছা জড়ান হছে কেনে, আমি কি বাঘ না মারদ মানুয যে মেরো্য ফেলব।'

পদ্ম ঈষৎ রক্তিম হয়ে জবাব দেয় 'আজ আমার লাজ লাগছে ভোমর বো।'

'আহা তুর লাজের মাথা খাই' ভোমর বৌ ওর বুক থেকে গামছাটা টেনে খসিয়ে দেয়। অসতর্ক মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাতে পারে না পদ্ম। মুহূর্ত্তে ও অসম্বৃত হয়ে পড়ে। নিজের উন্মুক্ত উর্ধাঙ্গের দিকে নজর পড়তেই সহসা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বুক জলে বসে পড়ে পদ্ম। ওর লজ্জা নিবারিত হয় জলের গভীরে। শুধু মুখটুকু বাড়িয়ে পদ্ম গামছাটা চেয়ে নেয়। তারপর গা ধুয়ে ঘাটে ওঠে।

হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে যায় পদ্মর। 'আচ্ছা ভোমর বৌ' পদ্ম শুধোয় 'তুমি গাজনে ভক্তা হত্যে চেয়্যেদিলে কেনে গো।'

সহসা গম্ভীর হ'য়ে যায় ভোমর বৌ। 'উটি আমার লিজের কথা'। লিজের প্রাণের কথা।'

'কাউকে বলা চলে নাই বুঝি ?'

'না, লিজেকেও ব'লতে পারি নাই কথাটি সাহস করো্য।'

'কিন্তুক কেনে ?'

ভোমর চারিদিক তাকিয়ে তারপর ফিস ফিস করে বলে 'অন্যদিন বলব পদ্ম। অন্যদিন। আরেক দিন।'

পদ্ম আর পীড়াপীড়ি করে না।

পদ্ম যখন ঘরে ফিরল সন্ধ্যে তখন উতরে গেছে। কুলী দিয়ে বকুল নগরের হাটুরেরা ঘরে ফিরছে। হঠাৎ অনেকদিন পরে হাটুরেদের গলায় একটা পরিচিত গানের সুর শুনে পদ্মর সর্ব্বাঙ্গে একটা পুলকের শিহরন ব'য়ে গেল। এই গানের সুরে মিশে আছে ওর কুমারী জীবনের যতেক রঙ্গের রসের আনন্দের স্মৃতি। এই গানের সুর কি পদ্ম ভুলতে পারে। হাটুরেদের দুরাগত কণ্ঠের সঙ্গে অস্ফুট স্বরে গলা মিলিয়ে পদ্মও গায়

'সুয্যু করে ঝিকিমিকি,
চাঁদ করে আলা,
তারা দিয়ে গাঁথ্যেছে কে
বেল ফুলের মালা।'

বেল ফুল। বেলফুলের কথা মনে পড়'তেই। বেলফুলের মিষ্টি কতকগুলো এলোমোলা ভাবনা মনের মধ্যে জেগে উঠল।

কিন্তু আজকাল কি হয়েছে পদ্মর? স্মৃতির পাখীটা ফিরে ফিরে একই ডালে যেন ব'সতে চাইছে। এতদিন পদ্ম যেন ধীরে ধীরে ওর নারীত্বের সুগন্ধ টুকু হারিয়ে ফেলেছিল অতৃপ্ত বেদনায় কিন্তু আর কোন দ্বিধা নেই। নেই কোন সংশয়। পদ্মরও আর নারীত্বের লাবণিতে ভ'রে উঠতে, লজ্জার রক্তিমায় রাঙ্গা হ'য়ে উঠতে কোন বাধা নেই। তাই আজ বার বার সেদিনের কথা গুলোই মনে প'ড়ছে।

কিশুন আর মালতীর সেই অন্তরঙ্গ আলাপ।

আর সেই শুনে পান্নুর আক্ষেপ 'আহা, উয়ারা কেমন আছেন' উদাস কণ্ঠে পান্নু বলে।

'কারা ?' পদ্ম শুধোয়।

'কিশুন আর মালতী। লিশিদিন কত গান, গল্প, রঙ্গের কথা, রসের কথা।'

'আহা হা, লাজ ও নাই' মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে পদ্ম। 'বিয়া হবেক বলে এতটি ছেনালী ? আমার গা ঘিন ঘিন করে।

পদ্ম তোর মনের নাগাল পাওয়া ভার। পান্নু ভাবে, তুই রক্ত মাংসের মানুষ ল'স। তোর পরান পাথরে গড়া, তা নাহলে সাধারণ মানুষের ভাল মন্দ লাগার সঙ্গে তোর মেলে না কেন ?' পান্নুর বড় জানতে ইচ্ছে করে, পদ্ম কি কোন দিন স্বপ্ন দেখে না ? কোনদিন তন্দ্রার ঘোরে কি গোঠালীর এই সুন্দর দিন গুলো সোনা হ'য়ে ঝরে পড়ে না। অথবা কোনদিনই কি আগামি দিনের ছায়ায় কোন স্বপ্নের হাতছানি ওর রাত্রির নিদ্রাকে বিঘ্নিত করে না ? একটা অজানা ব্যাথায় ওর বুকটা কি মুচড়ে ওঠে না কোন দিন ?

পদ্ম একটা চোরকাঁটার শীষ দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে বলে 'পান্নু, তুমি ইবার একটি বিয়া কর কেনে ?'।

পান্নু উৎসাহিত হয়। 'কাকে করব ?' মুখের মধ্যে কেমন একটি দুঃখী ভাব এনে পান্নু বলে।

'কাকে তুমার পসন্দ বল' পাল্টা জবাব দেয় পদ্ম 'কানাই সিং এর বিটি কমলিনী ?'...মাধবের ভাগনী ? দশরথ সিং এর লাতিন্ ?' একে একে তিয়াসির তাবৎ কুমারী মেয়ের নাম করে পদ্ম।

বিরক্ত লাগে পান্নুর ? 'তু থাম পদ্ম, মস্করা করিস না।'

চটুল হাসিতে উচ্ছসিত হ'য়ে পদ্ম বলে 'কেনে গো, বিয়ার গপ্পতে মনে ফূর্ত্তি লাগছ্যে নাই ? মনটি তুমার শুকাই গেছে তবে। লিরন দিনের শুকনা ঘাসের মতম।'

একদিন পান্নু সরাসরি জিগ্যেস করেছিল পদ্মকে 'পদ্ম, তু আমাকে ভাল বাসিস ?'

তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়েছিল পদ্ম। 'হঁ ভালবাসি বৈকি।'

পান্নুর মুখটা ক্ষনিকের জন্য চঞ্চল হ'য়েছিল। 'কেমন ভালবাসিস ?'

তেমনী চোরকাঁটার শীষ মুখে দিয়ে পদ্ম বলে 'আমাদের ধলা গাইটির মতন।'

পান্নু ক্ষুণ্ণ হয়। 'তোর সবেই তামাশা পদ্ম।'

পদ্ম গালে হাত দেয় 'হেই মা গো, তামাসা কখন করলাম গো? 'ধর্ম্ম' কর্যে বলছি, আমার ধলা গাইটিকে আমি পরানের থিকে বেশি ভালবাসি। ধলাটি আমার মানুষ লয় ত' তাই তুমার পেত্যয় হল নাই।'

'তোর জন্যে আমার পরানটা আকুলী বিকুলী করে পদ্ম' পান্নু বলে 'আমি ঘরে দুদণ্ড থাকতে লারি। রাত দিন শুধু তোকে দেখবার লেগ্যে আমার মনটি উথলি-পাথালী করে।'

পদ্ম তেমনী নির্লিপ্ত কণ্ঠে চোরকাঁটা শীষটা দাঁতের ফাঁকে রেখেই বলে 'ভাল কথা লয়। কুবরেজ দেখাও। উটি অসুখ বটেন।'

পদ্মর কথায় পান্নুর অন্তরটি যেন ফালা ফালা হয়ে যায়। পাষানী মেইয়্যা। 'আর দাগা দিস না তু আমাকে পদ্ম। তুকে না পেলে আমি বাঁচব নাই।'

সেদিন পদ্ম পান্নুর সব কথাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। পান্নু ভেবেছিল পদ্ম কত হৃদয়হীন কত নিষ্ঠুর। কিন্তু পদ্ম সেদিন হাসির প্রলেপে ঢেকে রেখেছিল ওর রক্তাক্ত হৃদয়টা। এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না। যে পাখীর ডানা আছে কিন্তু ওড়বার শক্তি নেই তার অশেষ জ্বালা।

পান্নুর জিজ্ঞাসার জবাব একদিন পদ্মকে দিতে হয়েছিল। চাষ তখন উঠে গেছে। গোঠালীর রাখালদের আর ক্ষেত-রাখাদের ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় না। ডুংরীতে গরু ছাগল ছেড়ে দিয়ে মেয়েরা জঙ্গলে

কাঠ কুড়োতে যায়। ছেলেরা ঝুমুর গায়, বাঁশী বাজায়। সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে হাসি তামাশা করে। চুটী টানে।

পাহাড়তলীর একটা কাল পাথরের চাঙ্গড়ের ওপর বসে চকমকি ঠুকে চুটী ধরাচ্ছিল কিশুন। পানু একটু আগে বনের পথের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল পদ্মর আসা পথ চেয়ে। কিশুনকে চকমকিটা ধরাতে দেখে পানুও এগিয়ে আসে। 'আগুনটা 'টুএক' আমাকেও দিবি কিশুন, আম্মো একটা চুটী ধরাব।'

কিশুন নিঃশব্দে চকমকিটা এগিয়ে দেয় পানুর দিকে। একটা চুটী ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পানু বলে' তুর কি মালতীর সঙ্গে ভালবাসা কম্যে গেছে, বলি বিত্তান্তটি কি বটে হে?'

'কিছু লয়' উদাস কণ্ঠে কিশুন বলে।

'তবে যে ইথেনে চুপটি মার্যে ব'স্যে আছিস?' পানু শুধোয়।

'এমনী'।

'না, এমনী লয়।'

'তবে কিসের লেগ্যে?'

'ই পথ দিয়ে এখুনি মালতীরা কাঠ কুড়্যাই ফিরে যাবেক, তু সি জন্যি বস্যে আছিস।'

ক্ষনিকের জন্য কিশুনের মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু না। ঠিক সেজন্যে নয়। যদিও কিশুন মনের গভীরে এমনী একটা আশার কথা গুণ গুণ করছিল খানিকক্ষণ থেকে।

'কিন্তুক সে জন্যি লয়। উয়ার সঙ্গে দেখা শুনাটি বন্ধ কর্যে দিয়েছি হে।'

'কেনে কেনে?' পানু উৎসুক হ'য়ে জিগ্যেস করে। তাইলে কি ওদের ভালবাসায় ভাটা পড়েছে? চিড় ধরেছে কোথাও। কিন্তু এত শিগিগর তো এই জীবনের স্বাদ ফিকে হওয়ার কথা নয়।

'উই বল্লেক সিদিন। বল্লেক বিয়ার আগে এত দেখা শুনা ভাল লয় লোকে নিন্দা করবেক, কলঙ্ক দিবেক।'

আশ্চর্য্য! পানু ভাবে। মেয়ে মানুষ জাতটাই এই রকম।

কখনও বা আষাড়ের জলভরা মেঘের মত বিষণ্ণ, গম্ভীর শ্যামমেদুর। কখনও বা ভেজা রোদ্দুরের মত হাসি খুশি। ভালই হ'ল। এখানে বসে থাকলে পদ্মর সঙ্গেও দেখা হবে। পান্নু আর কিশুন দুজনেই নিঃশব্দে চুটী টানতে থাকে।

ধীরে ধীরে শীতের বেলা প'ড়ে আসে। পাহাড় থেকে হু হু করে ভেসে আসে হিমেল বাতাস আর তার সাথে পাহাড়ীয়া ফুলের মিষ্টি গন্ধ। একটা নিস্পত্র গাছের ডালে বসে দুটো পাখী আহার বাঁটছে। ঘরের কাছে দেখলে ওরা বলত কুটুম আসবে ঘরে। পাখী ঠোঁটে ঠোঁটে আহার বাঁটছে।

ঠিক এমনী মুহুর্ত্তে কিশুন বলে 'এমন লুক্যাই লুক্যাই পিরীত বড় ফিকা লাগে রে পান্নু।'

'কেনে এমনী তো ভাল' পান্নু জবাব দেয় 'যখন লুক্যাই লুক্যাই চুটী খেতম তখন কত মিষ্টি লাগত। এখন শালা 'হিস্কাই' গেছি, আর ভাল লাগে নাই, তেমনী।'

'না ভাই, আমার আর ভাল লাগছে নাই। মনটি আমার একটি ঘর বাঁধবার জন্যি উথলী পাথালী করছে।'

'কে জানে ব', তুদের মনের রীত আমি বুঝতে লারি। পিরীতের আস্বাদ তো লুক্যাই লুক্যাই-ই মিঠা। চন্দনপুরের সদগোপ ঘরের কিষ্টু লীলায় শুনিস নাই, শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় বাঁশী বাজাত আর রাধা জলকে যাওয়ার নাম কর্যে ছুটে আসত যমুনায়।'

কিশুন মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলে 'উনারা সব ঠাকুর বটেন। আমরা হল্যাম মান্নুষ হে। আমাদের ঘর সংসার আছে। গাঁও গাওলীর লোকের সঙ্গে কুলমালী আছে আর আছে কলঙ্কের ডর। চেরকাল ত' গোঠালীর ফাঁকে পিরীত করলে চলবেক নাই। লোকে কলঙ্ক দিবেক। কথা উঠবেক সমাজে। মাতব্বর গাঁয়ে থাকতে দিবেক নাই।'

কিশুনের কথা শুনে পান্নু খানিকটা অবাকই হয়। কিশুনের আজ হ'ল কি? এমন জ্ঞানের কথা বলছে ও হঠাৎ? কুটুম-কুটমালী, ঘর-সংসার, এসব কথা তো আগে বলত না, তাহ'লে?'

'তুর আজ লিচ্চয় কিছু হইছে কিশুন। তুর শরীল গতিক ঠিক আছে ত' ?'

'শরীলটি ঠিকই আছে ভাই, মনটির দিসা নাই। আজ কদিন ধরে মনে হচ্ছে ইবার বিয়া কর‍্যে ঘর গেরস্থালী গুছান দরকার।' মধুর আবেশে চোখ দুটো যেন বুজে আসে কিশুনের।

'কি করবি তবে ?' পানু শুধোয় 'বিয়া করব, দশের মজলীশে বিয়া করবার অনুমতি পাথ্‌না করব।'

'মাতব্বর যদি না মানে ?'

'মানবেক নাই কেনে ? ঘর বর খারাপ হল্যে তবে ত' আপত্য করবেক। আর যদি আপত্য করে তবে গাঁ ছেড়ে ভিন গাঁয়ে চল্যে যাব। ভূমিজ মেইয়াকে ভালবেসেছি, কুন অন্যায় ত' করি নাই। গাঁয়ে যদি থাকতে না দেয় তবে বকুল নগরে খেট্যে খাব। কাজ করব ধান কলে। সন্ধ্যা বেলায় ঘর ফিরব। মালতী হাত পা 'আখলাবার' জল দিবেক, চুটী তামুক দিবেক, বাতাস করবেক থানিক··· আগামী দিনের আয়েসের কল্পনায় চোখের পাতাদুটো থর থর করে কাঁপে কিশুনের।

পানুর চোখের সামনেও একটা স্বপ্ন তেমনী থর থর করে কাঁপতে থাকে। একটি শ্যামলা মেয়ে যার গলায় রূপোর হাসুঁলী, হাতে বাজু পায়ে মল, কোমরে বিছে, ডাগর ডাগর চোখ। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দুগাছি কাল চুল গালের উপর এলিয়ে প'ড়বে। ময়ূরীর মত ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁকা চোখে চাইবে। নাকের বেসর দুলিয়ে রাগ করবে, অভিমান করবে, ভালবাসবে, ভালবাসার কথা ব'লবে। আহা, পানুর চোখে স্বপ্নের আমেজে যেন একটা আতুর তন্দ্রা নামে।

ডুংরীর বাঁকে তখন মেয়েদের কলরব শোনা যায়। পানু আর কিশুন দুজনেই সচকিত হ'য়ে ওঠে। পানু বেশ একটু শঙ্কিত হয়, কারণ ওর মধ্যে মাতালী বুড়ীরও গলা শোনা যাচ্ছে।

পানু আর কিশুনকে দেখে পাকুড় তলায় থমকে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে হাততালী দিয়ে উঠল 'হুই দেখ লো, মালতীর রঙ্গের লোক অপিক্ষা করছে। বলি আজ কুন যমুনায় মিলন হবেক ?'

মেয়েটার গালে একটি আদরের টোনা মেরে লজ্জিত কণ্ঠে মালতী বলে 'থাম লো ছুঁড়ি, উহারা গোঠালীতে আসেছেন।'

'ও গোঠালীতে অ্যাসেছেন' মেয়েটি মুখের মধ্যে একটা কপট সারল্যের ভাব এনে বলে 'হবেক বা বলদগুলীনকে 'ডহরাই' দিয়েছে ঘরের দিকে। এখুন গাইগুলির অপিক্ষায়।'

মালতী চটে ওঠে। অন্যান্ত মেয়েরা মেয়েটির এই খুনসুটীতে মজা পায়। হাততালী দিয়ে হেসে ওঠে সবাই। মাতালী বুড়ী কানে ভাল শোনে না। কিন্তু ওদের উচ্চকিত হাসির আওয়াজ ওর কানে যায়। এ হাসির সুরটাও যেন চেনা চেনা ঠেকে ওর কাছে। 'এমুন 'চাটান্ ফাটানো' হাসি কিসের লো তুদের?'

বুড়ীকে কথাটা গোপন করতে চাইল সবাই। বুড়ি যেন ফাটা ঢোল। সবাইকে ব'লে বেড়াবে এখনি।

'কি, মুখে রা টি নাই কেনে? বলি কি রসের কথা রঙ্গের কথা হ'তেছিল তুদের?' বুড়ী আবার শুধোয়।

'কিছু লয় বুড়ী দিদি', মালতী কথাটা ঢাকবার চেষ্টা করে 'উয়ারা, বলছে পানু আর কিশুন দাঁড়াই আছে।

অন্যান্য মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসে। বুড়ি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে 'দাঁড়াই আছে ত' হইছে কি? আর ইয়াতে অমুন হেস্যে ঢল্যে পড়বার কি আছে। আমাকে তু লুকাসনি মালতী, তুদের ভালবাসা হইছে, কিন্তু কার সঙ্গে, পানু না কিশুন।

মালতী তাড়াতাড়ী কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে 'না গো বুড়ি দিদি, না······

'থাম লো ছুঁড়ী, আমারও একদিন বয়স ছিল, যৈবন ছিল। চ'ইখের তারায় ভালবাসার আলো দেখা যায় লো বুঝলি। আমার কাছে ঢাকিস না।'

মালতী লজ্জায় মুখ অবনত করে। ওদের আলোচনার বিষয় বস্তুটা অনুমান করে পালাচ্ছিল কিশুন, পিছন থেকে ডাকল মাতালী

'বলি ওরে ও ছোঁড়া, বলি ওরে ও ড্যাকরা রসের লাগর। ভূমিজ মেইয়ার মন হরণ কর‍্যে পালাছিস কুথাকে?

কিশুন নিঃশব্দে এগিয়ে আসে। 'বলি তু এক ফুলের ভমর না লাখ ফুলের ভমর রে?'

মুখ কাঁচু মাচু করে কিশুন বলে 'বুঝতে লারছি বুড়ী দিদি।'

এক গাল হেসে বলে 'বুঝতে লারছিস? ভালবাসা হল্যে পুরুষ গুলিন এমনী নিবুঝ হয়্যে যায়। মেইয়া মানুষেরও অধম হয় তখুন।'

কিশুন কিছু না বুঝতে পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

দলের মেয়েরা কাঠের বোঝা নামিয়ে হাসাহাসি করে। পানু পাথরের চাঙ্গড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করে।

'বলি বিয়া করবি ত', না ফুলে ফুলে মধু খাবি?' শুধোয় আবার 'তাহল্যে মাতব্বরকে বলি।'

মালতী চ'মকে ওঠে 'হেই দিদি, উকথা মাতব্বর কাকার কাছে বলিস না তু, তাহল্যে আমি লাজে মর‍্যে যাব।

'আহা তোর লাজের বাহার দেখ্যে মরে যাই' মাতালী ওর কথায় কান দেয় না 'তাহল্যে ত' ইবারে ঈশ্বরীকে একটি মজলীশ ডাকতে বলতে হয়।

কিশুন পুলকিত হয়। বুড়ী যদি বলে কয়ে মজলীশ ডাকতে পারে তাহলে তো ভালই। তাহ'লে এই লজ্জার কথাটা আর মাতব্বরকে মুখ ফুটে বলতে হয় না। এই আসন্ন সম্ভাবনার আভাসে মুচকি হাসে কিশুন।

'তু বড় নিলাজ বটিস বুড়ী দিদি' পদ্ম বলে 'তু যৈবন কালে খুব রসবতী মেইয়া ছিলিস'।

'ঠিক বুলেছিস লো ঠিক বুলেছিস। তবে আমার ভালবাসার লোক তুদের মতন মেইয়ার পিছু পিছু ছুটত নাই। উ ছিল একটা মরদের মত মরদ। তু খান রসের ঝুমুর শুনবার লেগ্যে ভুমিজ মেইয়ারা বিনতি করত উয়াকে'...বুড়ী এবার পুরোন দিনের গল্প ফাঁদবে। ওরা শঙ্কিত হয়।

'ইবার ঘর চল বুড়ী দিদি আঁধার হয়্যে আসছেন।'

'চল চল' বুড়ী ও তাড়া দেয়। ও আবার রাত কানা। রাতে দেখতে পায় না। পথে যেতে যেতে পানুর দিকে নজর পড়ে বুড়ীর 'বলি তু কে বটিস ? চোর না সিঁদ কাঠিদার ?'

পানুর মুখ থেকে কথা সরে না।

মালতী কি যেন বলতে যাচ্ছিল। পদ্ম চোখ ঠেরে থামিয়ে দেয় ওকে। বুড়ী কি যেন অনুমান করে হঠাৎ মাজা দুলিয়ে গেয়ে ওঠে

ফুটিল পাকিল ডালিম
চোর্য়ে ভেঙ্গ্যে খায়,
(আর) আর আমার বঁধু ঘরে নাই
যমুনায় ভেস্যে যায়।

কিন্তু এই স্বপ্ন যে অসম্ভব পদ্ম তা জানত। পদ্ম আরও জানত পানুর আকাঙ্খা তিয়াসির লোকের কাছে কত হাস্যকর। পদ্মকে বিয়ে করতে চাইলেই চারিদিক থেকে উঠবে উপহাসের গুঞ্জন, কেউ ধিক্কার দেবে তার ধৃষ্টতাকে, কেউ বা ব্যঙ্গ করবে তার নামহীন গোত্রহীন পরিচিতিকে। তবুও পানুর ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেনি পদ্ম। সন্ধ্যের সময় পানুর সঙ্গে দেখা করার কথা। পদ্মর মনটা ভ'য়ে শির শির করে। পানু বড় অবুঝ। সন্ধ্যের আগে মুরগী গুলোকে ঘরে তোলে পদ্ম। ধলা গাইটিকে খনিকটা 'মাড়জল' দেয়। পড়ন্ত আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে ওর রূপোর হাঁসুলী। জল আনতে যায় ভূমিজদের মেয়ে। ডাগর ডাগর চোখ তার। বাতাসে ওড়ে সিঁথির কয়েক গাছি চুল। পথ কাঁপিয়ে মল বাজে ঝম্ ঝম্। রূপোর ভারী বিছেটা সাপের মত জড়িয়ে থাকে ওর সুঠাম নিতম্বকে।

পথের মাঝে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা হয় পানুর সঙ্গে। বাঁকা পোলে অতক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ওর ধৈর্য্যে কুলোয়নি।

পদ্ম চমকাবার ভান করে 'ও মা তুমি ইখেনে আমি ভেবেছিলম বুঝি বা বাঁকা পোলের গাছগুলীন গুনছ বস্যে বস্যে।'

'তোর সঙ্গে ইটুক পথ হাঁটবার লোভটি সামলাতে লারলম।'

স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়্যে পদ্ম বলে 'আজ এত সোহাগ কিসের গো' ?

'তোর লেগ্যে সোহাগ আমার সারা জেবনেও কমবেক নাই পদ্ম। মনটি তে আজ কি হইছে কে জান্।'

'ওমা মর্যে যাই' পদ্ম গালে আঙ্গুল দেয়। 'সারা জেবন বুঝি পথ হাঁটার সোহাগ ?' পদ্মর কণ্ঠে পরিহাসের তারল্য কিন্তু ভয়ে বুক দুরু দুরু।

'কেনে সারা জেবন আমার সঙ্গে পথ হাঁটতে লারবি বুঝি ?'

পদ্ম একটু চমকিত হ'ল, পরে সে ভাব গোপন করবার চেষ্টা করে বলে 'উ খেয়াল হল আবার কবে থিকে ?'

'খেয়াল ? খেয়াল লয় পদ্ম। আমার দিন রাতের স্বপুন। তু আমার কেশবতী রাজকইন্যা পদ্ম। তু আমার চইখের কাজল।'

পরিবেশটা তরল করে দিতে চায় পদ্ম 'তুমি ঝুমুর বাঁধো কেনে। বেশ রসের ঝুমুর হবেক ?'

তু তামাশা করিস না পদ্ম আমার হেদয়টি ফালা ফালা হয়ে যায়। আমার হেদয়ে তুই ছাড়া আর কারু বসতি নাই। বল্লে পেত্যয় যাবি নাই, আমি গোঠালীতে যেত্যে পারি না, ক্ষেতের কামে মন লাগে না, শুধু কাঁদন আসে চইখে।'

পদ্ম জবাব দেয় না। ওর ঠোঁটের প্রান্তে একটা করুন হাসি।

'তু হাসছিস পদ্ম ? তবে থাক—' পানু ব্যথিত হয়।

'কিন্তুক কি বলবে জলদী বল, বাবায় যদি ঘরে এস্যে দেখে যে আমি নাই তাহল্যে আবার খুঁজতে বাইরাবেক।'

'ভালই ত', তুর সঙ্গে আমাকে দেখবেক। নতুন কর্যে কিছু বলতে হবেক নাই।'

পদ্ম সন্ত্রস্ত হয়। 'উসব চিন্তা তুমি ছাড়, মাতব্বর আর গাঁয়ের লোকদিকে ত' তুমি চেন, মিছামিছি অপমান হতে হবেক,'

'কিন্তুক তুকে যে আমি ভালবেস্যেছি' 'পানুর কথাগুলো কান্নার মত সোনায় 'তুকে না পেল্যে আমি মর্যে যাব পদ্ম।'

পদ্মর বুকটাও ব্যাথায় মুচড়ে ওঠে। দুজন দু পারে। মাঝে দুরন্ত নদী। কাছে যাওয়ার কোন উপায় নেই। ঝাঁপ দিলেও মৃত্যু সুনিশ্চিত। সুতরাং—

ভেজা গলায় পদ্ম বলে 'আমাকে ভুল্যে যাও গো। আমাদের মিলন হবেক নাই। ভালবেসেছিলম এই আমার আনন্দ। আমাদের বিয়াতে গাঁয়ের লোক মত দিবেক নাই, সমাজ দুষবেক। অপমান হতে হবেক তুমাকে। আর আমার জন্যি তুমার অপমান আমি সইতে লারব গো সইতে লারব।'

'তোর ভয় কিসের পদ্ম? ভালবাসা কি জাত মানে? আমি জানি আমার ঘর নাই দুয়ার নাই, পরিচয় নাই, কিন্তুক হেদয় আছে। জাত গোত্তর দেখ্যে ক্ষণ মিলে না পদ্ম, মন মিলে মন দেখ্যে'

বাঁকা পোলের নির্জনতায় পান্নুর কথাগুলো বড় স্পষ্ট শোনায়। দক্ষিণের বাতাসও থমকে যায় ক্ষণিকের জন্য। হেমন্তের বিষণ্ণ বিকেলে পাহাড়তলীর বিবর্ণ গাছগুলো যেন দীন নয়নে তাকিয়ে থাকে।

'তুমি আমাকে ভালবাস সি ত' আমার গরব। কিন্তুক কাইলদিন যদি দশের মজলীশে তুমাকে অপমান করে, অকথা কুকথা বলে তবে আমার বুকটি ফেট্যে যাবেক। আমি ভালবাসার কাঙ্গাল, কিন্তুক ভালবাসার জন্যি কাঙ্গাল হতে পারব নাই গো পারব নাই।'

পদ্মর কথাগুলো বাঁকা পোলের আসে পাশে ঘুরে বেড়ায়। আবার বাতাস বইতে সুরু করে। আসন্ন শীতের আভাসে ঝরে পড়া পাতার মর্মর ধ্বনি ভেসে বেড়ায় বাতাসে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে পদ্মর বুক থেকে। 'আমার জীবন যৈবন সব বাঁধা দিয়েছি তুর কাছে পদ্ম'

ভালবাসা বেল ফুলের মতন সুন্দর, সাদা, তাতে কুন কালী নাই। কিন্তুক ভালবাসার দেবতা বড় লিদ্দয়, বড় পাষাণ, মন মিলায় ত' ঘর মিলায় না, যিখেনে ঘর মিলে সিখেনে মন মিলে না।'

হঠাৎ পদ্মর হাত দুটো ধরে পান্নু বলে, 'ই লিজ্জন জায়গায় কেউ শুনবেক নাই পদ্ম, কেউ জানবেক নাই, সাক্ষী এই বাঁকা পোল, সাক্ষী

হুই বুড়াবুড়ী পাহাড়, সাক্ষী এই 'লেদা' পিয়ালের গাছ, তু আমাকে সত্যি করে বল পদ্ম তু আমাকে ভালবাসিস কিনা। যদি না বাসিস তবে আমি চলে যাব ইখেন থিকে, দূরে আনেক দূরে, যিখেন থেকে আমার নিকাশের আওয়াজটিও শুনতে পাবি নই, তুর সুখের পথে আমি কাঁটা হব নাই কনদিন।'

আস্তে আস্তে হাতদুটো ছাড়িয়ে নিয়ে পদ্ম বলে 'সি কথা কি আজ লতুন কর্যে বলতে হবেক? বাসি গো বাসি, চেরদিন বাসব, ভালবাসা দুদিনের লয়, চেরদিনের, শুধু যৈবনের লয়, সারা জেবনের।

একটা নিবিড় উষ্ণতার মধ্যে ওরা খানিক্ষণ আচ্ছন্ন হ'য়ে রইল। সমস্ত বাইরের জগৎ যেন ওদের সামনে থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর সেই শিহরিত অবলুপ্তির মধ্যে ওরা যেন পরস্পরকে আশ্রয় করে আলোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। ওদের যখন সাম্বিৎ ফিরল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়েছে।

হাটুরেরা ঘরে ফিরছে। তাদের পথ চলায় ঘরে ফেরার ছন্দ। কার যেন ঝুমুরের মিঠে আওয়াজ শোনা গেল

সুয্যু করে ঝিকি মিকি
চাঁদ করে আলা,
তারা দিয়ে গাঁথ্যেছে কে
বেল ফুলের মালা।

'পদ্মর সেই প্রিয় গানটি। ঝিকি মিকি সুর্য্য বুড়োবুড়ী পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে অনেক্ষণ। অজস্র তারার চুমকি বসানো নীল আকাশ। জ্যোৎস্নায় ঝলমল করে পৃথিবী। গানের কথা গুলি বেশ, পদ্ম ভাবল, তারা দিয়ে গাঁথ্যেছে কে বেল ফুলের মালা—'

কিন্তু মালা নয় যেন এক রাশ সদ্য চয়িত বেলফুল কেউ আকাশের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছে। পূবালী বাতাসে এক ঝলক শালফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। আজ সব সংশয়, সব দ্বিধা নিরাসনের উন্মুখ মুহর্ত্তে কে যেন পদ্মর কানের কাছে গুঞ্জন করে—সে এসেছে। সে ফিরে এসেছে।

শশীকমলের বৌ ভাল হ'লেও তার আচ্ছন্ন ভাবটা এখনও তেমন কাটেনি। কেমন যেন শুন্য দৃষ্টিতে তাকায়। ওর চোখের তারা যেন কিসের সন্ধানে চারিদিক ঘুরে ফিরে। কথা বলতেও যেন ক্লান্ত বোধ করে ও। শশীকমলের মনটাও কদিন ধরে ব্যাকুল। বৌএর জন্য এমন আকুলতা কোন দিন বোধ করেনি ও। একটা অপরাধ বোধ পীড়া দেয় শশীকমলকে। মাঝে মাঝে নিজেকে অত্যন্ত অধম বলে মনে হয় ওর। মাঝে মাঝে মনে হয় বৌএর সঙ্গে বঞ্চনা করছে ও। শুধু মনের দিক দিয়েই নয়, দেহের দিক দিয়েও। দিন রাত নেশা ভাং করে বেড়িয়েছে। ক্ষণিকের জন্যও ভাবেনি যে আর একটী তৃষ্ণাতুর হৃদয় ওর প্রতীক্ষায় আকুল। যার বুক ভরা ভালবাসা, দেহ ভরা আনন্দের হাতছানি আর চোখ জোড়া তৃষ্ণা। কিন্তু শশীকমল তো এই আনন্দের তাড়নায় হাত থেকে বাঁচবার জন্যই ঘর সংসার ছেড়ে দূরে দূরে থাকতে চেয়েছিল। অথচ কেউ জানে না কোথায় ওর ব্যথার উৎস। কোন বেদনার জ্বালায় ও নিশিদিন অস্থির হ'য়ে ঘর দুয়ার ছেড়ে ঘুরে বেড়ায়, নেশায় বুঁদ হ'য়ে থাকে। অথচ ওর অপরাধ কি? যৌবনের উন্মাদনায় একদিন যে পাপ করেছে প্রায়শ্চিত্ত যে এ ভাবে করতে হবে তাকি শশীকমল কোন দিন জানত। কদিন ধরে গাঁজার আড্ডায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে শশীকমল। সন্ন্যাসীর আড্ডাতে আর যায় না। ঘরেই বসে থাকে। মাঝে মাঝে বৌএর কাছে ঘুর ঘুর করে। শশীকমলের অনেক আশা বৌ যদি একটু হাসে, একটু অভিমান ভরে কথা বলে, অন্ততঃ গালাগালি করে? কিন্তু বউ, বৌ যে সেই সকাল থেকে এলো চুলে দাওয়ায় বসেছে এখনও রাটি নেই। ফুলমণির মেজাজও অনেক নরম। আসলে ফুলমণিও ভালবাসে বৌ কে। ফুলমণি একাই ঘর গেরস্থর কাজ করে। আজ আর খোঁটা দেয় না বৌ কে। সন্ধ্যের গোড়ায় গরুগুলো গোয়ালে তোলে। খড় জল দেয়। তুলসি তলায় প্রদীপ দেয়। শুকনো কাপড়গুলি বেড়ার থেকে তুলে ঘরে রাখে। একসময় বৌএর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

'এখুন খুলা চুলে বস্যে থাকিস না বৌ। কে কুথায় আছেন কে জানে। নজর দিতে পারেন। তুর আবার দুব্বল ধাত।'

বৌ সাড়া দেয় না। গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। যেন সারা বিশ্বের ভাবনা ওর মাথার মধ্যে।

'বৌ, ও বৌ, অমুন কর‍্যে থাকিস না। বরং কলসিটি লিয়ে ভ্রমর বৌএর সঙ্গে জলকে যা।'

বৌ তবুও নিরুত্তর।

'বৌ, অ বৌ' ফুলমণি বৌএর মাথায় হাত দেয়। 'অমন লিসাড়ে থাকিস না বৌ। হাসি তামাশা কর॥ ফুর্ত্তি কর।

বৌ কথা বলে না। ওর ছুচোখ বেয়ে জল গড়ায়।

'হা দেখ। আবার কাঁদে। কাঁদিস না। বৌ, চোখের 'ন'টি মুছ। কিসের দুঃখু তুর। অমন বুক ভার কর‍্যে থাকিস না। দেখ পুরুষটাও কেমন নিঝুম হয়্যে আছে। উয়ার মতন দুষ্মন লোক দুদিন ঘরের থিকে বের‍্যাই নাই।'

শশীকমলের বৌ টেনে টেনে বলে 'আমি যে আর পারছি নাই। আমার মনের মধ্যে কে যেমুন ঢেঁকি কুটছে গো, আমার শুধু কাঁদন আসছে, আমি যে হাসতে লারছি মা।'

শশীর মা আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলোয়। 'অত অস্থির হলে কি চলে মা, ডাহিনটি বড় 'কাবাড়িন' মেইয়্যা ছিলেন। শরীল আর মন দুয়েই দুব্বল করে দিয়েছে।'

শশীকমলের বৌ ফুলমনির বুকে মাথা রাখে। ফুলমণির বুকটা কেমন যেন একটা স্নেহের রসে সিক্ত হ'য়ে ওঠে। ওর মুখটা বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে ফুলমণি বলে 'তুর কিসের দুঃখু বল মা আমাকে'

'আমি বুঝতে লারছি গো, কে যেমুন আমার মনের মইধ্যে ভার হয়্যা বসে আছেন। আমি খনেক খনেক ডর‍্যাই উঠছি আর আমার শুধু কাঁদন আসছে। মনটি আমার আষাড়ের মেঘের মতন কালো হয়্যে গেছেন গো, হায় হায়।'

'তু ভাবিস না মা। গুণীণকে আবার ডাকব কাইল দিন। ঝেড়্যে দিবেক এস্যে। উ বড় জবর গুণীণ বঠে। উয়ার ভয়ে ভূত পালায়। উ 'বক্ষদত্যির' সঙ্গে কথা বলে।'

শশীকমলের বৌ জবাব দেয় না। শুধু ভাবে আর ভাবে। খানিক পরে 'আলা বাতি' করবার জন্য উঠে যায় ফুলমণি। শশী কমলের বৌ কিছুক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকে নিশ্চুপ হয়ে। তারপর এক সময় ঘরের মধ্যে উঠে যায়। শশী কমল ওকে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল ঘরে যেতে দেখে শশীকমলও ওর পেছনে পেছনে যায়।

শশীর বৌ প্রথমে জানালার কাছে দাঁড়ায় তার পর খাঠিয়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ও। কান্নার আবেগে ওর সমস্ত শরীরটা কাঁপতে থাকে থর থর করে।

শশীকমল ওর পাশে বসে। তারপর ওর মাথাটা কোলের মধ্যে তুলে নেয়। ধরা গলায় শশীকমল বলে 'তুর কি হইছে বৌ আমাকে বল।'

'আমি জানি না গো আমি জানি না। আমি আর বাঁচব নাই গো বাঁচব নাই।'

শশীকমলেরও কেমন যেন কান্না পায়। 'উকথা বলিস না বৌ। তু মর্‍্যে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব।'

শশীকমলের কোলের উষ্ণতার মধ্যে মুখ রেখে ওর বৌ বলে 'আমি যে তুমাকে কিছু দিতে লারলম গো। একটি সন্তান, তাও না।'

শশীকমলের বুকটা ছাঁত করে ওঠে। ওর দুর্ব্বল জায়গায় আবার রক্তক্ষরণ সুরু হয়। ওর দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাসটা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে তুলবার চেষ্টা করে শশীকমল বলে 'সি দোষ তুর লয় বৌ। সি আমাদের কপাল দোষ।'

'তুমার লয় গো, তুমার লয়। সি আমার কপাল দোষ। আমার সঙ্গে বিয়া না হ'ল্যে তো তুমাকে কুন মানসিক করতে হত নাই। মানসিকটি ত' আমার মঙ্গলের জন্যি। হায় হায় গো আমাকে তুমি কত ভালবাসো।'

এই মুহূর্ত্তে শশী কমলের মনে হ'ল সমাজ সংসার সব মিথ্যে। ওর মনে হ'ল হঠাৎ যদি পৃথিবীটা ধ্বংস হ'য়ে যেত অথবা ঘরের চালাটা

ওর মাথায় ওপর ধ্বসে পড়ত তাহ'লে বেশ হ'ত। কিংবা যদি একটা খরিশ সাপ দেওয়ালের গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে ওকে দংশন করত তাহ'লে অন্ততঃ এই আত্ম প্রবঞ্চনা এই ছলনা কশাঘাত থেকে ও বাঁচতে পারত। কিন্তু কিছুই হ'ল না। দাঁতে দাঁত চেপে কথা গুলো শুনতে লাগল শশীকমল।

শশীকমলের চোখে চোখ রেখে ও শুধোয় মানসিকটি 'সিন্নাত্যে' আর কত দেরী আছে গো?

শশীকমলের চোখ দুটো সহসা কেঁপে যায়। স্খলিত স্বরে শশী-কমল বলে 'সিরাই এল বলে। তু ভাবিস না বৌ।

'না গো আমি ভাবি নাই। কিন্তুক জান, আমার একটি সন্তানের বড় সখ। ছুটু বেলায় যখন গোঠালীতে যেতম তখন থিকে সপুন দেখতম আমি, আমার ঘর ভরা সংসার গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু ঘর আলা করা পুত। সবই পেয়েছি গো, কিন্তুক লিদ্দয় ভগমান আমাকে একটি পুত দিলেক নাই। শশী কমলের কোলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ওর বউ। আর একটি অক্ষম স্বামী তার মুখ কোলের উপর চেপে ধরে অদৃষ্টকে অভিশাপ দেয় মনে মনে। তার চোখ দিয়ে জল পড়ে না। শুধু রক্তাক্ত হৃদয়ের লোনা স্বাদ সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে আর ভাবে ঠিকই বলেছে ও, ভগবান বড় লিদ্দয়। বড় লিদ্দয়।

···ফিরে এসেছে। সত্যিই ফিরে এসেছে পদ্মর মনের মানুষ। নতুন বেশে। নতুন রূপে। সেই পানু আজ সন্ন্যাসী। তাকে অজস্র কলঙ্কের কালীমা নিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হ'য়েছিল। কিন্তু কেউ তাকে মনে রাখেনি। তাহ'লে তিয়াসির লোকে হয়ত চিনতে পারত। কত তারাই তো আকাশ থেকে খসে যায়, কেউ তার হিসেব রাখে না। পরিচয়হীন গোত্রহীন পানু আজ থেকে বারো বছর আগে একদিন রাত্রির অন্ধকারে মুখ ঢেকে বিদায় নিয়েছিল। সেদিন রাত্রির কালো অন্ধকারও ওর জীবনের কলঙ্ক কালীমাকে ঢেকে দিতে পারেনি। বেদনার অঙ্কুশ বুকে নিয়ে সে পরিব্রাজন করে বেড়িয়েছে স্থান থেকে

স্থানান্তরে। জীবনের ও জীবিকার তাড়নায় নানান্ ভূমিকায় অভিনয় করেছে কখনও কাশীতে তীর্থ যাত্রীদের সেবক কখন বদরীকাশ্রমের পুণ্যকামীদের জুড়িদার কখনও বা বৃন্দাবনে পাণ্ডাদের পরিচারক। সেই ঠিকানাহীন জীবনে কতদিন কত মধ্যরাত্রিতে সে ডুকরে কেঁদে উঠেছে। স্বপ্নের ঘোরে কতবার ভেসে উঠেছে এক টুকরো পাহাড় ঘেরা গাঁয়ের মধুর স্মৃতি। যেখানে পরিচয়হীন পানুর কোন স্থান নেই। বুকটা ব্যাথায় মুচড়ে উঠেছে। পানু ভুলতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি। চোখের জলে ঝাপসা করে দিতে চেয়েছে পুরোন দিনের স্মৃতি, কিন্তু অক্ষয় শিলালিপীর মত তা আবার ফুটে উঠেছে মনের আয়নায়। তাই আজ আবার ফিরে এসেছে পানু। পানু নয়, সন্ন্যাসী। কিন্তু যদি ওকে চিনতেই পারত তিয়াসির লোকে তাহ'লে? তাহ'লেও তারা পানুকে এমনী শ্রদ্ধার চোখেই দেখত, কারণ সন্ন্যাসের আবরণ ভেদ করে তারা ওর পুরোন জীবনটার দিকে তাকাতে সাহস করত না। পানু আশা করেছিল তারা ওকে চিনতে পারবে। এবং ওর মনের নিভৃতে এইটাই ছিল ওর কামনা। কারণ তারপরে যে শ্রদ্ধা, যে সন্ন্যাস ও পেত তাই সেদিনের সেই বিদায় বেলার ভারাক্রান্ত অশ্রুসজল মুহূর্ত্তের আবহে বেশ তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করত ও। কিন্তু না। কেউ ওকে চিনতে পারেনি। এমন কি ওর গোঠালীর অন্তরঙ্গ সহচর কিশুণও নয়। অবশ্য কিশুণের চিনতে না পারার কারণ আছে। নিজেকে সান্তনা দেয় পানু। কিশুণের অন্তর এখন বিরহ জ্বালায় ব্যকুল। কিন্তু আর কেউ? আর একজন আছে। সে পদ্ম। যাকে ঘিরে পানুর পিয়াসি মন এতদিন গুঞ্জন করেছে লুব্ধ ভ্রমরের মত। পদ্ম তাকে চিনেছে। পদ্মর চোখের তারায় তার আভাস পেয়েছে পানু। প্রত্যুষ থেকে স্বুরু করে প্রায় মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত নানান্ মানুষের ভীড়। নানা সমস্যা, নানা প্রার্থনা। তারপর সমস্ত দিনের ক্লান্তি নিয়ে চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে। তখন সব হারিয়ে যায়, তিয়াসির মানুষ, তিয়াসির আকাশ, বাতাস, প্রান্তর—সব, সব এমন কি পদ্মর মুখটাও।

উদাস চোখে দূর পাহাড়ের সূর্য্যাস্তের দিকে তাকিয়ে থাকে পান্নু। প্রথম প্রথম গেরুয়ার অন্তরালে বিষের মত জ্বলত ওর সারা দেহ। তারপর আস্তে আস্তে অভ্যাস হ'য়ে গেছে। এখন মনে হয় এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় বোধকরি পৃথিবীতে নেই। মুখে সর্ব্বদা ভগবানের নাম করেছে কিন্তু ওর অন্তরে গুঞ্জরিত হ'য়েছে অন্য একটি নাম। ঈশ্বর জানেন, পান্নু সন্ন্যাসী নয়, কিন্তু প্রতারকও নয়। গেরুয়া তার খেয়া পারের নৌকা নয়। শুধু মাত্র একটি নিরাপদ আশ্রয়। একটি নিশ্চিন্ত আশ্বাস। দূরে বাঁশ বনের আড়ালে একটা কাঁসার ঘটী সূর্য্যের পড়ন্ত আলোতে চিক মিক করে। পান্নু গাছের গুড়িতে মাথা রেখে শুয়েছিল। একটা আশার ইঙ্গী তপেয়ে উঠে বসল। নিশ্চয়ই সে। আজ ওর সমস্ত মন প্রাণ ওকে আকাঙ্খা করেছে। একটা ব্যাথা আর আনন্দ মেশানো অনুভুতিতে পান্নুর অন্তরটা ভরে উঠল। না, আর সন্দেহ নেই। পদ্ম। মাতব্বরের মেয়ে। কি এক অজানা কৌশলে পদ্ম যৌবনটাকে যেন আঁচলে গেরো বেঁধে রেখেছে। যেমনী আঁটসাট গড়ন। তেমনী চাহনী, তেমনী চোখ, আজ থেকে বারো বছর আগে ঠিক যেমনটি ছিল। বৃন্দাবনে কোন এক তীর্থ যাত্রীর কাছে শোনা কীর্ত্তনের একটা বলি মনে পড়ল ওর 'আহা ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গেরও লাবণি আছে অবনী বহিয়া যায়।' এটা কার রূপ বর্ণনা কৃষ্ণের না রাধার? আপাততঃ পান্নুর মনে হচ্ছে বুঝি বা পদ্মর।

'সন্ন্যাসী, কি দেখছ গো?'

'তুমাকে'

'ভগমানকে ভুলে গেছ না কি?'

'কেনে, ভগমান আছেন মনের মন্দিরে।'

'এমন করে ভাল্যে আছ, মনে হছে বুঝি বা তুমার মনের মন্দিরে ভগমানটি হার‍্যাই গেছেন, কিম্বা—

'কিম্বা কি?'

'তুমার ভগমান আমার দেহে আশ্বয় কর্য়েছেন'

'মিছা বল নাই। আমার ভগমান তুমার মাঝে। কিন্তুক এতদিন ছিলে কুথা?'

'একটি জিনিষ হার‍্যাই গেছল আমারও। অনেক দিন পরে পুরান সিন্দুকের মধ্যে খুঁজে পেলম তাকে। তারই আনন্দে মেত্যে ছিলম।'

'ভালো। ভালো। খুঁজে পাওয়ার আনন্দটি বড় মধুর। আমারও একটি জিনিষ হারাইছে। কিন্তুক খুঁজে পাই নাই। খুঁজে বেড়াছি দিশেহারার মত।'

পদ্ম এবার হাসে। 'মিছা কথা সন্ন্যাসী। তুমি ত' ফকীর? তুমার আছে কি, যে হারাবেক, এক ভগমান ছাড়া। তা সে ভগবানকে ত' তুমি মনের মন্দিরে আগল্যাই বেড়াছ?

'কিন্তুক' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পানু বলে 'আমার মনটি যে হারাই গেছেন গো।'

'আহাহা' কত আফশোষ করে 'সিটি খুঁজতেই ইগেরামে এসেছে বোধ হয়? তা গেরুরায় রং লেগ্যেছে সন্ন্যাসীর দেহে না মনেও?

'কেনে গো? রঙ্গীন পাড়ের কাঁচা রং কি উঠে গিয়ে শাদা শাড়ীর গায়ে লাগে না? আমার দেহের গেরুয়ার রং মনে লেগে পাকা হয়্যে গেছে গো। পানু জবাব দেয়। পাহাড়তলীর গাছে গাছে সন্ধ্যে ছুঁই ছুঁই করছে। যজ্ঞডুমুরের তলায় শুধু পানু আর পদ্ম। আজ আবার রাস্তায় লোক চলাচল কম। আজ জাগরন। কাল পরব। সবাই ব্যস্ত। যজ্ঞডুমুরের তলায় একটা মাটীর প্রদীপ জ্বলছে মিটি মিটি। প্রদীপের সলতেটা একটু উস্কে দিয়ে পদ্ম বলে 'তুমাকে আমি চিন্যেছি সন্ন্যাসী।'

'তুমার কাছে তো লিজকে ঢাকতে চাই নাই আমি। আমি জানি পদ্ম আর কেউ চিনতে না পারুক তুমি আমাকে চিনবেই' খানিক পরে আবার বলে 'তুমার সঙ্গে যে আমার জন্ম জন্মের সম্পর্ক।'

'ছিঃ ছিঃ ছিঃ' হঠাৎ ধিক্কারে মুখর হ'য়ে ওঠে পদ্ম 'তুমার কি মুখের আগলটি ভেঙ্গ্যে গেছে?'

মুখের আগলটি ভেঙ্গেছে পদ্ম, বুকের আগলটি বন্ধই আছে। সিখেনে খুল্যে দিবার কেউ লোক নাই।' পান্নু জবাব দেয়।

'কেনে গো সন্ন্যাসী পথে লোক জুটে নাই?' পদ্ম শুধোয় সকৌতুকে।

'মন বাঁধা দিয়েছি এক মহাজনের কাছে তার সুদ মুটাবার পয়সা নাই, আসল শুধব কুথা থেকে। আমি যে দেউল্যা হ'য়্যে গেছি পদ্ম।

পদ্ম জানে এসব লেখা কথা। বাঁধা বুলি। 'কথা শিখাবার গুরু কুথায় আছে জানো নাকি সন্ন্যাসী?'

'কেনে গো তুমি শিখবে? সে গুরু ত' আপুনি আসবেক। তখন আর শিখবার দরকার হবেক নাই! মুখের থিকে খস্যে খস্যে পড়বেন। তোতা পাখীর মতন।'

পদ্ম ইঙ্গীতটা বুঝে লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে। সন্ন্যাসী জানে পদ্ম আজও কুমারী।

'সন্ন্যাসী, তুমাকে কি বলে ডাকব? ঠাকুর বুলে না সন্ন্যাসী বুলে?

'আর সবার কাছে আমি সন্ন্যাসী, কিন্তুক তুমার কাছে আমি পান্নুই থাকব চের দিন।'

বিস্ময়ে পদ্মর চোখ দুটো কপালে ওঠে 'সে কি গো, এত মানী গেয়ানী লোক, আমি পান্নু বুলে ডাকব।'

'উ নাম যে শুধু তুমার একার পদ্ম। আমি লিজেও আজ উ নাম ভুলে গেইছি।'

অন্ধকার ঘন হয় যজ্ঞডুমুরের পাতায় পাতায়। দূর পাহাড় থেকে নাম না জানা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। প্রদীপের আলোতে খানিকটা জায়গা আলোময় হ'য়ে উঠেছে।

'আমি ঘর যাই সন্ন্যাসী, রাত হইছে।'

'পৌঁছাই দিব আধেক রাস্তা?' পান্নু শুধোয়।

'তা চল কেনে. সন্ন্যাসীর সঙ্গে পথ হাঁটলেও যে পুণ্যি।'

পান্নু উঠে দাঁড়ায়। 'চল' বলে ও।

'তুমার জিনিষ পত্তর গুলিন পড়্যে থাকবেক?'

'থাকুক কেনে। সন্ন্যাসীর কিই বা আছে যে চুরী করবেক লোকে,
'তবে পিদীম লিভাই দাও'

'উ কথা বল না পদ্ম। আমার অন্তরে একটি পিদীম জ্বলছে দিবারাত্তি। সিটিকে আমি লিভাতে পারি নাই। এই বাইরের পিদীমটিকেই বা লিভাই কি করো ?

নিঃশব্দে পথ হাঁটে ওরা। বাঁকা পোলের কাছে এসে থেমে যায় পান্নু।

'কি ভাবছ সন্ন্যাসী ? 'সন্ন্যাসীকে থমকে দাঁড়াতে দেখে পদ্ম শুধোয়।'

'পুরান দিন গুলিনের কথা ভাবছি পদ্ম।' 'সে কি সন্ন্যাসী, সে সব দিনের কথা কি আইজ ভাবতে আছে ? গেরুয়ার রঙ্গে সি সব দিনের বিত্তান্ত ঢেক্যে যায় নাই ? আবছা হয় নাই ?' সবিস্ময়ে পদ্ম শুধোয় 'কুথায় তুমি গেরুয়া লিয়েছ সন্ন্যাসী' ?

'কেনে গো ? বেন্দাবনে ?'

'বেশ তো সন্ন্যাসী, যেদিন তুমি সাদা বসন তেয়াগ করল্যে সিদিন বাঁকা পুলের রাত গুলিনকেও তো যমুনার জলে ভাস্যাই দিলেই পারতে। কি দরকার উসব দিনের কথা ভেবে ? হাঠাৎ এক দমকা বাতাসে এক রাশ শুকনো পাতা ঝরে পড়ে মাটীতে। একটা ভারী ভারী সুগন্ধে নিঃশ্বাসটা কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসে। একদল ভীত বিপন্ন পাখী কলরব করতে করতে উড়ে যায় আকাশে আর হঠাৎ পদ্মও কেমন যেন প্রগলভ হ'য়ে ওঠে। তুমি তো জানো না সন্ন্যাসী, আমি পাথ্থনা করেছি, ঠাকুর উয়াকে ফির‍্যাই দাও, উয়াকে ফির‍্যাই দাও। ফিরে তুমি এল্যে, কিন্তুক ইকি তুমার রূপ, ইকি তোমার বেশ ? তুমার ঠেঁয়ে আমি যাব কি কর‍্যে সন্ন্যাসী। ই রংএর তেজে যে সব পুড়ে যায় সন্ন্যাসী। তুমি কেনে এল্যে, সন্ন্যাসী কেনে এল্যে।

পদ্ম ফুঁপিয়ে কাঁদে। পান্নু বুঝতে পারে না। শুধু বাঁকা পোলের অশরীরি দেবতা একটু হাসে। বাঁকা পোলের ধারে এ কাহিনী আজ নতুন নয়। অনেকের অনেক বেদনা মধুর কাহিনী জড়িয়ে আছে বাঁকা

পোলের ইতিহাসের সঙ্গে। সহসা কার যেন একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি দেখে চমকে ওঠে পান্নু।

'কে, কে উখেনে' মুহূর্ত্তে পদ্ম সেখান থেকে সরে যায়। ছায়া মূর্ত্তিটা নড়ে চড়ে ওঠে।

'আমি বঠি হে'!

'আমি লীলু। লীল কণ্ঠ সিং'

পান্নুর বুকটা দুরু দুরু করে ওঠে। নীল কণ্ঠকে দেখলে এত ভয় পায় কেন? নীল কণ্ঠ এগিয়ে আসে।

'হাল্যা বলদটি খুঁজতে এস্যেছিলম হে। কার যেমুন একটি কাঁদনের আওয়াজ শুনলম?

পান্নু চমকে উঠে। 'কই না ত'

'অ, তবে বোধ হয় শকুনির কান্না।' হবেও বা। শকুনির কান্না মাঝে মাঝে মানুষের কান্নার মত শোনায়। কিন্তু নীলকণ্ঠ কি রসিকতা করল পান্নুর সঙ্গে? গলার স্বর শুনে মনে হল একটা স্বাভাবিক অনুমানে শুকুনির কান্নার কথা বল্ল ও। কিন্তু ওর ঠোঁটে কি চাপা হাসির ঈশারা ছিল? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা গেল না।

কাল সারারাত জাগরণ গেছে। আজ পরব। সমস্ত রাত ধ'রে গান গেয়েছে আর নেশা ভাং করেছে পুরুষেরা। বিশেষ করে আজ যারা ভক্তা হবে বা দণ্ডী হবে। তাদের সাহস আর বুকের বল অটুট থাকা চাই। ভক্তা হ'লে ফুল গুঁধার সময় গনগনে আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে। আর চড়কের টেঁড়া ডাঙ্গে শুন্যে ঘুর পাক খেতে হবে। অবশ্য দণ্ডি হ'লে এতখানি কষ্ট নেই। যার যেমন মানত। কেউ বা লেদা পিয়াল তলা থেকে, কেউ বা কালিন্দী সায়রে মামা ভাগনে-ঘাট থেকে স্নান করে ভিজে কাপড়ে তিয়াসি বাবার থান পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা গড়াগড়ি দিতে দিতে আসবে অথবা সর্ব্বাঙ্গ মাটীতে লুটিয়ে একবার উঠে দাঁড়াবে আবার মাটীতে শুয়ে প'ড়বে এই ভাবে। তিয়াসি বাবার থানে আজ বিরাট মেলা। বকুল নগর থেকে খুচরো দোকান দাররা দোকান খুলেছে। কাটা কাপড়ের দোকান। কেমিক্যালের

গয়না, কাঁচের চুড়ী, এ্যালুমিনিয়ামের শস্তা বাসন পত্র। তেলে ভাজার দোকান। কোনের দিকে 'ঝাণ্ডি মুণ্ডি' খেলার আসর। এইটেই বেশি আকর্ষনীয়। পয়সা জেতার নেশায় সমস্ত দিন এখানেই প'ড়ে থাকে ছেলে ছোকরারা। একটা প্রকাণ্ড অয়েল ক্লথের উপর আঁকা নানা প্রকার ছবি। তার ওপর বাজীর পয়সা রাখতে হবে। তারপর কতকগুলো হাড়ের খুঁটি একটা টুপীতে ঝাঁকিয়ে মাটীতে ফেলে ভাগ্য পরীক্ষা করা হবে। যদিও এটা অন্যায় প্রশ্রয় তবুও বৃদ্ধরা কিছু বলে না। দুদিন বৈ তো নয়। 'চিহ্ড় বাকলের দড়ি দিয়ে ঘেরা ছো নাচ আর লাচুনী নাচের আসর। আজ রাত্রে ছো নাচ। নটবরের দল। কাল রাত্রে লাচুনী নাচ। এবারের পরবে লাচুনী নাচ শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রাস্তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে ডহরের ধারে চড়কের টেঁড়াডাঙ্গ। তার কাছাকাছি ফুল গুঁধার নালা। এবেলা 'ফুল গুঁধা', ও বেলা ভক্তাদের মিছিল। একটা হাত খানেক চওড়া আর আট হাত খানেক লম্বা নালা। তার মাঝে গনগনে আগুন। দুপাশে জন কয়েক লোক বড় বড় তাল পাতার পাখা দিয়ে বাতাস করছে যাতে আঁচ কমে না যায়, ছাই জমতে না পারে। যেখান থেকে ফুল গুঁধা সুরু হবে সেখানে। আর যেখানে শেষ হবে সেখানেও গুচ্চের ভিজে শ্যাওলা। ওরা বলে দল। ভক্তারা এই ভিজে দলে পা দুটো ভিজিয়ে গনগনে আগুনের ওপর খানিকটা হাঁটবে। তারপর ওপারে গিয়ে আবার ভিজে দলে পা দেবে তাহ'লে ফোস্কা প'ড়বে না। ঘা হবে না পায়ে। এ বিষয়ে পাখাদার দেরও খানিকটা দায়ীত্ব আছে। ফুল গুঁধার আগুনে ছাই জমলেই ভক্তাদের পায়ে ফোস্কা প'ড়বে। নানান্ বাহারে সাজ পোষাক পরে 'পরব টাঁড়ে' ঘোরা ঘুরি করছে মেয়ে পুরুষ আর ছোট ছোট বাচ্চারা। ভ্রমর আর পদ্ম মেলা দেখতে বেরিয়েছে। বেশ লাগে। পদ্ম ভাবে। ছোটবেলায় এই মেলার আনন্দে কতবার চোখে ঘুম আসত না। কোমরে ডুরে শাড়ী জড়ানো। কপালে কাঁচ পোকার টীপ। পায়ে রূপোর মল। কোমরে বিছে। সুন্দর ছাঁদে খোঁপা বাঁধা। উমাশশী সাজিয়ে দিত ওদের। সৌখিন বলে এক সময়

নাম ছিল উমাশশীর। ভ্রমর আর পদ্ম মেলার মাঝে ঘুরে বেড়ায়। সবাই সমীহ করত উমাশশীকে। ভালও বাসত। পদ্মকে ওরা ভয় করে। পদ্মর ভ্রুকুটীতে শঙ্কিত হয়। মেলায় এখনও তেমন ভীড় হয়নি। শুধু ফুল গুঁধার কাছে কিছু ভীড়। ভক্তারা স্নান করে খালি গায়ে ফুল গুঁধার নালার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে সারি বেঁধে। ওদের চোখ গুলো গাঁজার নেশায় জবা ফুলের মত লাল। দুপাশে ক্রমাগত বাতাস করছে কয়েকজন। বিস্ফারিত ও বিস্ময় বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে আছে নগাই। নগাই প্রতি বছরই ফুল গুঁধা দেখেছে। কিন্তু প্রতি বছরই ওর চোখ জুড়ে রাজ্যের বিস্ময়। ভীড় করেছে ভক্তদের উৎসাহ দেবার জন্য। ঢাক ঢোল ধামসা বাজছে। অকস্মাৎ জনতা চীৎকার করে উঠল 'জয় বাবা ভোলানাথ কি জয়, জয় বাবা ভূতনাথ কি জয়, তিয়াসি বাবা কি জয়। ঢাক ঢোলের শব্দ চরমে উঠল। কানে হাত দিল পদ্ম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফুলগুঁধা সুরু হ'ল' এক একজন করে ভক্তা হেঁটে যেতে লাগল সেই গনগণে আগুনের উপর দিয়ে। ভয়ে আর আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল পদ্ম। 'চল্ বৌ ঘর যাই।'

'কেনে ? ডর্যাছ বুঝি ?'

'না ডর্যাই নাই, শরীলটি কেমন যেন শির শির করে উঠেছে।'

'চল তবে' ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে বাইরে বেরোয়।

'শশীকমলের বউ কেমন আছে গো ? উয়াকে ডাহিনে মেরেছিল নাকি ?' পদ্ম শুধোয়।

'নাই জানি ভাই। ডাহিনে আমার পেত্যয় নাই। তবে উ ভাল আছে। ডাহিনে যদি খেয়েছিল তবে সে ডাহিনকে ত' গুণীণ সেই দিনই পাছড়্যাই মারলেক। আসলে উ কথা লয়। উয়ার আমার একই রোগ। তবে উয়াকে যদি ডাহিনে খায়, তবে আমাকে খাবেক চিরকুনে ?',

ভোমর বৌএর কথা গুলোর অর্থ ঠিকমত বুঝতে পারে না পদ্ম। 'ইয়ার মানেটি ভাই বুঝতে লারলম।'

'দেখ ভাই, ভগমানের কি লীলা, যে একটি কোল জুড়া সন্তান চায়, তাকে দিবেকনি, আর যে, বছর বছর আঁতুড়ে ঢুকে 'থক্যে' গেল, তার ঘরে ছেল্যার বান বন্ধ করবেকনি। আমাদের হয়্যেছে তাই। শশ্যার বউ চায় একটি ছেল্যা। উয়ার মনটি সারা ক্ষণই এই আশেয় পিছে পিছে ছুটছে অথচ ভগমান লিদয়। কিন্তুক মানুষের মন ত'। পাথর ত লয়।'

পদ্ম ভোমরের কথা শুনে খানিকটা অবাকই হয়। শশীর বউ এর আশা আকাঙ্খার সঙ্গে ডাইনীতে পাওয়ার সম্পর্ক কি?

'আছে ভাই আছে। উয়ার মনটি উলট পালট হয়্যে গেইছেন। উসব ডাহিন টাহিন সব মিছা কথা। ভ্রমর বৌ বেশ জোর দিয়ে বলে কথা গুলো। আশ্চর্য্য। সংসারের বোঝা বইতে বইতে যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তার গলায় এত জোর আসে কোথা থেকে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় পদ্মর। 'আচ্ছা বৌ, তুমি ভক্তা হত্যে চেয়েছিলে কেনে গো?'

হঠাৎ ভোমর বৌএর মুখের সব উজ্জ্বল্য হারিয়ে যায়। সব উৎসাহ ফুরিয়ে যায় এক নিমেষে। পদ্মর মনে হয় কে যেন একটি মাত্র ইশারায় মুহর্ত্তের মধ্যে ভ্রমর বৌএর শরীরের সব রক্ত শুষে নিয়েছে। ভ্রমর বৌএর চোখের দিপ্তি নিভে যায়। এই মুহর্ত্তের হৃতস্বপ্ন, ক্লান্ত প্রাণ ভ্রমরকে দেখে যেন কল্পনাই করা যায় না যে তার মণ প্রাণ, চাঞ্চল্য, উজ্জলতা, চাপল্যে ভরা থাকতে পারে।

'সি কথা জেন্যে কি করবে ভাই' ক্লান্ত চোখ দুটো তুলে ভ্রমর বৌ বলে 'আমার দুঃখু আমারই থাক। সি কথা তুমাদিগে বল্লে তুমরা, ইহু করবে, আমার দুঃখে দুঃখি হবে সি আমি সইতে লারব।'

পদ্ম তবুও জিদ করে 'না তুমাকে বলতেই হবেক। হঠাৎ তুমার ভক্তা হবার সাধ হ'ল্য কিসে?

একটা করুন হাসি হেসে ভোমর বল্ল 'ভক্তা হওয়ার সাধ হয় নাই ভাই, মরনের সাধ হয়্যেছিল। মেইয়্যা মানুষ কি কুনদিন ভক্তা হয়?'

'সত্যি কথাটি কি বল দেখি মরণের সখই বা হল্য কিসে?'

'তুমার কাছে মিছা বলব নাই পদ্ম, আমি আর লারছি। আমার বাইরের এই ভেকটি মিথ্যা। আমার হাসি, তামাশা ঠাট্টা সবই ফাঁকি, শুধু আমার অন্তরের ব্যথাটিকে ঢ্যাকে রাখবার চেষ্টা। আমি দিবা নিশি ভগবানের কাছে মরন পাথ্থনা কার। কিন্তু যমও আমাকে পাসর‍্যো গেইছে আত্মঘাতী হবার সাহস নাই আমার। লোকেও দুসবেক। তাই ভেবেছিলম—।'

'কি, কি ভেবেছিলে' পদ্ম উৎকণ্ঠার সঙ্গে শুধোয়।

'ভেবেছিলম ভক্তা হব। ভক্তা হওয়ার কষ্টটি আমি সইতে লারতম। একে মেইয়া মাণুষ, তায় দুব্বল শরাল। লিচ্চয় ধাধসেই মর‍্যো যেতন। তখন লোকেও দুষত নাই। বরং বলত উ স্বগে্গ গেছে ভক্তা হয়্যে। আমাকেও আত্মঘাদী হত্যে হত নাই। তাই।

আশ্চর্য্য, এখন আর ভোমর বৌএর চোখে জল নেই। নেই কোন ব্যথা, বেদনা, আনন্দের অভিব্যক্তি। যেন দুটো মাছের চোখ। কোন জ্বালা নেই কোন যন্ত্রনা নেই। অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে ব'লেযাচ্ছে ওর দূর্বিসহ ইচ্ছার শপথের কথা। মরবার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি ভামর বৌ তাই নিজেকে বিনাশ করবার এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেছিল ও। আর আশ্চর্য্য, একজন মৃত্যু চায় নিরবিচ্ছিন্ন মাতৃত্বের বোঝা না বইতে পারার অক্ষমতায় আর একজন জ্বলে পুড়ে মরে সন্তানদীনতার বেদনাদ। পদ্ম এবার ভোমর বৌএর মুখের দিকে তাকায়।

এখন ওর চোখের কোনে দু ফোঁটা জল টল টল করছে। সেকি ওর মরতে না পারার দুঃখে না বেঁচে থাকার দুর্বিসহ বেদনায়?

পানু আজ সন্ন্যাসী। কিন্তু একদিন তাকে তিয়াসির গ্রামসমাজের কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়াতে হয়েছিল। সেদিন সে ছিল ভীক্ষার্থী। অনেক লাঞ্চনা, অনেক গঞ্জনা, অনেক অপমানের নির্দয় কশাঘাতকে অঙ্গের ভূষণ করে নিয়েছিল, তবু এরা সেদিন তাকে ঘর বাঁধতে দেয়নি। ওর সুখের স্বপ্ন ওদের নিষ্ঠুর পরিহাসে ভেঙ্গে চৌচির হ'য়ে

গিয়েছিল। লজ্জায়, ঘৃণায় ধিক্কারে সেদিন ওর ইচ্ছে হ'য়েছিল কালিন্দীর কালো জলে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে। সেদিন ওর সাহসে কুলোয়নি, অথবা একটা ক্ষীণ আশার আলো ওকে মরতে দেয়নি। যদি ওর শেষ চেষ্টাটা সফল হয়? যদি পদ্ম ওর সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে রাজী হয় তাহ'লে? তাহলে পান্নু সুখের সাম্রাজ্যের সম্রাট। বকুল নগরের ধানের কলে, কিংবা ধানবাদ ঝরিয়ার কলিয়ারী অথবা আরও দুরে আসামের চা বাগানে পাতবে ওর সুখের সংসার যেখানে এই বেদরদী মানুষগুলোর বিষাক্ত নিঃশ্বাস ওদের স্পর্শও করবে না। কিন্তু পান্নুর সে স্বপ্ন সফল হয়নি। আজ পান্নু সন্ন্যাসী। কপর্দকহীন ভিখারী। কিন্তু এই জীবনেও আনন্দ আছে। পান্নু ভাবে। তিয়াসির মাতব্বর থেকে সুরু করে গৃহস্থদের বৌঝিরা, তাদের যৌবনবতী কুমারী মেয়েরাও পান্নুর পা ছুঁয়ে প্রনাম করে। আশির্ব্বাদ ভিক্ষা করে তার কাছে। পান্নু বাধা দেয় না। বেশ লাগে। মনের মাঝে জমে থাকা দীর্ঘদিনের আত্মতৃপ্তির আনন্দটুকু উপবাসীর মতই তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করেও। সেদিন তার কাছে প্রতিটি গৃহের দুয়ার ছিল বন্ধ আর আজ তার গতি চতুর্প্রসারিত। বরং পান্নুর আবির্ভাবকে তারা ভগবানের আশীর্বাদ ব'লে ধ'রে নিয়েছে। পান্নুর মাঝে মাঝে হাসি পায়। সেদিনের দশের মজলীশের কথা মনে পড়ে। সেদিন দশজনাকে খুশি করবার জন্য একটা খাসি দিয়েছিল কিশুন, আর চার হাঁড়ী পচাই। পচাই খেয়ে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিল মাতালী বুড়ী। হেঁটকুলীর শেষে মালতীদেরই উঠোনে ব'সে কমবয়সি মেয়েরা জটলা করছিল। বুড়ী ওদের রসের গল্প শোনায়। মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

মেইয়া মানুষের যৈবন যেমুন পদ্ম পাতায় জল 'মাতালী বুড়ী বলছিল' এই আছে ত' এই নাই। যেমুন ভোর রাতের আঁধার। আজ তুর রূপ আছে, গতর আছে, যৈবন আছে, কাইল থাকবেক নাই। তাই ত' বলি লো, রোপ যৈবন থাকতেই মনের মানুষগুলিকে আঁচলের গিরায় বেঁধ্যে লে। যেন সে বাঁধন কুনদিন না খুলে। এই

মালতীর মতন। 'মালতী আজকার আসরের মধ্যমণি। মালতীর মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হয়্যে ওঠে। অমন জিহুড় ফুলের মতন রাঙ্গা হছিস। কেনে। তুর মনের মানুষ সি ছোঁড়াটি কই, তুটি রসের গীত শুনাতম। সেই বলে নাই 'কুঁড়া খাঁয়্যে মরল্য বাপ, তার বেটার বিরতাপ।' তা সেই বিরতাপ্যা ছেল্যাটি কই? বিহার লেগে যার এত 'রীজ' ?'

মেয়েরা কৌতুক বোধ করে কিন্তু এখন কি আর কিশুনকে পাওয়া যাবে। ও এতক্ষণ মজলীশে গলায় গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হয়ত। দুরুদুরু বুক। পাছে অনুমতি না পাওয়া যায় 'পঞ্চ' জনার। পানু একটা গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিল এদের রঙ্গ রস। এদের মধ্যে পদ্ম নেই।

মাতালী বুড়ীর রঙ্গ দেখে কে যেন বলে 'যত বয়স বাড়ছে, বুড়ীর লাজ সরম তত কমছে।'

বুড়ীর কানে যায় কথাটা। 'কে বললি লো? কি বললি আমায় লো? কে বললি আমার লাজ নাই?' 'কোমরে হাত দিয়ে একপাক নেচে বুড়ী বলে 'বলি লাজ কিসের? লাতিনদের সঙ্গে রসের কথা বলব তাতে লাজ কিসের। আজ আমি লাচব, দে লো, তোদের পায়ের-ঝুমর মল গুলিন দে, আর একটা নীলাম্বরী শাড়ী এনে দে আজ আমি লাতিনের বিয়ার খুশিতে লাচব।'

মালতী বুড়ীকে ধরে বসিয়ে দেয়। 'আ গেল যা. 'অসঠা' দেখ, ব্যাঁত পর্য্যন্ত মদ গিলেছে বুড়ী···

হঠাৎ বুড়ীর চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল গড়াতে থাকে? মেয়েরা শশব্যস্ত হ'য়ে জিগ্যেস করে 'কি হইছে? কি হইছে বুড়ী দিদি? কাঁদছিস কেনে?'

'কাঁদব নাই? আজ যদি লিশানাথ বেঁচে থাকত।' বিশ বছর আগে মৃত মালতীর বাপের জন্য সহসা বুড়ীর শোকটা উথলে ওঠে। আবহাওয়াটা কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ হয়। মালতীর সেই মুখরা সঙ্গিটি বলে 'তু চুপ কর বুড়ী দিদি। আইজের দিনে কেঁদে কেটে মালতীর মনটি বেজার কর‍্যো দিস না।'

কাঁদব নাই? বলিস কি লো? লিশানাথের জন্যি কাঁদব নাই? কাঁদব, একশ বার কাঁদব, হাজার বার কাঁদব।' বুড়ী সত্যি সত্যিই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। মেয়েরা বিরক্ত হয়ে ভারী ভারী পায়ে মল বাজিয়ে চলে যায়।

হঠাৎ পানুর মনটাও যেন কেমন বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে। একটা দুঃসাহসিক ইচ্ছা ওর মনের মধ্যে দোল খায়। এই নিত্যদিনের আশা নিরাশার আলো আঁধারী শেষ হ'য়ে যাক: পানু ভাবে। কি ভেবে যেন দশের মজলীশের দিকে পা চালায় পানু। পানু যখন দশের মজলীশে পৌঁছাল তখন সবে মাত্র কিশুনের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। সভায় একটা আনন্দের সুর ভেসে বেড়াচ্ছে। কিশুন চোখ ঠেরে ইশারা করে পানুকে। ওর চোখে মুখে একটা তৃপ্ততার আভাস। আজ ওর চেহারাতেও বেশ একটা জৌলুস এসেছে। চেরা সিঁথির্ দুপাশে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল গুলো কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। পরনে মোটা পাড়ের ধুতি। গায়ে রঙ্গীন ছিটের পিরান। কাঁধে গামছা। বিয়ের আগে চেহারায় বেশ একটা খোলতাই আসে। পানু ভাবল আবার।

মজলীশে তখন নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হ'চ্ছে। নানান্ সামাজিক সমস্যা, একাল ও সেকালের সুখ সুবিধের তুলনা, ছোকরাদের বেশরম চাল চলন ইত্যাদি।

সেই বেপরোয়া ইচ্ছের কাঁটাটা খচ্ খচ্ করে পানুর মনের মধ্যে। এ ইচ্ছাটা কেন জেগেছিল পানু তা জানে না। কিন্তু ওর অবচেতনে ফলাফলটা সম্বন্ধে ও নিশ্চিত ছিল। তবু ভেবেছিল পৃথিবীতে অনেক কিছু অলৌকিক ঘটনাই তো ঘটে যায়। তার মধ্যে মাত্র একটা যদি ওর জীবনেই ঘটে, তাতে তার কি যায় আসে? কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে একথা ভেবে হাসি পেয়েছে পানুর। কোন এক তীর্থ যাত্রীর কাছে একটা গল্প শুনেছিল পানু। একটা ছাগল নাকি প্রচুর পরিমানে মদ খেয়ে একটা হাতীকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করেছিল। 'আজ, আমি তোমার সঙ্গে কুস্তী লড়েগা।' সেদিনের কথাটা মনে প'ড়লেই নিজেকে সেই অসহায় ছাগলটির ভূমিকাভিনেতা বলে মনে হয় পানুর। সেদিন

অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারেনি পানু, শেষ পর্য্যন্ত বলেই ফেলেছিল।

'দশের মজলীশে আমারও একটা নেবেদন আছে হে মাতব্বর কাকা' মাতব্বর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিল। ওর দৃষ্টিটা ওঠানামা করেছিল পানুর সর্ব্বাঙ্গে। সেদিনই প্রথম মাতব্বরের মনে হ'য়েছিল উমাশশীর এই পালিত পুত্রটি, যে পদ্মার সঙ্গে ছোটবেলায় খেলে বেড়াত সে আজ 'জুয়ান' হয়েছে। এবং আর একটা সন্দেহ জেগেছিল মাতব্বরের মনে, এখনও কি পদ্মর সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতা একই প্রকার? কিন্তু পরক্ষণেই সব সন্দেহের নিরসন করে পানু বলেছিল

'আমি মাতব্বরের বিটি পদ্মকে বিয়া করতে চাইছি, আপনারা অনুমতি দাও।'

সভায় যেন বজ্রপাত হল। মুহূর্ত্তের জন্য সবাই হতবাক ও সম্বিৎ হারলো। গাছের পাতা গুলো যেন কি এক অজানা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল। পুবালী বাতাসও থমকে গেল অকস্মাৎ।

শশী কমল তখন নেশা ভাং করত না। অত্যন্ত চতুর ছিল শশীকমল। সভায় নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে শশীকমল বল্ল 'তু কি পাগল হয়েছিস পানু? তুর কি এমুন অবস্থা যে তু মাতব্বরের কইন্যাকে বিয়ার বাসনা করেছিস?'

কে যেন টীপ্পনি কাটল 'ভাত পায় না কালা, কালার বিহার বড় জ্বালা।'

বিরক্ত হয়ে শশীকমল বলে 'আঃ। ইটি মজলাশ বটে। 'অসৈরণ' কথা বলা ঠিক লয়। পরে পানুর মানসিক অবস্থার কথা আন্দাজ করে বলে 'তাছাড়া তুদের বিয়ার বয়স ত পের‍্যাই যায় নাই। তু কাজ কম্ম কর, লিজের অবস্থাটি ফিরা, মাতব্বরের কইন্যাকে বিয়া করবার উপযুক্ত হ, তখুন দশের মজলীশ তুকে অনুমতি দিবেক।'

মাতব্বর এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান হারার মত বসেছিল। পানুর এই আকাঙ্খা এত অচিন্তনীয় ও অবাস্তব মনে হয়েছিল যে মাতব্বর কিছুক্ষণ বাক্য হারা হ'য়ে গিয়েছিল। এবার মাতব্বর হুঙ্কার দিয়ে

ওঠে 'তুকে আমি কালিন্দীর পাঁকে পুঁতে দিতম। কিন্তুক, আমি মাতব্বর। তবে শশীকমল যা বল্লেক সিটিও ঠিক লয়। তু অবস্থা ফিরালেও তুর সঙ্গে পদ্মর বিয়া দিব নাই। কখনও না। কুন দিন না।'

শশীকমল ব্যাপারটা সাময়িক ভাবে থামাতে চায়। পান্নু সভ্য জোয়ান হয়েছে। ওর চোখে এখন মায়ার কাজল। এ নেশা অবশ্য দুদিনেই কেটে যাবে। তবু, ওকে ব্যথা দিতে মন চায় না। শশীকমলও তার কমাস আগেই বিয়ে করেছে। তার মনটা তখনও কোমল ছিল। ও মাতব্বরকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

'এতটি রোষ তোমার ঠিক লয়। তুমি হল্যে গাঁয়ের মাতব্বর। উ একটা ছুটু ছেল্যা। হঠাৎ 'উদ্বেগে' বল্যেছে কথাটি। দু দিন বাদেই সব ঠিক হয়্যে যাবেক।'

'না, তু থাম শশীকমল। ইটি ছুটু ছেল্যার কথা বলে উড়্যাই দিলে চলবেক নাই। আমাদের কালে বিয়া হল্যে উ ছেল্যার বাপ হত। উয়াকে জানাই দিচ্ছি, ফের যদি কুনদিন ই কথা উচ্চারণ করিস ত' গাঁ থেকে বার কর্যে দিব।'

ঠিক এই সময় সভার প্রান্ত থেকে কে যেন সেই মারাত্মক কথাটা ছুঁড়ে দেয়। এক রাশ গরম সীসের মত এসে লাগে পান্নুর গায়ে।

কে যেন বলে 'ছোঁড়ার সখ দেখ। জন্মের যার ঠিক নাই, জন্ম দিয়ে যার মা পালাল পর পুরুষের হাত ধর্যে তার···

শেষ কথাটা শুনতে পায়নি পান্নু। সভায় একটা তুমুল হাসির রোল উঠেছিল। এবং সেই মুহূর্তেই সভা ছেড়ে চলে গিয়েছিল শশী কমল। কেউ এতটুকু সমবেদনা জানায় নি পান্নুকে। এই অপমান কারো প্রাণে ব্যাথা লাগেনি। শুধু মঙ্গলীশের ফলাফল শুনবার জন্য আসতে আসতে গোলমাল শুনে মাতালী বুড়ী জিগ্যেস করেছিল কি হইছে বাপ, কি হইছে রে?

কে যেন বলেছিল 'পান্নুর সাধ হইছে মাতব্বরের কন্যাকে বিয়া করবার।

'কে পানু ?'

'হুই যে উমাশশীর 'পুসনা' গো। উয়ার মা ভেড়ী ওয়ালাদের সঙ্গে পালাইছিল।'

বুড়ী এগিয়ে গিয়েছিল ঈশ্বরীর দিকে। কি হইছে বাপ ঈশ্বরী ?

বুড়ীর কাছে নৈতিক সমর্থনের আশায় ঈশ্বরী বলেছিল 'হুই উমাশশীর পুসনা ছেল্যাটা পদ্মর সঙ্গে বিয়া দিতে বলেছিল উয়ার।'

বুড়ী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে 'তা বেশ ত' দে কেনে বিয়া।'

'তু কি বলছিল মাঈ। জাত নাই কুল নাই, উয়ার সঙ্গে আমার বিটির বিয়া দিব ?'

বুড়ীর নেশা কেটে যায়। ধীরে ধীরে বলে 'ছিঃ ছিঃ উকথা বলিস না বাপ। মায়ের তুল্য ধন নাই। উয়ার মা যাই করুক, মা ত' বটে। আর তাতে ছেল্যাটির অপরাধ কি ?' ঈশ্বরীর হাত ধরে বুড়ী বলে 'অমন করিস না ঈশ্বরী ভালবাসা পরানের ধন। উয়াতে কুন কলঙ্ক নই, কুন পাপ নাই।'

ঈশ্বরী বিরক্ত হয় 'তু থাম ত' মাঈ। লেশা করবার জায়গা ইটা লয়। আমি তিয়াসির মাতব্বর। আমার একটা মান নাই। দুনিয়ায় কি আর ছেল্যা নাই যে বিটির বিহা দিব উ বেজন্মার সঙ্গে ?'

'ছিঃ ছিঃ উ কথা বলিস না বাপ। উয়াকে বেজন্মা বল্লে সে গাল উয়ার মাকে লাগে। তু দুনিয়ার মায়ের জাইতকে গাল দিস না বাপ। আর বিয়া তুরা দিবি নাই আমি জানি। ই ত' আজকার কথা লয়। চেরদিন তুরা ভূমিজ মেইয়্যাদের অন্তরে আগুন জ্বালাইছিস। তুরা কুনদিন সুখ দিতে পারিস নাই। কুন দিন না। কুন দিন না।' কোন অজানিত কারণে বুড়ীর ক্ষীনদৃষ্টি চোখ দুটো জলে ভরে ওকে অন্ধ করে দেয়।

গভীর রাত্রে পদ্মর দরজায় টোকা মারল পানু। পদ্মর চোখে সবে তখন তন্দ্রা এসেছে। পাশে শুয়ে মাতালী বুড়ী ঘুমুচ্ছে নিঃসাড়ে। আজ প্রচুর মদ খেয়েছে ও। মাতব্বর মজলীশ সেরে এখনও ফেরেনি। রাত প্রায় দু পহর। ঘুলঘুলীর ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে

পড়েছে। পদ্ম একটা মিষ্টি স্বপ্ন দেখছিল। হঠাৎ দরজায় টোকা মারার শব্দ শুনে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। প্রথমে ভাবে বুঝিবা কুমীরে পোকা। তুরজার কাঠ কুরে কুরে খাচ্ছে। এক মুহূর্ত্ত কান পেতে শোনে তারপর দরজার গোড়ায় এসে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে জিগ্যেস করে 'কে' পদ্মর গলা শুনে আশস্ত হয় পান্নু। 'আমি, পান্নু'

'এত রেতে?' দরজা খুলতে খুলতে আপন মনেই ফিস ফিস করে পদ্ম।

দরজা খুলতেই পান্নু বলে 'বাইরে আয় পদ্ম, কথা আছে তুর সঙ্গে।'

'কিন্তুক বাপহারীটায় যে এখুনও আসে নাই।' 'তবু তু, এক বারটি আয় পদ্ম, আর সময় নাই। আমাকে রাইতের মধ্যেই গাঁ ছেড়ে চল্যে যেতে হবেক। তুর সঙ্গে আর কনদিন দেখা হবেক নাই। তু একটি বার বাইরে আয়। তুর সঙ্গে শেষ কথা কইব। পান্নু মিনতি করে।

পদ্ম সঙ্কিত হয়। কিন্তু কেন? পান্নু গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে কেন? তাহ'লে কি?

পান্নু পদ্মকে হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে যায় বাঁকা পোলে। পদ্ম পরিশ্রমে আর আতঙ্কে হাঁপাতে থাকে। 'কি বলবে জলদি বল। পদ্ম বলে 'বাপহারীটি এস্যে গেলে বেপদ হবেক।'

'পদ্ম, আমি আইজ রাতেই গাঁ ছেড়্যে চল্যে যাব।'

'সি কথাটি ত' তুমি আগেই বুলেছ, কিন্তুক কেনে?'

সেকথার জবাব না দিয়ে পান্নু বলে 'তু আমার সঙ্গে চল।'

'আমি' পদ্ম পান্নুর বেহিসেবী কথায় আশ্চর্য্য হয়। 'কিন্তুক 'বিত্তান্তটি বলবে ত'।'

'মজলীশ আমাকে অপমান কর‍্যেছে পদ্ম। আমার মাকে উয়ারা অকথা কুকথা বুলেছে। আমার পাথ্থনাটি উয়ারা মঞ্জুর করে নাই।'

'কিসের পাথ্থনা' পদ্ম কিছুই অনুধাবন করতে পারে না। সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে কেমন যেন গোল মেলে মনে হয়। আজ তো কিশুন আর মালতীর বিয়ার' ব্যাপারে মজলীশ বসেছিল, তাইলে?

'কিশুন আর মালতীর বিয়া যখুন উয়ারা মঞ্জুর করলেক, তখুন আমি আর রইতে লারলম পদ্ম। আমার মনটা আঁকু পাকু করতে লাগলেক। আমি ভাবলাম কত 'অজগইবি' ত' ঘটে। তেমনী যদি মাতব্বর 'সুদয়' হয়্যে যায়? কিন্তুক উয়ারা আমার কথাটি শুনলেক নাই পদ্ম। আমার সুখের স্বপুন চইখের জলে ভেস্যে গেল।'

পদ্ম শিউরে ওঠে। 'ই তুমি কি করলে গো, ই তুমি কি করলে, কাইল দিন যে আমার মুখ দেখানো ভার হবেক?'

শুধু এই আর কিছু নয়? আর কোন দুঃখ হয়নি পদ্মর আর কোন ব্যাথা বাজেনি ওর প্রাণে?

'কিন্তুক তু বল পদ্ম, ভালবাসা কি হয় অবস্থা দেখে? উয়ারা আমার কথায় পেত্যয় করলেক নাই। উয়ারা আমাকে গাল দিলেক পদ্ম। আমার মাকে গাল দিলেক।' দুঃখে, অপমানে, বেদনায় পানুর চোখ বেয়ে জল গড়ায়। দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পদ্মর পায়ের উপর পড়ে। পানুর হাতটা নিজের হাতে নিবিড় উষ্ণতার মধ্যে রেখে অত্যন্ত আবেগ ভরা গলায় পদ্ম বলে 'মজলীশ তুমার জন্যি লয়। ভালবাসা অবস্থা দেখ্যে হয় না গো। কিন্তুক বিয়া হয় সমানে সমানে।

পানু বিস্ময়ে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বলে 'তুই ও ই কথা বলছিস পদ্ম?'

পদ্মর কথাটার ভূল অর্থ করে পানু। আমার কথাটি তুমিও বুঝতে লারলে। ভালবাসা হল্যেই বিয়া হয় না পানু দাদা। তবে আমি পেত্যয় করি ভালবাসা মিছা হত্যে পারে না, কখুনও না, কুনদনও না।

'তবে তু আমার সঙ্গে পালাই চ' পদ্ম। আজ রেতে। এখুনি।'

পদ্ম বিস্ময়ে হতবাক। কি বুলছ তুমি, তুমি কি পাগল হয়্যেছ।'

'হঁ পদ্ম আমি পাগল হয়্যেছি। তু আমাকে পাগল করে দিয়েছিস। তুকে না পেল্যে ই জেবন আমি রাখব নাই। তু আমার সঙ্গে পালাই চ' পদ্ম। আমাকে বাঁচা।

পান্নুর কথা গুলো যেন মুমূর্ষু রোগীর মত শোনায়। কিন্তু না। পদ্ম মেয়েমানুষ। অতখানি সাহস পদ্মর নেই।

ধীর কণ্ঠে পদ্ম জবাব দেয় 'সে হয় না পান্নু,' পদ্মর মনের ভাবটা আন্দাজ করে পান্নু বলে 'তুর লেগ্যে আমি লোক লজ্জা, অপমান, কিছু গায়ে মাখি নাই পদ্ম। তুর লেগ্যে আমি সব কলঙ্ক মাথায় পেতে লিতে পারি। শুধু তুর লেগ্যে পদ্ম, শুধু তুর লেগ্যে।'

পদ্ম এবার যথার্থই ভীত হয়। রাত পুইয়ে আসছে। আঁধার কাটেনি এখনও। এরই মধ্যে দু একটা অধৈর্য্য পাখী আকাশের বুকে ছুটোছুটী করছে। শালুক ডুরীর শূন্যতাকে বুকে ক'রে পাহাড়তলীর হিমেল বাতাস ভেসে আসছে। কেমন যেন একটা ভয় জাগানো হিস্ হিস্ শব্দ। পদ্ম জানে, এই শব্দ শালুক ডুংরীর শূন্যতার হাহাশ্বাস।

'রাত ভোর হয়্যে আসছে, ই বার আমাকে যেতে দাও' পদ্ম বলে।'

'আমাকে তুর ভয় লাগছে পদ্ম'

ম্লান হাসি হেসে পদ্ম বল্ল না, ভয় আমার লাগে না পান্নু, তাহল্যে এই দু-পহর রেতে একা আসতম নাই। মানুষকে আমি ডর্‌্যাই নাই। আমার ডর কলঙ্কের লোক লাজের। কাইলের বিত্তান্তর পর আইজ যদি এই মুর্গি ডাকা ভোরে তুমার সঙ্গে কেউ আমাকে দেখে, তাহল্যে আমি যে মুখ দেখাত্যে লারব। আমাকে যেত্যে দাও।'

'আর এক দণ্ড থাক... 'পান্নু মিনতি করে। বাপ যদি ফিরেছে তবে অনেক গঞ্জনা আছে আমার কপালে।' পদ্ম যেন অর্গল বদ্ধ হরিনীর মত ছটপট করে।

বাঁকা পোলের নিসঙ্গ পিয়াল তলায় অকস্মাৎ পদ্মর হাত ধরে পান্নু দুর্ব্বার হয়ে জিগ্যেস করে 'পদ্ম, তু আমাকে ভালবাসিস?'

পদ্ম ওর ডাগর চোখ মেলে তাকায় পান্নুর দিকে। পান্নুর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির সঙ্গে সেই দৃষ্টি একাকার হয়ে যায়। তারপর পদ্ম বলে 'সি কথা কি আইজ লতুন করে বলতে হবেক? সে লজ্জা আমি লুকাব কুথায়?' পদ্মর চোখের পাতা দুটো কাঁপে থর থর করে।

'তবে চল আমরা ই গাঁ ছেড়্যে চল্যে যাই। কেউ জানবেক নি

পদ্ম। অনেক দূরে চল্যে যাব। সেই আসামের চা বাগানে। সিখিনে আমরা দুজন খাটব, নতুন সংসার পাতব। ইয়ারা কুনদিন আমাদের নাগাল পাবেক নাই।

পদ্ম আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে 'না, না, আমি সে পারব নাই।'

'এত ডর তুর কলঙ্কের ?'

'সি তুমি বুঝবে নাই। মেইয়া মানুষের যৈবন সাদা কাপড়ের ল্যাখান। দাগ ধরতে দেরী লাগে নাই। আর সি দাগ কুন দিন মুছে না। আইজ তুমার সঙ্গে গাঁ ছেড়্যে চল্যে গেলে লোকে চেরদিন বলবেক হুইটা কলঙ্কিনী পদ্মর বাপের ভিটা। যি পদ্ম কুল ছেড়্যে বের্যাই গেছল। আমি যিখেনেই থাকি, সি লাজে কাঁটা হয়্যে থাকব। না, না, আমি লারব, ই আমি লারব।'

'আর আমার কলঙ্কের ভয় নাই' পানু পাল্টা শুধোয়।

'পুরুষের কলঙ্ক পলাশ ফুলের রঙ্গের মতন। দুদিনেই উঠে যায়। তুমার কলঙ্কর কথা লোকে দুদিন বাদেই ভুলে যাবেক। মেইয়া মানুষের কলঙ্ক খরিশ সাপের বিষ। উঠতে জানে নামতে জানে নাই। মানুষ চেরকাল মনে রাখে।'

"এত যদি কলঙ্কের ডর তবে ভাল বাসা কর্যে ছিলি কেনে ? চেরদিন জ্বলবার লেগ্যে ? না আমাকে জ্বালাবার লেগ্যে ?" পানুর কণ্ঠ অভিযোগের অসহিষ্ণুতায় কম্পমান।

পানুর কথায় আহত হয় না পদ্ম। পদ্ম সব বোঝে। পদ্ম মেয়ে মানুষ। আর পানু পুরুষ। বেপরোয়া বেহিসেবী।

শান্ত কণ্ঠে পদ্ম বলে 'ভালবাসা করতে হয় নাই পানু, হয়্যে যায়। মনের উপর ত' জোর নাই। থাকলে বোধ হয় করতাম নাই। কিন্তুক আমি আর লারছি থাকতে, ই বার আমাকে যেতে দাও।'

নিষ্ঠুর হয়ে পানু বলে "তু যা, তু যা পদ্ম, তু কুলের মেইয়্যা, ইখেনে রাত বিরাতে পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলছিস, লোকে কলঙ্ক দিবেক, তার চেয়ে তু কুন ভূমিজ জোতদারকে বিয়া কর সুখে থাকবি।

পদ্ম আর সইতে পারে না। ব্যথায় কাকীয়ে ওঠে 'উঃ আমি আর সইতে লারছি।'

পানু দুর্বার—'আমার বুকের পাঁজরের উপর তুর সুখের সংসার পাত পদ্ম। কিন্তুক যি গাঁয়ের লোক আমাকে কলঙ্ক দিলেক, ঘর বাঁধতে দিলেক নাই, সি গাঁয়ে আর আমি কুনদিন ফিরে আসব নাই। সব মিছা পদ্ম, তু আমার সঙ্গে ভাল বাসার ছল করেছিলি। তুর রোপ, যৈবন, ভালবাসা সব আমার কাছে মিছা হয়্যে গেছে, সব মিছা হয়্যে গেছে।' পানু শালুকডুংরীর মাঠ দিয়ে উন্মাদের মত ছুটতে থাকে।

'শুনে যাও, ওগো শুনে যাও' পদ্ম সব ভুলে গিয়ে চীৎকার করে ওঠে। পদ্মর আকুল আহ্বান পানুর কানে যায় না। শালুক ডুংরীর শূন্যতায় একটা প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে মাত্র।

কিন্তু নিজের কাছেই সে শপথরাখতে পারেনি পানু। কোন অজানা হাতছানিতে আবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে পানু। আর আশ্চর্য্য, শুধু পদ্ম ছাড়া আর কেউ ওকে চিনতে পারেনি এমন কি ওর এক অন্তরঙ্গ সহচর কিশুনও না। মাত্র বারো বছরের ব্যবধানে সব ধুয়ে মুছে গেছে। পানুর কথা ওরা সহজেই ভুলে গেছে। অথচ ভোলেনি ওর মায়ের জীবন যন্ত্রণার সামান্যতম অপরাধ। তার অনিচ্ছুক পদস্খলনের কলঙ্ককে মার্জনা করেনি। তিয়াসির মানুষ। তাকে শাস্তি দিতে পারেনি কিন্তু সেই শাস্তির বোঝা ব'য়ে বেড়াতে হয়েছে তার নিরপরাধ পুত্রকে। কিন্তু এখনও কি তার প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? বারো বছরে কত দিন, হয় কত রাত?

নগাইএর ঘরেই নাচনীদের থাকবার জায়গা হয়েছে। নগাই একা মানুষ। অথচ ওর দুটো বাসের ঘর। একটায় ও থাকে। একটা প্রায়ই ফাঁকা থাকে। কখনও কখনও গাঁয়ে কারোর বাড়ীতে কুটুম এলে ঘরে তার স্থান সঙ্কুলান না হ'লে নগাইকে অনুরোধ করে। নগাইএর মোটামুটী অবস্থা ভাল। ধানের জমি আছে।

একা মানুষ, তাতেই চলে যায়। ওরই দাওয়ায় বসে গাঁয়ের ছোকরারা নাচনীর জন্য অপেক্ষা করছিল। আসরের বাইরে নাচুনীকে দেখার বড় সখ। আসরে নাচনীর ঠমকই আলাদা। তখন সে রাজ রাণী। এতদিন কাজলী নাচনীর নামই শুনেছে এবার চোখের দেখা দেখবে। নাচনী এখনও এসে পৌঁছায়নি। মাতব্বর কুলী মুড়ায় ওর জন্য অপেক্ষা করছে। গল্প করছিল নগাই, কাশীনাথ, চড়কু ইত্যাদি। প্রসঙ্গটা হচ্ছে জটাধারী কিশুনের গ্রাম থেকে আকস্মিক তিরোধান। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে গ্রাম থেকে উধাও হ'য়েছে হালি সন্নাসী জটাধারী কিশুন। নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা। কেউ বলে ওকে শেষ দেখা গিয়েছিল জেটামূড়া'র চাটানে। কেউ বলে বাঁকা পোলের ধারে। এবং আশ্চর্য তখন নাকি ওর জটা ছিল না। একেবারে নির্মূল। এতএব ধারনা করতে বাধা নেই, মনের দুঃখে দেশান্তরী হয়েছে কিশুন। এবং সে দুঃখটি হচ্ছে এ গাঁয়ে নতুন সন্যাসীর আগমন। সেই দুঃখেই ও নাকি গাঁ ছাড়ার আগে জটাগুলিও নির্মূল করে গেছে।

অত্যন্ত বিজ্ঞের মত কাশীনাথ বলে 'এক আকাশে কি আর দুই সুয্যি থাকতে পারে। তাই গাঁ ছেড়্যে চ'ল্যে গেল কিশুন। যেনার তেজ বেশি, তিনিই থাকতে পারবেক। তাই ত' ই লতুন সন্যাসীটি রয়্যে গেলেন হে।'

নগাই হাঁ করে ওদের কথা বার্তা শোনে। কিশুন গাঁ ছেড়ে চলে গেছে? এতদিনের পরিচিত গাঁ? আহা, নগাই-এর চোখ দুটো বিস্ময়ে ভরে ওঠে।

'গেলেক ত' ভালই করলেক' চড়কু বলে 'কিন্তুক কাজলী লাচুনীর লাচটি দেখ্যে গেলে পারত। আফুশোষ রইত নাই তাহল্যে।'

এবার কথা কয় নগাই 'এ বাবা, উটি তুমি কি বলছ হে, সন্নাসী লাচুনী লাচ দেখবার জন্যে পিত্যেশ কর্যে বস্যে থাকবেক কেনে? উ সব তুমার আমার মতন সংসারী মানুষদের জন্যে।'

'কেনে সন্নাসী কি মানুষ লয়?' কাশীনাথ বলে 'মহাভারত

পড়িস নাই? এক একজন সন্ন্যাসীর এক একজন লাচুনী ছিল। যেমুন বিশ্বামিত্র ঠাকুরের ছিল মেনকা।' নিজের ধারণা অনুযায়ী মুনি ঋষিদের সঙ্গে নর্ত্তকীদের একটা নিকট সম্বন্ধের আভাস রামায়ণ মহাভারতের নজীর তুলে বিবৃত করে কাশীনাথ।

আশ্চর্য্য হয় নগাই। নগাই-এর এত সব জানা নেই। ওদের কথাগুলো যেন ও চোখ দিয়ে গেলে।

'আর কাজলী লাচুনীও নাকি মেনকার থিকে কম রঙ্গিলা লয়।' চড়কু বলে "গায়ের রং যেন সাঁঝের বেলার সুয্যুর মতন। মুশুর ডালের ভুষি মাখতে হয় না মুখে। হাতে কেমিক্যালের গয়না লয়, আসল সোনার। আহা, চোখ ধাঁধায় দেখে হে। মনটিকে রাঙ্গায় দেয় চুড়ীর ছটায়। চোখের ঠারে।' নাচনীর রূপ যেন কল্পনার আস্বাদন করে চড়কু। সবাই বেশ একটা পুলক অনুভব করে। শুধু তাই নয়। ওর নাকি চলনে বলনে নাচ, চোখের ঠারে নাচ। তাই ত' মরদরা ওর একটু হাসি দেখবার জন্য তীর বেঁধা তিতিরেব মত ছটপট করে।

সন্ধ্যের গোড়ায় গোড়ায় হাঠুরেদের সঙ্গে আসে কানুদাস ঝুমুর ওয়ালা। সঙ্গে কাজলী। গ্রামের প্রান্তে মাতব্বরের সঙ্গে দেখা হয়। এক গাল হেসে মাতব্বর অভ্যর্থনা করে ওদের। সেই যে বলে না,

'ভাল্যে আছি হাঁ কর্যে
বর্ষা এল্য লিরণ পার কর্যে'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় কাজলী 'তা বর্ষা, লিরনের পরেই আসেন মাতব্বর। লিরনের তাপে যখন ধরিত্তির চৌচির হয়্যে যায়, তখন আসে বর্ষা। ইয়াতে আর আক্ষেপের কি আছে?'

মাতব্বর হেসে বলে 'লাচুনী ঠিক কথাই বুলেছে, তবে লিরণের দিনেও এক আধ ফোঁটা না বর্ষিলে কি দেহ শান্ত হয়?'

'সব শান্ত হবেক মাতব্বর, সব শান্ত হবেক' কানুদাস বলে 'কাজলীর গলা লতুন বর্ষার জলের থিকেও মিঠা বটে হে।'

'তা বৈকি, তা বৈকি' মাতব্বর খুশি হয়। 'তবে চল তুমাদের থাকবার জায়গাটি দেখ্যাই দিই।'

'তাই চল' ক্লান্ত কণ্ঠে কাজলী বলে 'পাঁচ মাইল হেঁট্যে এসে আমার গোড়ালী ফুল্যে গেছে মাতব্বর, রেতে লাচব কি কর‍্যে ?'

'অমন রাঙ্গা পদ্মের মতন পা ছুটি তুমার। মালীশ করবার লোকের অভাব হবেক নাই হে।' মাতব্বর বলে।

ময়ুরের মত ঘাড় ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কাজলী বলে 'তাই নাকি ? ই গাঁয়ে পদ সেবারও লোক পাওয়া যায় নাকি ?'

'শুধু পদ সেবা কেনে' মাতব্বর বলে 'অঙ্গ সেবার লোকও পাওয়া যাবেক।'

কাজলী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিক খিক করে হেসে ওঠে 'হায়, হায়, লহর দেখ্যে মরে যাই। সেই যে বলে নাই, 'ধনবতী কুলা আমার ভাগ্যবতী কুলা, ভাতারে শুধাল্য আমাকে কত লিলিস মূলা'। তা মাতব্বরের বয়স হল্যে কি হবেক, পানে রস আছে। কিন্তুক না মাতব্বর, উ কর্ম্মগুলি তুমাকে দিয়ে করাব নাই। পাপ লাগবেক আমার। খানিক অমরশঙ্করের পাতা জোগাড় করে দিলেই হবেক। অমরশঙ্করের পাতার রস লাগালেই ঠিক হয়ে যাবেক।'

মাতব্বর আর কথা বাড়ায় না। এমনীতেই একটু বেশী প্রগলভতা হয়ে গেছে। আর কথায় বলে নাচনীর জাত নাই! এখুনি গায়ে গড়িয়ে পড়বে। কেন শেষ পর্য্যন্ত বুড়ো বয়সে—।

'যা দরকার সব পাবে' মাতব্বর কণ্ঠে ওর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যটা ফিরিয়ে এনে বলে 'কিন্তুক লাচ হতে হবেক একলম্বর। ছোকরাদের চইখে যেন আগুন ধর‍্যে যায়। যেন উঠতে লারে ছুদিন।'

'তার লেগ্যে চিন্তা কর না হে মাতব্বর। শুধু ছোকরাদের কেনে, বুড়াদেরও কাঁপুনি লাগবেক। এমুন্ লাচ দেখাব আর এমুন গান শুনাব যে সারা জেবনে আর এমুনটি শোন নাই।' কানুদাস বলে।

কাজলী শুধু গোড়ালীর উপর ভর দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে দুলতে থাকে। পায়ের মলগুলো মৃদু শব্দে বাজতে থাকে।

'সি কথা অবিশ্যি মিছা বল নাই হে' মাতব্বর বাঁকা চোখে কাজলীকে দেখে বলে 'লাচুনীর ত এখন থিকেই লাচের তাল ফুটছে পায়ে।'

'ইটি আমার জন্মের রোগ মাতব্বর কাজলী জবাব দেয়' শোন নাই লোকের মুখে, আমার চলনে লাচ, বলনে লাচ, সারা অঙ্গে লাচ?' কাজলী খিল খিল করে হেসে ওঠে।

মাতব্বরও হাসে। বলে 'শুনেছি, কিন্তুক মিছা দেরী কর্যে লাভ নাই হে। উপর কুলীর নগাই-এর ঘরে তুমাদের থাকবার জায়গা কর্যেছি।"

'একটী ঘর কিন্তুক আমার একার জন্যি চাই' কাজলী বলে বুঝতেই পারছ, সাজ পোষাক আছে।'

আহা। যেন শরমি লতা। মাতব্বর ভাবে। 'আচ্ছা তাই হবেক। নগাই না হয় দুদিন লখীন্দরের ঘরে থাকবেক। চল। খর খর চল।'

কানুদাস সঙ্কুচিত হয়। 'একটা নিশানা দিলেই হত। তুমি কেনে কষ্ট করবে ব্রেথা।'

'না না, কষ্ট কিসের।' মাতব্বরও ওদের সঙ্গে পা চালিয়ে হাঁটে।

'মাতব্বর বোধ হয় আমাদের সঙ্গ ছাড়তে লারছে।'

একমুহূর্ত্ত থমকে যায় মাতব্বর। তারপর বলে 'সি বয়স আর নাই লত্তকি। এক কালে আমার মাদলের বোলে লাচুনীরা পা সামলাতে লারত।'

পা মচকে গেলে তেল দিয়ে চুঁচে দিলে আমার ঠিক হয়ে যায় মাতব্বর। পা না সামলাতে পারলেও ক্ষেতি নাই। তবে মনটি হুড়কে গেলেই বিপদ। সেটি বেসামাল হল্যে তার আর কুন ওষুদ নাই।'

চট করে মাতব্বর বলে 'দেখ্যো লত্তকী, তুমি যেন উ বস্তুটি সামল্যে রেখ্য। উটির জিম্মা আমি লিতে লারব।'

'তার লেগ্যে তুমার চিন্তা নাই মাতব্বর। উটি আমি মহাজনের কাছে বন্ধক দিয়ে এসেছি। শুধু পথের কড়ি আঁচলে বেঁধে তুমাদের গাঁয়ে এসেছি।'

মাতব্বর ওদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। কাজলী যে রকম মুখরা হয়ত গাঁয়ের কোন ছোক্‌রাকে পথ জিগ্যেস করতে গিয়ে কোন কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। পথ চলতে চলতে গুনগুন করে ঝুমুর গায় কাজলী।

করিয়ে চাতুরী, বুকে দিয়া ছুরী, করিল প্রেমের
ভীখারী গো।
শুন সহচরী রহিতে না পারি কুথা গেলে
বংশীধারী গো॥

বেশ মিঠে গলা কাজলীর। এমন না তো লত্তকী। ঈশ্বরী ভাবে। কিন্তু পথে ঘাটে তো এমন গান গাওয়া ঠিক নয়। গাঁয়ের ছেলে ছোকরাদের মতিগতি বিগড়ে যেতে পারে।

বিরক্তির সঙ্গে মাতব্বর বলে 'পথে ঘাটে অমন করে গান গেও না হে।'

গান থামিয়ে থমকে দাড়িয়ে কাজলী জিগ্যেস করে 'কেনে?'

কেনে? মাতব্বরের ভারী রাগ হয়। আবার জিগ্যেস করে কেনে? যেন কিছু বোঝে না। হাজার মরদের মন পোড়ালে তবে নত্তকী হয়। আর এটুকু বোঝে না যে পথে ঘাটে গান গাইলে জোয়ান ছেলেরা আস্কারা পেয়ে যাবে। তারা শীষ দেবে। ইসারা করবে।

'বলি ইজ্জতের ভয় নাই তুমার?' মাতব্বর শুধোয়।

কাজলী শিউরে ওঠার ভান করে বলে 'সে কি মাতব্বর, ই গাঁয়ে মেইয়া মানুষের ইজ্জত কি সস্তায় বিক্যাই যায়? তাহল্যে ত ভয়ের কথাই বটে। বলি ও ঝুমুর ওয়ালা, চল হে, ই গাঁ ছেড়ে চল্যে যাই।

ইখেনের মরদরা ইজ্জত রাখতে জানে না। লুটতে জানে বোধ করি।'

স্তব্ধ হয়ে যায় ঈশ্বরী সিং মাতব্বর। পর মুহূর্তে ওর মনে খোঁচা দেওয়ার লোভ জেগে ওঠে। 'যার ইজ্জতের দাম আছে তার ইজ্জত ঠিকই থাকে, তবে—'

ঈশ্বরী কথাটা শেষ করে না। ওর কথার মধ্যে নিহিত খোঁচাটা হৃদয় স্পর্শ করে কাজলীর। ওর মুখটা অত্যন্ত বিষন্ন দেখায়। কাজলী ম্লান হেসে বলে 'ঠিকই বুলেচ মাতব্বর, লাচুনীর আবার ইজ্জত।'

ততক্ষণে ওরা পৌঁছে গেছে নগাইএর ঘরের কাছাকাছি। কুলীর দুদিকে নাচনীকে দেখবার জন্য উৎসুক মানুষের ভীড়। এ তল্লাটের সেরা নাচনী। যার চলনে নাচ, বলনে নাচ, চোখের ঠারে নাচ।

ওদের গলা শুনে নগাই বেরিয়ে আসে। ওর চোখে আলোর বিস্ময়। এই লাচুনী? আহা। দু চোখ ভ'রে দেখে। এরই নাম কাজলী? শতেক মনোহারিনী নর্ত্তকী উর্ব্বশী?

'ও মা, ই যে দেখেই ভাক্যাই গেল গো। কই হে দুয়ারটি খুলে দাও। জিনিষ গুলিন রাখি।'

নগাই এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পায়। বাস্তবিকই অন্যায় হ'য়ে গেছে। গদগদ স্বরে নগাই বলে 'এই যে খুলছি।'

'ছেল্যাটি ভাল।' মাতব্বর বলে।

'পৃথিবীতে ভাল ছেল্যার পেয়োজন নাই মাতব্বর। ই ছেল্যাটি ডুববেক।'

নগাই দরজা খুলে কাজলী আর পানু দাসের হাত থেকে জিনিস গুলো নেবার জন্য হাত বাড়ায়। কানু দাস ওর হাতের জিনিসগুলো দিয়ে যাচ্ছিল। সহসা ধমকে ওঠে কাজলী 'থাক, তুমাকে অত আদিখ্যেত্তা করতে হবেক নাই। ভগমান আমাদের হাত দিয়েছেন, আমরা নামাই লিব জিনিসগুলিন। তুমি এখন ই ঘর থিকে যাও তো ভাল মানুষের ছেল্যা।' কাজলীর রূঢ়তায় সবাই অবাক হয়।

ব্যথিত চিত্তে বেরিয়ে যায় নগাই। ওর চোখে এখন আর সেই স্বভাব সুলভ বিস্ময় নেই। ওর বিষন্ন চোখের প্রান্তে দু ফোঁটা জল টল টল করে।

কাজলী ও ভাবে, কি প্রয়োজন ছিল এতখানি রূঢ় হবার।

জিনীষ পত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে কাজলী মাতব্বরের কথাগুলো চিন্তা করে। যার ইজ্জতের দাম আছে তার ইজ্জত ঠিকই থাকে—অর্থাৎ নাচনীর কোন ইজ্জত নেই। নাচনী সর্বজন উপভোগ্যা। নাচনী শতবল্লভা। মনটা ব্যথায় টনটন্ করে ওঠে কাজলীর। এরা ভাবে নাচনী বুঝি মেয়ে মানুষ নয়। নাচনী একটা আলাদা জাত আলাদা সম্প্রদায়। নাচনী মানেই দেহ বিলাসিনী জনপদ বধু। হায়রে কপাল! কাজলীর বুকের ব্যাথাটা চোখের কোণে অশ্রু হয়ে টলমল করে।

সন্ধ্যের আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। যেন একটা চৈতালী ঘুর্ণী সমস্ত পৃথিবীটাকে এলো মেলো করে দিয়েছে। মহুয়া গাছের তলায় জড় হয়ে আছে একরাশ শুকনো মহুয়ার পাতা। মহুয়ার স্নেহলালিত একটা বিচ্ছিন্ন অতসী লতা আটকে আছে আমলকীর ডালে। এ যেন দামাল ছেলের অত্যাচারে ঘরের জিনিষ পত্র অগোছাল হয়ে গেছে! এমনি একটা অদৃশ্য ঘুর্ণি হাওয়া যেন পান্নুর মনটাকেও তচনছ করে দিয়েছে আজ। তাই ভিজে মাটির উপরে কম্বলটা বিছিয়ে আপাদ মস্তক চাদর গায়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছিল পান্নু। তখনও বাতাস বইছিল। পাতায় পাতায় তার শিহরণ। পান্নুর মনের মাঝে শুধু একটি মুখের ইশারা, একটি তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ের প্রতীক্ষা, একটি স্ফুটোনোন্মুখ প্রেমের বেদনা। কিন্তু প্রেমের পরিণতিতে বোধ হয় আনন্দ নেই। যে প্রেম কিছুই দিল না, যার ভার বইতে হ'ল সারা জীবন, সেই ভাঙ্গা প্রেমের স্মৃতিচারনেও যন্ত্রনার আনন্দ। মাঝে মাঝে ভাবে পান্নু, কেন এল সে এখানে? কি প্রয়োজনে? বেশ তো স্থান থেকে

স্থানান্তরে নানা পরিচয়ে নানান্ জিবীকায় পর্য্যটন করে বেড়াচ্ছিল, কি প্রয়োজন ছিল সাধ ক'রে এই যন্ত্রনার মাঝে জড়িয়ে পড়বার। পরক্ষণই ওর মনের মাঝে ভেসে ওঠে পদ্মর ছল ছল মুখ আর সব আবছা হয়ে যায়। সব কঠিন ইচ্ছার অঙ্গীকার পিচ্ছিল হ'য়ে যায়, সব পথই হারিয়ে যায় একটা বেদনার অরণ্যে। একটা কথা ভেবে পান্নুর ভারি আনন্দ হয়। পদ্ম এখনও অনুঢ়া। সেদিনের ষোড়শী পদ্ম আজও যৌবনের বৃন্তে আঠাশটি বসন্তের মঞ্জরী নিয়ে তেমনী সুঠাম তেমনী ঋজু। আজও সীঁমন্তে সে ধারণ করেনি অন্য কারো দীর্ঘ পরমায়ুর স্বাক্ষর। কিন্তু কার প্রতিক্ষায় এই তপস্যা? একটা আশার আনন্দ পান্নুর মনের মাঝে গুণ গুণ করে। কিন্তু হায়রে যুবতীর মন, যেন কালিন্দী সায়রের অতল জল। আজও পদ্ম পান্নুর কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু পানু জানে না পদ্ম কার পথ চেয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন গুলি নিসঙ্গে অতিবাহিত করেছে। সে কি পানু? তাহলে তো পান্নু জীবন স্বর্গের একছত্র সম্রাট। কিন্তু পানু জানে না কি সঞ্চয় পদ্মর হৃদয়ের মণি কোঠায়। উপছে পড়া প্রেমের অমৃতধারা অথবা রিক্ততার সকরুণ মনি মঞ্জুষা।

কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল।

'কে?' চাদরের ভেতর থেকেই জিগ্যেস করে পানু।

'আমি পদ্ম।' পদ্মর গলার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ওর কাঁচের চুড়ী গুলোও রিনি ঝিনি বেজে উঠে।

পান্নু ধড়মড়ীয়ে উঠে বসে। মাথার উপর থেকে গামছা বাঁধা কানাউঁচু থালাটা নামাতে নামাতে পদ্ম বলে 'তুমার সিধা এনেছি সন্ন্যাসী।'

পান্নু হাসে। আর কতদিন আমাকে সিধা দিয়ে আটকায় রাখবে পদ্ম। ইবার আমাকে সিধা পথ দেখ্যায় দাও।

'আমি আটকাবার কে সন্নাসী। কিন্তুক পথে কি তুমার কাঁটা পড়্যেছে?'

'পথের মাঝে কাঁটা থাকল্যেও পাশ কেট্যে পথ চলা যায়

পদ্ম' পান্নু জবাব দেয় 'কিন্তুক মনের মাঝে কাঁটা বিঁধে থাকলো ঘরেতেও রইতে লারি, পথেও চলতে লারি। তখন ধুলায় গড়াগাড়ি দিয়ে মনের জ্বালা শান্ত করি।' পদ্ম ফিক করে হেসে ফেলে। 'তুমার মনে অনেক জ্বালা বুঝি সন্ন্যসী ?'

'হঁ গো' পান্নু সকৌতুকে বলে 'শ্রীরাধার দশা হইছে আমার, অঙ্গজ্বলন।'

'ও বাবা, ই যে বড় 'সাঙ্গীন অসুখ সন্ন্যাসী।' পদ্ম আঁতকে ওঠার ভান করে। 'ওষুধ লাগাও। কুবরেজ দেখাও।'

'ওষুধে কিছু হবেক নাই গো' পান্নু বলে পদ্ম পাতায় চন্দন ঘষে অঙ্গে লেপন করতে হবেক।'

'বাপ গো। চিঁড়ার বাইশ ফের। পদ্ম ফুল যে মাঝ গাঙ্গে ফুটে সন্নাসি, তুলে আনবেক কে ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আশে পান্নুর বুক চিরে। 'ঠিকই বুলেছ পদ্ম' পান্নু বলে 'সি পদ্ম ফুলের 'বাস' আমি পাই। তাকে ছুঁতে পারি, কিন্তুক তুলে আনতে পারি নাই। একে মাঝ গাঙ্গের ফুল, তায় চারপাশে কাঁটা।'

'তবে থাক' পদ্ম যেন সন্ত্রস্ত হয় 'তবে যেও না সন্নাসী। একে তুমার অঙ্গজ্বলনের রোগ তায় যদি পদ্ম কাঁটা গায়ে বিঁধে তবে হিতে বিপরীত হবেক।'

পান্নু জবাব দেয় না। পদ্ম কি আজও সেই দুজ্ঞেয়তার নির্মোক খসাবে না। আজও কি ও আকাশের শুকতারটির মতই সদূর।

'এ্যাই দেখ, পাসর‍্যে গেছলাম সন্ন্যাসী, মাতব্বর বল্লেন তুমার আর ই গাছতলায় থাকা চলবেক নাই। বিষ্টি বাদলের দিন। ঝড় জল আছেন, লতাপাতা আছেন। নগাই-এর ঘরে তুমার থাকার ব্যবস্থা হইছে।'

'তাই নাকি ?' সন্ন্যাসী ভুরু তুলে শুধোয় 'কিন্তুক আমার কুন অসুবিধা নাই। বেশ আছি ইখেনে।'

'সিটি তুমি মাতব্বরকে বলবে। তুমার কষ্ট তুমার গায়ে লাগে

না সন্ন্যাসী। অন্যের গায়ে লাগলে সিটি তুমি 'অটক' করবে কি করে?'

অন্যের? তাহ'লে কি পদ্মর? পদ্মই কি সন্ন্যাসীর এই অসুবিধার কথা ভেবে ওর জন্য অন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে? পান্নুর হৃদয়ে আশার আলো ঝিলিক হেনে যায়।

'আমার লেগ্যে অন্যকার কষ্ট হবেক পদ্ম? আমার আর কে আছে? আমি পথের মানুষ।'

পদ্ম পান্নুর ইঙ্গিতের পাস দিয়েও যায় না। পান্নুর জিনিস-পত্র-গুলো গোছাতে গোছাতে বলে 'কে কার লেগ্যে ভাবে তা কি আমরা জানি সন্নাসী। তুমার লেগ্যে গাঁয়ের পঞ্চজনার কি চিন্তার অন্ত আছে? পান্নুর পোঁটলা পুঁটলীগুলো হাতে নেয় পদ্ম। পান্নু শুধু ওর লাঠিটা আর কমণ্ডলুটা নেয়। তারপর দুজনে কুলীর দিকে হাঁটে।

হঠাৎ একসময় পান্নু শুধোয় "আচ্ছা পদ্ম গাঁয়ের পঞ্চজনার আমার লেগ্যে অত ভাবনা কিসের গো?

'বোধ হয় তুমি পথের মানুষ তাই।'

'শুধু কি তাই?'

'আর কি? ঘরের মানুষের লেগ্যে ভাবনা থাকে না সন্নাসি। যারা ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে চল্যে গেছে তাদের লেগ্যেই যত ভাবনা।'

পান্নু আবার শুধোয় 'আর কিছু না?'

পদ্ম চোখ নত করে বলে 'পথ দিয়ে দুবেলা কত মানুষই ত' হেঁটে যায় সন্নাসী, সবাইকে কি মনে রাখি। যাকে ভালবাসি, তাকেই মনে রাখি। গাঁয়ের পঞ্চজনা তুমাকে ভালবেস্যেছে, তাই ত' এত দরদ।'

খানিকক্ষণ নীরবে পথ হাঁটে। তারপর এক সময় অন্যমস্ক ভাবে পান্নু বলে 'অনেক দিন পর ঘরের আরাম পাব পদ্ম। সেই যেদিন……'

পদ্ম একবার পান্নুর দিকে চোখ তুলে তাকায় তারপর ঈষৎ উষ্মর সঙ্গে বলে 'উসব কথা এখন থাক সন্নাসী।'

পানু সহসা মাঝপথে থমকে যায়। না, পদ্ম আজও তেমনী দুর্জ্জেয়।

খানিক পরেই আবার সেই উজ্জল ভাবটা ফিরিয়ে এনে পদ্ম বলে 'উখেনে তুমার দিন ভাল কাটবেক সন্নাসী।' পানু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

'একটি লতুন পড়শী পাবে তুমি। লতুন কুটুম।' পানু বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। কত নতুন মানুষের সঙ্গেই তো পরিচয় হয়, কেই বা তার হিসাব রাখে। কিন্তু পুরোন পরিচয় যদি নতুনের চেয়েও ফিকে হয় তাহ'লে সে আক্ষেপ রাখবে কোথায়। দূর থেকে ঝুমুরের গুনগুনিয়ে ওঠা সুর শোনা যায়। ভারী মিঠে গলা তো।

'কে গাইছে?' পানু শুধোয়।

'কাজলী লাচুনী।'

পানু ভুরু কোঁচকায়। 'বড় নিলাজ'

পদ্ম খিল খিল করে হেসে ওঠে। 'ও মা, নত্তকী কি ঘরের বৌ-এর মতন লজ্জাবতী হবেক। কথায় বলে আসরের নত্তকী, বনের পায়রা আর পথের সন্নাসী ঘর বাঁধতে পারে না।'

পানু স্মিত হাসি হেসে বলে 'শেষেরটি তুমি বুলছ।'

পদ্ম লজ্জা পায় না। 'তাহল্যেও কথাটি ত' আর মিছা লয়।'

পানু কি যেন জবাব দিতে যাচ্ছিল। সহসা দোর গোড়ায় কাজলীর গলা শুনে থমকে যায়।

'ও মা সন্নাসী যে। পেন্নাম হই।' কাজলী পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

'কল্যাণ হোক।' পানু বলে।

কাজলী হেসে উত্তর দেয় 'নত্তকীর কল্যাণ অকল্যাণ কি সন্নাসী। বরং আশীর্ব্বাদ কর যেন তাড়াতাড়ি দক্ষিণ দুয়ারের শমন আসে।'

'তা উসব কথা থাক।' পানু বলে। তুমি যে সিদিন হঠাৎ কর‍্যে উধাও হয়্যে গেলে বকুল লগরের হাট থেকে। আমরা ভেবে মরি কুথায় গেল মানুষটা। শেষে চন্দনপুরের হাটুরেদের কাছে

শুনলম কে একজন সন্ন্যাসী নাকি তিয়াসিতে মোকাম নিয়েছে। তখন মনের উদ্বেগটি গেল।' কাজলী প্রসঙ্গ বদলায়।

"তুমি ভুল শুনেছ লতুকি, আমি বাসা বাঁধি নাই। পথের মাঝে গেছি। ভাসন্ত নৌকা কি নদীর চড়ায় আটকায় না? বাধাটি সরে গেলেই চল্যে যাব এখন।"

'তা ভালো' কাজলী হাত দুটো মাথার উপরে তাড়াতাড়ি সমস্ত শরীরটা দুলিয়ে হাই তোলে। ভঙ্গীটা বিশ্রী লাগলো পদ্মর কাছে। পদ্ম গামছা দিয়ে মুখের খানিকটা অংশ ঢেকে রাখে।

'উ টী কে গো?' কাজলী শুধোয়।

'ওমা তাও জানো না' সন্নাসী অবাক হয়। 'মাতব্বরের বিটি গো। পদ্ম।' পদ্মাবতী।

'জল পদ্ম না স্থল পদ্ম বুঝতে লারছি যে হে? পদ্মাবতী না লজ্জাবতী' কাজলী বলে। পদ্ম ঝটিতে মুখ থেকে গামছাটি সরিয়ে বলে 'কেনে গো লতুকী, পুরুষদের অন্তর চেরা নজর তুমাদের, গামছাতেই আটকায় গেল?' পদ্মর কথায় ছুরীর শান।

বিস্ময়ে চমকিত হয় কাজলী 'ঝাঁপি ঢাকা লক্ষ্মির পয়সার মতন, শানের আড়ালে মুখ ঢেকে দাঁড়াই আছ, বুঝব কি করে বল।'

পদ্ম গামছাটা আড়াআড়ি ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখে। ওর স্পর্ধিত যৌবন যেন আর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অস্ত সূর্য্যের লালীমা পদ্মর রাগলজ্জা মেশান মুখটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। ওর দেহের রেখায় যেন সূর্যের সেই লালীমা খেলা করে বেড়ায়। হঠাৎ উচ্ছসিত হয়ে ওঠে কাজলী 'আহা মরি মরি, কি বাহার,' কাজলী ঝুমুরের একটা কলি গুণ গুণ করে গেয়ে ওঠে—

'শাল গাছে শালের ফুল
কদম গাছে কলীরে,
(আর) বঁধুর কাঁধে লাল গামছা
চটক দেখ্যে মরি রে।'

রাগে লজ্জায় অপমানে পদ্ম যেন জ্বলে ওঠে। পাঙ্গুর পৌটলাটি

ঘরের মধ্যে ধপাস করে নামিয়ে দিয়ে সিধের থালাটা গামছায় বেঁধে যাবার উদ্যোগ করে। কাজলী সামনে এসে দাঁড়ায়। পদ্মব চিবুক ধরে বলে 'রাই এর রাগ হ'ল নাকি ?'

পদ্ম জবাব দেয় না। যাবার জন্য পা বাড়ায়। দুহাত দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়ায় কাজলী। 'সখী যেতে তো দিব না।'

'দুয়ারটী ছাড় লত্তকী, ঘর যাই।'

'তুমি আমার উপর রাগ করে চল্যে গেলে আমি যে ঘরে রইতে লারব পদ্ম।'

'আহা, দরদ দেখ্যে মরি' পদ্ম একটু রূঢ় কণ্ঠেই বলে 'পথ ছাড় আমাকে যেতে দাও।'

'পায়ে ধরে রাখব তুমায়,
যেতে তো দিব না'

আবার গুণ গুণিয়ে ওঠে কাজলী।

'অলগণ অসই' পদ্ম জ্বলে ওঠে তুমি 'আসরের লত্তকী, আমি গিরস্থ ঘরের ঝি, তুমার সঙ্গে আমার তামাশা করলেই ত চলবেক নাই।'

কাজলী দরজা থেকে হাত সরিয়ে নেয়। ওর মুখটা যেন মুহূর্ত্তের জন্য রক্তিম হ'য়ে ওঠে। ব্যথিত কণ্ঠে কাজলী বলে 'পদ্ম, মেইয়া মানুষের দুঃখু পুরুষে বুঝে না। কিন্তুক তুমি ত বুঝ। আমার চোখের দিকে তাল্যে তুমি বল, আমি কি শুধু নিলাজ লত্তকী, আমার বুকে কি মেইয়া মানুষের হেদয় নাই ?' একটা বেদনার আভাসে কাজলীর ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে। পাণ্ডুর মুখটা যেন ব্যথায় ছলছল করে।

পদ্ম কাজলীর দিকে তাকায়। কাজলীর চোখের কোণে দু ফোঁটা অশ্রু টলটল করে। পদ্মর ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। 'লত্তকী, কত রঙ্গই জানো, খনেক হাসি খনেক কান্না, কোনটী তুমার সত্যি ?'

'ঠিকই বুলেছ পদ্ম। আমি যে লত্তকী। হাজার মানুষকে খুশি করাই আমার কাজ। কেউ খুশি হয় হাসলে কেউ খুশি হয় কাঁদলে,

আমার হাসি ও কান্না দুই মিছা। আমি নিজেই যে একটা মস্ত বড় মিছা।'

পদ্ম আর কথা না বাড়িয়ে পাশ কাটীয়ে চ'লে যাচ্ছিল। ওর হাত ধরে কাজলী। বলে 'বল ভাই রাগ করল্যে ?'

ওমা এ কেমন মেয়ে গো, পদ্মর হাসি পায়। পদ্মই যা মুখে এসেছে তাই বলেছে কাজলীকে আর উল্টো কাজলীই শুধোচ্ছে 'রাগ করলে ভাই।'

পদ্মর রাগ নিমেষে জল হয়ে যায়। আগের মতই গম্ভীর গলায় পদ্ম বলে 'রঙ্গ রাখ, হাত ছাড় যেত্যে দাও।'

'আগে বল রাগ কর নাই ?' কাজলী হাত ছাড়ে না কিছুতেই।

'আচ্ছা তাই হল্য' পদ্ম শেষ পর্য্যন্ত নিরূপায় হয়ে জবাব দেয়।

তবুও ছাড়ে না কাজলী। 'অমুন কলী পদ্মর মতন মুখটী করে বল্লে চলবেক নাই, ফুটন্ত পদ্মর মতন হাসি হাসি মুখে বলতে হবেক।'

পদ্ম এবার সত্যি সত্যি হেসে ফেলে। 'আচ্ছা গো আচ্ছা' পদ্ম বলে "তুমর উপর কি রাগ করে থাকা যায়।"

'এক লজরেই এত ?' কাজলীর চোখে দুষ্টুমির হাসি 'তুমিও তবে আমার পিরীতের জালে পড়ল্যে ভাই।'

'হবেক কে জান,' পদ্ম বল্লে 'উ বস্তুটী কেমন তা জানি নাই। তবে সুরুতে ভালবাসা হল্যে পরে দুঃখু পায়। কিন্তুক সুরুতে ঝগড়া হল্যে পরে ভালবাসাটী জমে ভাল। যেমুন তোমার সঙ্গে আমার।'

পানু স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে।

'তাহল্যে ইবার যাই ?' পদ্ম বলে।

কাজলী ওর সঙ্গে সঙ্গে দাওয়া পর্য্যন্ত আসে। হঠাৎ ভয় পাওয়া পশুর মত দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে নগাই। ভীত চকিত চাহনী ওর।

'তুমি ইখেনে কি করছ পদ্ম ঝাঁঝিয়ে ওঠে' আড়ি পেত্যে আমাদের কথা শুনছিলে ? লুক্যাই লুক্যাই লোকের কথা শুনতে লাজ লাগে না ?'

নগাই এর চোখ দুটো বেদনার্ত্ত। যেন বোধশক্তি হীন এক জোড়া গরুর চোখ।

'আমি তুমার লেগ্যে অমর শঙ্করের পাতা এনেছি নত্তকী।'

'কে বলেছিল আনতে ?'

'তুমি যে বলেছিলে—'

আবার ধমকে ওঠে কাজলী 'তুমাকে বলেছিলম ?'

'না, না মাতব্বরকে' সোজাসুজি কাজলীর দিকে তাকাতে পারে না নগাই। 'কুলি দিয়ে আসতে আসতে মনে হল্য উটি নিয়ে যাই। পায়ের ব্যথায় তুমি কষ্ট পেছ।' অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কথাগুলো বলে নগাই। নগাইএর সমস্ত শরীরে কুণ্ঠা। মনের কথাটা ও ভাল করে প্রকাশ করতে পারে না।

কাজলী হঠাৎ কেমন যেন নরম গলায় বলে 'কেনে আনবে তুমি ?'

সঙ্কোচের সঙ্গে জবাব দেয় নগাই 'আমার ভাল লাগে'

'কি ভাল লাগে'?

'যদি কারো কষ্ট দূর করতে পারি।'

কাজলীর মনটা ব্যথায় আর বেদনায় ভরে ওঠে। নগাইএর হাত থেকে পাতাগুলো নিয়ে ভেতরে রাখে। নাগাইএর বিষন্ন মুখে হাসি ফোটে। বিষন্ন চোখ দুটো ভরে ওঠে বিস্ময়ে। নত্তকী কত ভালো।

কাজলী ভাবে, অগ্নির প্রতি পতঙ্গের আকর্ষণ দুর্নিবার। আর তাতেই তার মৃত্যু। অগ্নি নিজের জ্বালায় নিজেই পুড়ে মরে না। কিন্তু কাজলী ? ও যে নিরন্তর নিজের মনের আগুনে পুড়ে মরছে ? আরোগ্য নেই উপশম নেই। অথচ আশ্চর্য্য এমন ওর জীবিকা যে প্রতিক্ষণেই ওর বিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করার জন্য আসে পুরুষ পতঙ্গের দল। আর কাজলী জানে এ ওদের নিতান্তই সাময়িক এক মোহ। নেশা। নেশা কোনদিন স্থায়ী হয় না। তাই কাজলী এদের নির্মম ভাবে ফিরিয়ে দেয়। নিষ্ঠুর ঘৃনায় আর অপরিসীম

অবহেলায়। কিন্তু পতঙ্গ সে তো পতঙ্গই? তার পুড়ে মরার আকাঙ্খা যে চিরন্তন।

মাত্র গতকালই তিয়াসির আসরে প্রথম নেচেছে কাজলী। আজ সকাল থেকে ওর নাম মুখে মুখে ফিরছে। এমন কি ওর গাওয়া ঝুমুরের দু একটা কলিও মাঝে মাঝে গাইছে নেশা গ্রস্তের মত। আজ সবাই কারই অপরের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম আলাপন কাজলীর নাচ আর কানু দাসের ঝুমুর। আঃ, চমৎকার নেচেছে। মনটা যেন আমেজে বুঁদ হয়ে আছে। আর কানুদাসের বলিহারী রসিকালী ঢং। আসর মাতিয়ে দেয়। মাতব্বর খুশি হয়। খুশি হবারই কথা। এ তো মাতব্বরেরই কৃতিত্ব। কাজলীকে এ গাঁয়ে আনার আত্মতৃপ্তিতে মশ-গুল মাতব্বর সকাল সকাল গ্রাম পরিভ্রমনে বার হয়। অনেকেই এক সঙ্গে দাঁতন করতে যাচ্ছে। যারা তারই মধ্যে বেশী কাজের মানুষ তারা বলদ গুলোর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে ক্ষেতের দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগে আয়েস করে চুটি টানছে। এখন দুপহর পর্য্যন্ত হাল ঠেলতে হবে। তবে অধিকাংশেরই চোখ থেকে এখনও ঘুমের রেশটা কাটেনি। তার সঙ্গে নেশার মত জড়িয়ে আছে কালকার নাচ ও গানের স্মৃতি। মনটা মাতাল হয়ে আছে। প্রথমেই বেজর সঙ্গে দেখা হয়। 'কি হে বেজ, কাল নাচ কেমন দেখল্যে হে?' মাতব্বর শুধোয়। যদিও উত্তরটা ওর জানা।

'আহা মুখে বলতে লারব হে। তবে মনটি ভর্য্যে গেছে কানায় কানায়।'

'বেশ বেশ' মাতব্বরও যথেষ্ট উচ্ছাসের সঙ্গে বলে 'তুমাদের মনটি ভরাবার লেগ্যেই তো আনা হে। তুমাদের সবাইকার ভাল লাগলেই ত আমার খাটুনীটি সাত্থক।'

অতঃপর নসীরাম। ওকে কিছু জিগ্যেস করতে হয় না। ওই নিজের থেকে সুরু করে। ওর কণ্ঠ প্রশংসায় অপ্লুত।' 'আহা ভুলতে লারছি হে মাতব্বর। ঝুমুরের কলিটি মনের মাঝে গুণ গুণ করছে। আহা! আর কিবা মাদলের বোল গুলি, "ধিতট, ধিতট

লখীতট, কুঞ্জবনে—এ।' এরা মোটামুটি বয়স্ক লোক। এদের প্রশস্তির একটা মূল্য আছে। নেহাৎ চোখের দোষে মনে ধরেনি। জোয়ানদের কাছে তো নাচনীর বয়স আর রং ঢংএরই দাম। নাচ গানের কোন মূল্য নেই। তাই তো মাতব্বর ওদের হ্যাঁ নার খুব বেশী দাম দেয় না।

কিন্তু একটু এগুতেই এদের পাল্লাতেই পড়তে হল মাতব্বরকে। একদল জোয়ান বয়সের ছেলে।

'কি হে, তুমাদের কি নেবেদন' মাতব্বর হাসি মুখে শুধোয়।

মাতব্বরকে এরা সবাই সমীহ করে। ভয়ও করে খানিকটা।

'একটা নেবেদন আছে মাতব্বরখুড়া। বলতে একটু লাজ লাগছ্যে।'

'বলে ফেল। বলে ফেল।' মাতব্বর বেশ সহজ সুরেই বলে।

এদের মধ্যে লখীন্দর ছেলেটি মোটামুটি চালাক আর কথা বার্তাও বেশ গুছিয়ে বলতে পারে। ওই এগিয়ে আসে এদের মুখপাত্র হয়ে।

'কালকে লাচটি বড় ভাল লেগেছেন ব' মাতব্বরখুড়া আমরা বলছিলম যি লাচটি আরও কদিন হোক।'

মাতব্বর মনে মনে শঙ্কিত হয়। আরও কদিন হতে তো আর অসুবিধা নেই। তবে জোয়ান ছোকরাদের চোখ। শেষ পর্য্যন্ত কি করতে কি হয়।

'না হে, ইসব লাচ টাচ দু একদিনের লেগ্যেই ভাল। বেশিদিন করলে লোকের মন চঞ্চল হবেক। ক্ষেত খামারের কাজ পড়্যে থাকবেক। গেরস্থর ক্ষেতি হবেক।'

ছেলেরা মুষড়ে পড়ে। 'বছরের তিনটাদিন বৈ লয়। এমন কিছু ক্ষেতি হবেক নাই মাতব্বর কাকা, তুমি এখন অনুমতি দিলিই সব হয়। আমরা গাঁয়ের আরও পাঁচজন মুরব্বীকে সুধাইছি হে। তারাও রাজী আছে কিন্তুক সরমে বলতে লারছে।'

মাতব্বর কৌতুক অনুভব করে। বয়স্কদেরও মনোভাব যে তাই এটা সে আন্দাজ করছে বেজ আর নসীরামের কথা শুনে। লজ্জায়

বলতে পারছেনা। এবং মনের একটা গোপন পর্দ্দা সরিয়ে মাতব্বর দেখল ওরও মত তাই। এবং পর্দাটা লজ্জার।

তবে মাতব্বর গ্রামের মালিক। সুতরাং উত্তরটাও নিতান্তই সরল ও সহজ হওয়াটা ঠিক নয়। কাজেই স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাতব্বর বলে, ঠিক আছে। তবে কুন গোলমাল হল্যে আমি তুমাদিগে চুষব ইটি জানাই দিলাম।'

ছেলেরা আনন্দে হুল্লোড় করতে করতে চলে যায়। এতক্ষণ পরে মাতব্বর শুধু নিজের মত করে চিন্তা করার অবকাশ পায়। কাজলীর নাচের তুলনা নেই। গলার স্বর যেন ভোর রাতের কোকিলের মত সুরেলা। নাচে ময়ূরকেও হার মানিয়ে দেয়। কিন্তু ওর চোখের ঠারে ছুরীর ধার থাকলেও কোথায় যেন একটা বিষাদ, একটা বেদনা লুকিয়ে আছে। যেটাকে ও গোপন করবার চেষ্টা করে অনবরত। যেটা বার বার অবাধ্য ইচ্ছার মত প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর আশ্চর্য্য, সব কিছু বাদ দিয়ে ওর এই হঠাৎ ফুটে ওঠা বিষণ্ণ দৃষ্টিটাই মাতব্বরের বেশী ভাল লাগে। এই দৃষ্টি মাতব্বরের অতি পরিচিত। অতি অন্তরঙ্গ। এমনি একটি দৃষ্টির কাছেই একদিন মাতব্বর তার সব কিছুই বাঁধা দিয়ে ছিল। আজ আবার ওর কথা মনে পড়ছে। বুকের সেই মিষ্টি ব্যথাটাও জেগে উঠছে মাঝে মাঝে। বিশেষ করে যখন সেই ভয়ঙ্কর রাতটার কথা মনে পড়ে যায়। সেই ভয়াবহ স্মৃতিটা মন থেকে মুছে ফেলতে চায়। কিন্তু ওর এত সন্তর্পন চেষ্টাসত্ত্বেও মাঝে মাঝে মনের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর চোখ রাঙ্গানীর মত জেগে ওঠে। কিন্তু কি অপরাধ ছিল ঈশ্বরীর? ঈশ্বরী তো নিজেকে দূরেই সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু উমাশশী পারেনি। আত্ম-হত্যার সেই কঠিন সংকল্পটাও কার্য্যকরী হয়ে ওঠেনি। কিন্তু গাঁয়ে কি ধুতরো বীজের অভাব ছিল? নাকি কালিন্দির সায়রে জলের অভাব ছিল? সেই অসতর্ক মূহুর্ত্তের প্রতিজ্ঞাটা পূর্ণ করবার ইচ্ছে যে না হ'য়েছিল তাও নয়। কিন্তু সে শুধু উমাশশীর বিয়ের রাতে। সমস্ত রাতই প্রায় কালিন্দীর পাড়ে বসে কাটিয়ে দিয়েছিল ঈশ্বরী।

কিন্তু কালিন্দীর কালো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহসও ঈশ্বরী সঞ্চয় করতে পারেনি। সমস্ত রাত ধরে উমাশশীর বিয়ের সানাই শুনেছিল ঈশ্বরী। মাঝে মাঝে সরব উলুধ্বনি। চন্দনপুরের ডোমরা সানাইটা বাজায় ভাল, এক সময়ে মনে হয় মনটা কেমন যেন গ্রাম-গঞ্জ-পাহাড়-জঙ্গল ছাড়িয়ে কোন সুদূরে চলে যায়, যার ঠিকানা কেউ জানে না। পরদিন সকালে মাতালের মত ঘরে ফিরেছিল। ঈশ্বরীর মনে হয়েছিল উমাশশীও যখন মরতে পারেনি আর কাজ কি একক আত্মহননে দুজনের দূরত্ব তো র'য়েই যাবে। বরং আরও দুস্তর হবে। দুজনে দুই জগতে বাস করবে আর তার মাঝখানে কোন সেতু নেই, সংযোগ নেই। বিয়ের ঠিক সাতদিন পরে উমাশশীর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল ঈশ্বরীর। ঈশ্বরী ওকে এড়িয়ে চলে আসছিল। কারণ ঘাট নির্জন। উমাশশীও সদ্য বিবাহিতা। আর ওদের অন্তরঙ্গতা নিয়ে গাঁয়ের নেপথ্যে অনেক কলগুঞ্জনই হয়েছিল। প্রাক বিবাহ যুগের এই দুর্বলতা হয়ত ক্ষমা ওরা করবে, কিন্তু আজকার এই সাক্ষাৎ যত নির্দোষই হোক না কেন, লোকে এর একটা মানে করবে। আর সে মানেটা অতি সহজ দুই আর দুই এর যোগফলের হিসেব। যাতে চার ছাড়া অন্য কোন সংখ্যাই করা যায় না। করলেও কেউ বিশ্বাস করবে না, সে যত সরলই হোক। যত নির্বোধই হোক। তাছাড়া হঠাৎ উমাশশীর কাছে কেমন যেন সংকোচ বোধ করছিল। উমাশশী আজ পরস্ত্রী। এইটাই বোধহয় সংকোচের কারণ। ঈশ্বরী চলেই আসছিল। সহসা পেতলের কলসিটা শব্দ করে মাটিতে নামালো উমাশশী। ওর হাতের চুড়ীগুলো ও প্রান্ত থেকে এ প্রান্ত পর্য্যন্ত সরে এল। একটা মিষ্টি শব্দ করে বেজে উঠল চুড়ীগুলো। বুঝল, এটি উমাশশীর নীরব আহ্বান। কিন্তু ঈশ্বরী তাও চ'লে আসছিল 'ঈশ্বরী! সহসা চাপা স্বরে ডাকল উমাশশী।'

'একবার শুনে যাও'

নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়াল। সোজাসুজি চোখ তুলে তাকাল উমাশশীর দিকে। ও:কে দেখতে ভারী ইচ্ছে করছিল। সিঁথির বেশ

খানিকটা অংশ সিঁন্দুরে রঞ্জিত। চোখে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি। এবং, সন্দেহ হ'ল ঈশ্বরীর, গালের ওপর একটা আবছা দাগ, ওটা কি শুকিয়ে যাওয়া চোখের জল?

'কি দেখছ' মৃদুস্বরে শুধোয় উমাশশী।

'তুকে'

ম্লান হেসে উমাশশী আবার সুধোয় 'কুন দিন কি দেখ নাই?'

কণ্ঠের উষ্মাটা গোপন করতে পারে না ঈশ্বরী।

'উ দেখা আর ই দেখা কি এক?'

'ইচ্ছা করল্যে তো সারা জেবন দেখতে পারতে। আর আমিও ত' তাই চেয়েছিলম।' উমাশশীর কণ্ঠ কাঁপা কাঁপা।

ঈশ্বরী ঈষৎ সংকুচিত হয়। বাস্তবিক। ঈশ্বরীরই সাহসের অভাব। নইলে উমাশশীকে পরস্ত্রী হিসেবে দেখতে হ'ত না তাকে। তখন ঈশ্বরীর আরও মনে হয়েছিল ভালবাসার ব্যাপারে মেয়েরা অনেক বেশী দুঃসাহসী অনেক বেপরোয়া; আর ঝুঁকিটাও মেয়েরাই বেশী নিতে পারে, এত সামাজিক বাধা সত্ত্বেও। পরে, মাতব্বরের দুরুহ কর্ত্তব্য সাধনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় প্রত্যয় হ'য়েছিল, সব ক্ষেত্রে তা নয়। দুঃসাহস কখনও নারীর। সেটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। আরও পরে সব হিসেব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, ভালবাসার নিয়ম কানুন ঠিক বাঁধা ধরা হিসেবে ধারণা করা যায় না।

'আমাকে মাফ কর তু। আমি মিথ্যাবাদী ঠগ। আমি তুকে ঠকাইছি। আমি লিজেকেও ঠকাইছি উমাশশী। আমি দুজনারই অন্তর লিরন দিনের মাঠের মতন সুকনা লিবন্ন করো্যে দিয়েছি। কিন্তুক আমি কি লিয়ে বাঁচব উমাশশী?'

এর উত্তর উমাশশীর জানা ছিল না। সময় অল্প। মনের কথা অনেক বেশী। কি যেন একটা ছল করে এসেছিল উমাশশী। কলসিটা ভরে নিয়ে সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করে উমাশশী।

'যার সিন্দুরই আমার সিঁথায় থাক, আমি তুমারই। আমি

তুমাকেই ভালবেস্যেছি। একটি অন্তর তুজনকে দিতে পারি না। আমি তুমার। চেরকাল তুমার।'

কথা এখানেই শেষ হয়েছিল। আত্মহত্যার কথাটা তুজনেই ভুলে গিয়েছিল সেই সময়। ঈশ্বরীর মনে হয়েছিল ওরা বাঁচতে চায়। সেই বাঁচা ও বাঁচানোর তাগিদে অনেক কৌশল ও চাতুরীতে উমাশশীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতাটা জীইয়ে রেখেছিল। সেই অন্তরঙ্গতা উমাশশীর জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপর ঈশ্বরীও বিয়ে করেছিল। উমাশশী এখন ঈশ্বরীর একটি অপরিহার্য্য অভ্যাসের নাম। কিন্তু এর মাঝে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটা যেন একটা তুঃসহ স্মৃতির স্বপ্ন হয়ে ওঠে। তখন একমাত্র ভরসা লায়াগুনীন আর সব্বজ্বালাহরা উগ্র মদ।

একদিনের মধ্যেই কাজলীর সঙ্গে এত ভাব হয়ে যাবে, পদ্ম ভাবতেও পারেনি। এটা অন্তরঙ্গতার সূচনা। কাজেই সধারণ বন্ধুত্বের চেয়ে অনেক গভীর। একবেলা দেখা না হলে মন আনচান করে। প্রথমটা কাজলীকে দেখে তেমন ভাল লাগেনি। বোধ হয় ওর জীবিকা আর জিবিকা সংক্রান্ত স্বভাবের একটা পুর্বাভাস অবগত থাকার জন্মই ওর প্রতি মনটা আগের থেকেই বিষিয়ে ছিল পদ্মর।

এখন আর কোন উন্মাদনাই নেই ওর মনে। এখন কাজলীকে দেখে আর জেনে ভারী মায়া হয় পদ্মর। কোথায় যেন একটা ব্যথা আছে কাজলীর। আর ব্যথাই সুরের উৎস। পদ্মর মনে হয় এই নৃত্যগীত এই মনোহারিনী লীলা বিলাসের উদ্দমতার মাঝে লুকিয়ে আছে একটা বিরাট ফাঁকি। আর সেই ফাঁকিটাকে সব সময় একটা ঝুটো আনন্দের আড়ালে ঢাকতে চায়: তাই কাজলী এত চটুল। এত উচ্ছল। রাধার কৃষ্ণহীন জীবনের শুন্মতার গান গাইতে গাইতে কাজলীর চোখ দিয়ে জল পড়ে। সেই অশ্রু যেন ওর হৃদয়ের ব্যথার রুধির।

'আচ্ছা নত্তকী, পদ্ম শুধোয়, গান গাইতে গাইতে যে তুমার চইখে জল পড়ে সি টি তুমার সত্যি চইখের জল?'

'না গো, কাজলী বলে। আমরা লত্তকী। যখন খুশি হাসতে পারি, কাঁদতে পারি। খনেক খনেক রঙ্গ পাল্টাতে পারি আমরা।'

পদ্ম লজ্জিত হয়। 'তুমি যখন রাধার দুখের গান গাও লত্তকী, তখন মনে হয় সে গান তুমার নিজের দুখের কান্না।'

কাজলী উদাস চোখে দূরের পানে তাকিয়ে থাকে। মিথ্যে নয়। নিজের দুঃখগুলো জীবনের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কথা কইলেই চোখে জল আসে। তাই তো অত হাসি দিয়ে ও চেপে রাখে ওর চোখের জলকে।

আনমনে কাজলী জবাব দেয় 'না গো না। উসব লোকের মন ভুলাবার ছল। 'চতুরালী' না করলে লোকের মন পাই কই? কত জনের মনের মাঝে আমার আনাগোনা। আলকাপি না করলে মনের দুয়ারগুলি খুলবেক কেনে?'

এই জবাবে পদ্ম সন্তুষ্ট হয় না। 'না লওকী, সত্যি করে বল, কিসের দুঃখ তুমার, কিসের লেগ্যে তুমার চোখের জল ফুরায় না।

কাজলী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে। 'আমার আবার দুঃখু কিসের? আমার গান শুনে কত লোক চ'ইখের জল রুখতে লারে। কত লোক বেসামাল হয়ে যায় আমার লাচের তালে, চইখের ঠারে, কত দূর বিদেশে আমার নাম ডাক। আমার আবার দুঃখু কিসের?'

'আচ্ছা লওকী' পদ্ম আরও অন্তরঙ্গ হয়। 'সত্যি বল, এই যে দুর দুরান্তে তুমার নাম ডাক, এই যে লোকের মুখে মুখে তুমার যশ, ইসব কি তুমার ভাল লাগে? ইয়ারা তো কেউ তুমার আপনজন লয়? হেদয়ের ভালবাসা কি হাজার জনকে দেওয়া যায়? দেওয়া যায় হাজার জনের মাঝে একজনকে। যার মুখের একটি কথায় হাজার জনার হাজারটি কথাকেও হেলা করা যায়। এমন মনের মানুষের দেখা তুমি পাও নাই?'

না পাওয়ার যে বেদনা গুমরে মরছিল কাজলীর মনের মধ্যে সেটা যেন ওর হৃদয়কে শতধা-বিদীর্ণ করে মুক্ত স্রোতের মত বেরিয়ে এল। এইটাই তো কাজলীরও একমাত্র জিজ্ঞাসা। কেউ কোনদিন ভুলেও

জানতে চায়নি কি ওর ব্যথা। কেউ কোনদিন বলেনি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে আপন করে নিতে চাই। নীড় বাঁধতে চাই তোমাকে নিয়ে। কারণ কাজলী নর্ত্তকী, নারী নয়। ওর নারী সত্তাটা বাদ দিয়ে সবাই শকুনীর মত লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখেছে একটি মনোহারিনী, বারবিলাসিনী পণ্যা রমণীকে। সবাই তার পাপ দেহটাকেই দেখেছে। কিন্তু এর আড়ালে যে একটা অখণ্ড হৃদয় আছে, সে কথা কেউ কোনদিন জানতে চায়নি। হঠাৎ কাজলীর মনে হল হয়ত পদ্মও তারই সমব্যথী। হয়ত সেও তার রূপ-যৌবন-পরিপূর্ণ হৃদয়ের উপাচার নিয়ে দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা করেছে ওর মনের মানুষের জন্য। হয়ত সে আসেনি। হয়ত তার উপাচারও নষ্ট হয়েছে কালের কশাঘাতে। কাজলীর মনে হ'ল কোথায় যেন ওর সঙ্গে পদ্মর একটা মিল আছে। কিন্তু—কাজলীর বুকটা অসহ্য ব্যথায় আর্ত্তনাদ করে উঠল। পদ্ম গেরস্থ ঘরের ঝি আর কাজলী নর্ত্তকী।

কাজলী হঠাৎ উচ্ছসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল "আমি তুমাকে সব মিছে কথা বল্যেছি। সব মিছে গো, আমার সব মিছে। সত্যি শুধু চোখের জল, আমার পথের সাথী আমার মরণের মিতা।'

কাজলীর হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে পদ্ম বলে 'কেনে গো, কিসের দু:খু তুমার?'

'অশেষ দুঃখু আমার। যে দুঃখের কোন অন্ত নাই' কাজলী বলে। কালিন্দির ঘাট এখন নির্জন। শুধু পূবালী বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠা ঢেউগুলো ছলাৎ ছলাৎ করে ঘাটের পাথরে আছড়ে পড়ছে।

'বল ভাই আমি শুনি' পদ্ম বলে। দুটি রিক্তা নারীহৃদয়ে হঠাৎ যেন এক সুরে একটি বেদনার সঙ্গীত বেজে ওঠে। আর সে সুর দুটি হৃদয়ে একটা অদৃশ্য সেতু গ'ড়ে তোলে।

'আমার দুঃখু ভালবাসতে না পারার। আমি যে বিষকন্যা। কাজলী বলে' জীবনে আমি ভালবাসা পাই নাই। সি দুঃখুই আমাকে অহরহ চইখের জলে ভাসায়। গেরস্থের সংসারে আমার জন্ম হয়

নাই। আমার মা কুলের বউ ছিল। বেজাতের সঙ্গে ঘর ছেড়্যে বেরোই গেছল। লাচুনী হয়্যে ছিল। তার সঙ্গে বিয়া হয় নাই। কিন্তুক সেই আমার বাপ। জন্ম দিয়ে মা গেল মর্যে। আমি মায়ের গুণ পেয়েছিলাম। লাচতে পারতম, গাইতে পারতম। বাপটা আমার মাতাল ছিল। গেঁজেল ছিল। আমাকে গিধোড়ে বেচে দিলেক। সিখেনে দুঃখে, গঞ্জনায় সাতজন পুরুষের সঙ্গে ঘর করলাম। তারপর একদিন সইতে না পেরে রাইতের অন্ধকারে উখেন থেকে পালালম। কানু দাসের আগের লাচুনী রাইকিশোরী উয়াকে ছেড়ে গেছল। উয়ার হাতে পায়ে ধরলম। উ শিখাই পড়াই আমাকে লাচুনী করলেক। কিন্তুক আমার হেদয়ে রাবণের চিতা জ্বলছে, সিটি কি চইখের জলে লিভান যায়?' 'ভালবাসা নাই পেলে লওকী' পদ্ম কাজলীকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করে 'সুনাম ত' পেয়েছ। এত যশ কজন পায়?'

'সেই ত' আমার জ্বালা।' আঁচলের কোন দিয়ে চোখ মোছে কাজলী। 'বুকফাটা পিয়াস লিয়ে আমি লদীর পারে বস্যে আছি, কিন্তুক এক ফোঁটা জলও ছুঁতে লারছি, ই কি কম জ্বালা? ই জ্বালা যে অন্তরকে তুষের আগুনে পুড়ায় ভাই। আর সুনামের কথা বুলছ? লওকীর আবার সুনাম। যতদিন যৈবন ততদিন সুনাম তারপর কারো ঘরে দাসী বিত্তি। সি অবস্থা যেন শত্রুরও না হয়।' কাজলীর ব্যথা উথলে ওঠে। 'যখন গাঁয়ে থাকি তখন ভিন গাঁ থিকে কত 'রসিক' আসে। কেউ বলে সব্ব অঙ্গ গয়নায় মুড়্যে দিব। কেউ বলে সোনার নুপুর গড়্যাই দিব, কিন্তুক ভুলেও বলে না আমার ঘর চল, আমাকে রেঁধ্যে খাওয়াবে, আমার গরু বাছুর গুলিন গোছালে তুলবে, জমির ধান নিড়াবে। সন্ধ্যা বেলায় তুলসি তলায় প্রদীপ দিবে।' কাজলীর চোখ দুটো স্বপ্নে বিভোর। একটা কল্পনার সংসার ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গোহালে গরু। খামারে ধান। সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ হাতে সলজ্জিত বধূ বেশ···সবে মিলে একটি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত গৃহস্থের সংসার···

'কিন্তুক সে যে হবার লয়।' পদ্ম যেন কাজলীর স্বপ্নটাকে ভেঙ্গে দিয়েই বলে 'তুমার যা পেশা লত্তকী তাতে কারো বউ হওয়া চলে না।'

মিছে কথা' কাজলী ফুঁসে ওঠে 'কেনে চলে না? আমি লত্তকি বলে কি মেইয়া মানুষ লই? আমি কি পথের ধারের বেশ্যা? আগুন দেখে পতঙ্গ ছুটে আসে সি কি অগুনের দোষ? আর, কি পাপ আমি কর্যেছি? গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যার পাপের ও পেরাচিত্তির আছে, লত্তকী হওয়ার পাপের কি কুন পেরাচিত্তির নাই?"

এর জবাব পদ্ম দিতে পারে না। এ প্রশ্ন একা কাজলীর নয়, আরও অনেকের যারা ঝুটো পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এ প্রশ্ন পদ্মর কাছে নয়, এ প্রশ্ন সমাজের কাছে। ত্তনিয়ার কাছে। হঠাৎ একটা কথা জানবার জন্য কৌতুহলী হয় পদ্ম। 'আচ্ছা লত্তকী কানুদাস তুমার কে?' 'উ আমার খেয়া পারের নৌকা। গরুর সঙ্গে যেমুন বাগালের সম্পর্ক, উয়ার সঙ্গেও তাই। উ আমাকে খাওয়ায় পরায়, উয়ার খুঁটিতে আমি বাঁধা থাকি। উ যে আমার রসিক?'

'রসিক, সিটি আবার কিগো?' পদ্ম শুধোয়। 'ও মা, তাও জান না?' কাজলী বলে 'ফুল যেমুন ডালকে আশ্রয় কর্যে বেঁচে থাকে তেমনি লত্তকীর ডাল রসিক। ফুল ঝর্যে গেলে ডালের কুন দাম নাই, আর ডাল না থাকল্যে ফুলেরও আশ্রয় নাই। তেমনি লত্তকী না থাকল্যে রসিকের মূল্য নাই কানা কড়ি, আর রসিক না থাকল্যে লত্তকীর ও কুন কদর নাই।'

'তুমার রসিক যে বুড়া গো?' তামাশা করে পদ্ম বলে।

কাজলী ম্লান হেসে বলে 'বুড়া রসিকের কুন বায়না নাই। ভাগ বসায় শুধু রোজগারের উপর। কিন্তু ছোকরা রসিকদের সব কিছুতেই আধাআধি ভাগ। তাছাড়া কানুদাস বড় ভাল। উ ফুলের কদর বুঝে। তাই বাসটিতেই মনটি ভর্যে যায় উয়ার। ফুলটি হাতে নিয়ে কচলায় না।'

কাজলীর কথা পদ্ম কিছু বোঝে কিছু বোঝে না। অনেকদিন আগে রাধানগরের রথের মেলায় লাচুনী নাচ দেখেছিল। তার একটা আবছা স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। কিন্তু কাজলীর সঙ্গে তার কোন মিল খুঁজে পায় না পদ্ম। নাকে লাল নীল পাথর বসানো নথ। গলায় কেমিক্যালের হার। কানে ঝুমকো। পরনে ঘাঘরা আর কাঁচুলী। বুকটাকে টান করে একটা রঙ্গীন ওড়না এপাশ থেকে ওপাশ পর্য্যন্ত আড়াআড়ি বাঁধা। উচ্ছৃঙ্খল বিনিদ্র রজনী যাপনের কালিমা চোখের নীচে। চোখের পাতায় পুরু কাজল।

কাজলীকে যেন সেই শৃঙ্গার নটীর বেশে কল্পনা করতে ভাল লাগে না পদ্মর। যেন মনে হয় কাজলী কোন চাষী গৃহস্থের মুখরা বউ হলেই ভাল ছিল। সন্ধ্যে বেলায় কলসী কাঁখে জল আনতে যেত। নথ নেড়ে ঝগড়া করত পদ্মর সঙ্গে। কলসীর জল ছলকে পড়ত মাটিতে। পড়ন্ত আলোতে চিক্ চিক্ করত নথের পাথরগুলো।

'সাঁঝ হয়েছে। ঘর চল।'

সন্ধ্যার আকাশে দু'একটা তারা জ্বলছে মিট মিট করে। বুড়োবুড়ি পাহাড়ের নীচে ধোঁয়াটে অন্ধকার পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। শালই ডহরের প্রান্তে এক সারি মহিষ হেঁটে চলেছে গাঁয়ের দিকে। পিঠের উপর ঘুমুচ্ছে কোন দামাল ছেলে নিশ্চিন্ত আরামে। ধীর পদক্ষেপে জাবর কাটতে কাটতে দুলে দুলে হাঁটছে মহিষগুলো। পদ্ম জলে নামে। খানিকটা জল আঁজলা দিয়ে তুলে মাটির কলসীটা ভরে নেয় পদ্ম। ভিজে গামছা আর শাড়ীটা নিংড়ে নিয়ে গাঁয়ের দিকে হাঁটে দুজনে।

নির্জন পথ। একটু ত্রস্ত পায়ে হাঁটছিল কাজলী। আঁধারে আলো জ্বলছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে গ্যাস বাতির আলো ছড়িয়ে প'ড়ছে। আসরেও লোকজন জমতে সুরু করেছে। মাঝে মাঝে গোলমাল শোনা যাচ্ছে। ভিজে শাড়ী সারা গায়ে লেপটে গিয়েছিল। ফলে দ্রুত হাঁটতে পারছিল না কাজলী। একটা ঝুমুরের কলী গুনগুন করে গাইতে গাইতে আসছিল কাজলী

হঠাৎ কাজলীর মনে হয় কে যেন দ্রুত সঞ্চারী শৃগালের মত গাছের আড়ালে সরে গেল। কাজলী ভয় পায়। পথে লোকজন নেই। বসতিও এক রশি পথ দূরে। কাজলী ভিজে কাপড়টা শরীরের চারিদিকে জড়িয়ে আল্লা করে নেয়। সমস্ত শরীর সেঁটে গিয়ে যেন ওর উদ্ধত যৌবনকে আরও স্পষ্ট আরও লোভনীয় করে তুলেছে গাছের আড়ালে আবছা দেখা যায় এক জোড়া চোখ। কাজলী থমকে দাঁড়ায়। 'কে? কে উখেনে?' কাজলী ভয়ার্ত্ত স্বরে বলে 'জবাব দাও লয় ত' আমি চিল্লাব।'

সেই ছায়া শরীরটি বেরিয়ে আসে। চিনতে পেরে কাজলীর সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলে ওঠে। 'সরম নাই এতটুকু? মেইয়া মানুষের ঘাটের পথে দাঁড়াই থাকতে?'

ছায়া শরীর নিশ্চুপ। নির্ণিমেষে তাকিয়ে থাকে কাজলীর দিকে।

কাজলীর শরীরটা লজ্জায় কুঁকড়ে যায়। আবার অমন হ্যাঁ করে ভাল্যে আছ, সরম লাগছে নাই আমি যুবতী মেইয়্যা, ভিজ্যা শাড়ী পর্যে পথের ধার্যে দাঁড়াই আছি? তুমার কি মা বুন নাই?

ছায়া শরীর এবার কথা কয়। 'না গো লত্তকী গোসা ক'র না। আমার লজরটি'ই উ রকম। কিন্তুক কুন কু নাই। আমি তুমার দেহটির দিকে তাকাই নাই। পেত্যয় কর। আমি সব মেইয়্যাকেই মা বুনের মতনই দেখি।'

'তবে ইখেনে দাঁড়াই আছ কেনে?' কাজলী শুধোয়।

তুমি গোসা না করলে বলি।' সংকোচের সঙ্গে বলে ও। 'তুমি একা ঘাটের দিকে গেছ। যুবতী মেইয়া, গাঁয়ে ভাল মন্দ সব রকমের লোক আছে। যদি লত্তকী বল্যে—।'

'তুমি থাম' কাজলী বলে 'আমার বেপদ আপদের কথা তুমাকে ভাবতে হবে নাই। আমি 'অ্যাল্ ছেল্যা' যে কিছুই বুঝি নাই? তুমার নজরে কু আছে। তুমার ঘরে থেকেছি বুল্যে তুমি ভেব্যেছ আমি তুমার 'খাওয়াসিন'। কিন্তুক আমি সে লাচুনী লই। পয়সা খরচ করল্যে অনেক মেইয়্যা পাবে, মিছা আমার পিছুতে ঘুর না।'

কাজলী পাশ কাটিয়ে পার হয়ে যায়। হায়রে মেয়ে মানুষের মন। নগাই'এর চোখ দুটো লজ্জায় আর ধিক্কারে জ্বল জ্বল করে ওঠে।

মনে সুখ নেই শশীকমলের। গাঁয়ে সাতদিন ধরে উৎসব চলছে অথচ ওর ঘরে উটকো বিপদ। সেই ডাইনীতে ভর করার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে ওর বৌ। কখনও কাঁদে। কখনও মুখ ভার করে বসে থাকে। হাসি যেন ফুরিয়ে গেছে। ভাল লাগে না শশীকমলের। আজকাল গাঁজার আড্ডায় যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে। ক্বচিৎ কখনও সন্নাসীর আখড়ায় যায়। সেখানেও মনের ভাবটা হাল্কা হয় না। দূর ছাই। কিছুই ভাল লগে না শশীর। ফুলমতীও আশ্চর্য্য শান্ত হয়ে গেছে। মা বৌ এর ঝগড়াটাও বন্ধ হয়ে গেছে। একপক্ষ মুক আর একপক্ষ মুখর। ঝগড়া জমবে কি করে। তাছাড়া ফুলমতীও যেন কেমন পাল্টে গেছে। ওর মনেও এখন আর বৌ এর প্রতি কোন উষ্মা নেই। বরং খানিকটা মমত্বই প্রকাশ পায় ওর কথা বার্ত্তায়। ঘরের কাজকর্ম, গোয়াল তোলা সব একাই করে ফুলমতী। মিষ্টি কথায় বৌকে ভুলিয়ে এনে খাওয়ায়। চুলের জট ছাড়িয়ে দেয়।

শশী শুধু কড়িকাঠ গুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চুটী টানে। ধোঁয়ায় ঘরটা ভর্ত্তি হয়ে যায়। আর সেই ধোঁয়ার অস্পষ্টতায় শশীকমল যেন নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চায়।

এখন নিজেকে শশীকমল চিনতে পেরেছে। ওর মনের আয়নায় দেখতে পেয়েছে ওর আর একটা অনাবৃত মনের রূপ। শশীকমল ঠকিয়েছে কদমকে। নিজেকেও ঠকিয়েছে শশীকমল। কিন্তু এ ছাড়া আর কিই বা করতে পারত শশী কমল। কিই বা পারে ও? কদমকে ও ভালবাসে। গভীর ভাবে ভালবাসে। সে ভালবাসার বাঁধন ছাড়াতে গেলে একজনের অবলুপ্তি নিশ্চিত। কারণ ওরা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। অথচ এই দুর্নিবার ভালবাসার অন্তরালে দুটি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অনেক মাশুল দিতে হয়েছে। কিন্তু আর পারছে না শশী কমল। শশীকমল

আজ রিক্ত, নিঃস্ব, দেউলে। একটা মিথ্যের বুনিয়াদে সুখের স্বপ্ন তুলে রচনা করেছিল শশীকমল। আজ আর শশীকমল নিজেকে ঠকাতে চায় না। ঠকাতে চায় না কদমকেও। মাঝে মাঝে শশীর মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে ওঠে। ইচ্ছে হয় সব কিছু জানিয়ে দিতে। ইচ্ছে হয় চীৎকার করে বলতে কদম তুমি যা জানতে সব ভুল। সব মিথ্যে। এতদিন একটা মিথ্যে স্বপ্নের সোনালী জাল তোমার সামনে তুলে ধরেছিলাম। আজ সব মিথ্যে হয়ে গেছে। যে মিথ্যার বেসাতি তোমার কাছে ফিরি করেছি তার দাম আমার জানা নেই। চুটিটা দূরে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর টলতে টলতে কদমের কাছে এগিয়ে যায় শশী।

কদমের কোনদিকে খেয়াল নেই। পিছন ফিরে কি যেন করছে ও আনমনে। কিন্তু শশী দুর্বার। আর দ্বিধার কোন অবকাশ নেই। আস্তে আস্তে কদমের পাশে এসে বসে শশীকমল। কদম টের পায় না। অত্যন্ত সন্তর্পনে হাতটা রাখে ওর মাথায়।

চমকে পিছন ফিরে তাকায় কদম। শশীকমল ওর কাছে ঘন হয়ে বসে। 'বৌ' শশী আস্তে আস্তে বলে।

'কি ?'

'তুর ভারী দুঃখু, না,'

'কিসের'

'সন্তান না হওয়ার ?'

কদম জবাব দেয় না। শশীকমলের বুকে মাথাটা এলিয়ে দেয়। ওর চোখ দুটো জলে ভরে আসে।

'আমারই দোষ বৌ। সব আমার দোষ। শশী কমলের বুকে মৃদু আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে কদম বলে 'উ কথা বল না গো। তুমার কিসের দোষ। দোষ আমার অদৃষ্টের।'

ব'লতে গিয়েও থেমে যায় শশীকমল। ওর বুকের মাঝে কে যেন হাতুড়ী ঠুকছে। কি করে বলবে শশী। শশীর সব সাহস যেন ফুরিয়ে যায়। এ কথা শুনলে হয়ত—

'কিন্তুক তুর ই কষ্ট যে আমি দেখতে পারছি না বউ। তুর মুখের থিকে হাসিটি ফুর‍্যাই গেছে। লিশিদিন তুর চোখের জল যে আমি দেখতে লারি। তু একবার হাস বউ, লয়ত আগের মতন আমার উপরে রাগ কর‍্যে ঝগড়া কর—'.

শশীর কথা শেষ হবার আগেই ওর বৌ ডুকরে কেঁদে ওঠে 'আমি যে পারছি নাই।'

কান্না ফুলে ফুলে ওঠা ছন্দিত বুকের স্পন্দন শশী নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করে। একটা নিবিড় দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে ওঠে শশী কমল। যেন একটা পারাবতকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলার আগে হঠাৎ অন্তরটা এক অজানা মায়ায় ভরে উঠেছে। অকস্মাৎ কান্নার আবেগে থর থর করে কেঁপে ওঠল ওর শরীর···শশীর মনে হল কদম একটি ভীরু পারাবত। আর নিজেকে মনে হল এক শিকারী ব্যাধ। হঠাৎ কার অভিশাপে তার হাতের অস্ত্রটা নিথর হয়ে গেছে।

বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। বোধ হয় ফুলমতী। কাপড় মেলতে বাইরে এসেছে। অসীম ক্লান্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় কদম এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ওর আঁচল থেকে কি যেন একটা জিনিষ ঠক করে মাটীতে পড়ে। তাড়াতাড়ি তুলবার জন্য হাত বাড়ায় কদম কিন্তু তার আগেই শশীকমল নিজের হাতে তুলে নেয়।

'ইটা কি'···শশীকমল শুধোয়

তিয়াসির মেলায় কেনা একটা কাঠের পুতুল। হাত পা নেই। একটা কাঠের টুকরোতে হাত পায়ের আদল আর একটা মুখ। বড় বড় কাজল পরানো চোখ। গালে লাল রঙ্গের ছোঁয়া। দুটো নরম ঠোঁটের আভাস। দেখলেই বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে করে।

লজ্জায় জড়সড় হয়ে কদম বলে "উটা একটা পুতুল। দাও আমাকে দাও"

পুতুলটাকে নানান পোষাকে সাজিয়েছে কদম। নানা আভরনে অলঙ্কৃত করেছে একটা নিথর প্রাণের প্রতিমাকে।

শশীর চোখ দুটো আর বাধা মানে না। 'বউ তুকে সত্যি ছেল্যা

আমি দিতে পারলম না, পুতুল নিয়ে তু মনের দুঃখু ভুলতে রইলি। কিন্তুক আমার যে বুকের পাঁজর গুলিন ভেঙ্গে গেল…।' ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল শশীকমল। কাঠের পুতুলটাকে সন্তান স্নেহে বুকে চেপে ধরে শশী। 'আমিও ত' এই চেয়েছিলম বউ। কিন্তুক; কিন্তুক নিদয় ভগবান যে ব্রেক্ষকে অফল্যা কর্যে রেখ্যেছে।

শশীকমলের চোখ দিয়ে অশ্রু নামে অঝোর ধারায় আর ওর বুকে মুখ রেখে কমলের ঠোঁট দুটো আবেগে থরো থরো কাঁপে। দুটি নিঃস্ব হৃদয় হাহাকার করে ভুখা অপত্য স্নেহের আবেগে।

কাজলী সাজগোজ শেষ করে ঘুঙুরের তোড়া দুটো বাঁধছিল। সহসা পিছন থেকে কে যেন ওর চোখ দুটো টিপে ধরে। চমকে ওঠে কাজলী। সেটা অনুমান করেই খিল খিল করে হেসে উঠে হাতটা সরিয়ে নেয় পদ্ম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পদ্ম। হাজার হোক নর্ত্তকী তো। ঘরের বউ নয়। নর্ত্তকীর প্রতি যে কোন আচরণের বিধান আছে সমাজে। আজ অপরূপ সাজে নিজেকে সাজিয়েছে কাজলী। ওর চোখ ধাঁধানো রূপে নেশা লেগে যাবে মরদদের চোখে। ওর উলঙ্গ বক্ষ রক্তরেশম কাঁচুলীতে আবদ্ধ। সলমা চুমকির কাজ করা জরীদার একটা খাটো ঘাগরা। একখানা সুধু ওড়না। শরীরে আবৃত্ত অংশকে রহস্যময় করে তোলে। দৃষ্টিকে ছুরির মত শানিত করেছে এক আঁচড় কাজলের ইশারা। এলায়িত বেণীর প্রান্তে কৃষ্ণচুড়ার স্তবক। পৃথিবীর সব রঙ্গ যেন সমস্ত শরীরটার মধ্যে ধরে রেখেছে। পুরুষের চোখ কামনায় আতুর করে তোলার জন্য নানান আবরনে শরীরটাকে বেয়াড়া রকমের অনাবৃত্ত ও বেআব্রু করে তুলেছে কাজলী। যৌবনের দুর্নিবার হাতছানিতে যদি কোন নির্বোধ একটু প্রশ্রয় পাওয়ার জন্য এগিয়ে আসে, তাতে দোষই বা কোথায়?

'হায় হায়' পদ্ম দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে 'কে জানে আজ কত পতঙ্গের মরণ আছে।'

বন ময়ূরীর মত ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে কাজলী বলে 'কেনে?

তুমাদের গাঁয়ে এসে বেশি কিছু ত' করি নাই। এই ত' নর্ত্তকীর সাজ।'

'এই যদি সাজ হয়, তবে পুরুষরা তুমার পায়ে ছটপট করলো তুমার রোষ হওয়াটি সাজে না।'

'রোষ আমি করি নাই পদ্ম। যে পাখীর যে ডাক। যে দেবতার যে মন্তর। গাছে ফুল ফুটলে বাসটি সবাই পায়। ফুলটি সবাই পায় না। কিন্তুক আমার কাছে যারা আসে তারা বাসটি লিতে আসে না। আসে ফুলটি হাতে লিয়ে দুদিন কুলীতে টহল দিবার লেগে। আসল ফুলটি আলো করে আছে তার ঘরের বাগানে। বাইরের ফুলটি শুকাবে হাতে হাতে।'

'বুঝতে পারলাম তুমার কথাটি।' উটি আমার অন্তরের কথা আরেকদিন বুঝাই দিব। তুমার কাছে বুলব পদ্ম। সেই যে বলে না, 'ঘরের কাঠ ঘুণে খায়, কাঠ কুড়াতে বনকে যায়।' ইয়ারা সেই জাতের। পুরুষদের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা রয়েছে কাজলীর। পদ্ম তার কারণ জানে না। তবু ও ভালবাসার কাঙ্গাল। অথচ কাজলীর উগ্র মেজাজের জন্য কেউ ওর কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না। এমন কি আসরেও নাচনীর সঙ্গে সাধারণ রঙ্গরস গুলোতেও দর্শকরা ভয় পায়। তাই 'আসর উপরিটা' হয় না কাজলীর। নইলে 'আসর উপরি' টাই তো নর্ত্তকীর আসল রোজগার। বুকের উপরে নোটের মালা ঝোলে। শুধু সামান্য স্পর্শসুখ লাভের আকাঙ্খায়। কাজলী মনে দাগা পেয়েছে। কিন্তু পদ্মর এটা ভাল লাগে না। পুরুষ মাত্রই খারাপ এ ধারণা অর্থহীন। এটা ওর ব্যক্তিগত লাঞ্ছনার আক্ষেপ।

কাজলীর কথার জবাবে পদ্ম বলে 'সবাই লয় ভাই। সব পুরুষই কি খারাপ?'

চোখের কোণে কাজলের ইশারাটা আর একটু স্পষ্ট করতে করতে কাজলী বলে, 'আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারলে পদ্ম। সবাই ভাল হতে পারে না। সবাই মন্দও হতে পারে না।' তারপর একটু

থেমে পা'টা মাটিতে দুবার ঠুকে নুপুরের ধ্বনিটা পরীক্ষা করে কাজলী। তারপর বলে 'আচ্ছা পদ্ম, তুমি কাউকে ভালবেসেছ।'

প্রশ্নের আকস্মিকতায় ক্ষণিকের জন্যে বিহ্বল হয়ে যায় পদ্ম, তারপর বলে 'না'—

কাজলী আবার বুঝোয় 'কেনে?'

'মনের মানুষ খুঁজে পাই নাই বলে।'

'আমারও ভাই তাই দশা। কিন্তুক যারা আমার কাছে আসে, তারা ভালবাসার সওদা করতে আসে। কেউ বেসাতি করতে আসে না। যার কাছে দেখে শুনে যাচাই করে আমি খরিদ করতে পারি। তাই আমি কোন পুরুষকে ঘেঁষতে দি নাই কাছে। ইয়ারা সবাই একজাতের। মনের মানুষ যদি কুনদিন পাই, পথের ধারে কুড়াই পাব। হয়ত ধুলা-বালি খানিক লেগে থাকবে গায়ে। তাই কি আমি পরিষ্কার করে নেব। তার জন্যে আমার আক্ষেপ নাই।' এই মুহূর্তে কাজলীকে ওর মরমিয়া বলে মনে হয় পদ্মর। দুজনের বুকের মাঝে একই ব্যথার মেঘ। তবে তার রঙ্গ আলাদা। আর পদ্ম যা ভাবছিল তা নয়। কাজলী পুরুষ বিদ্বেষী নয়। বাইরে একটা পদ্ম—উগ্রতার খোলস চড়িয়ে ও ক্ষুব্ধ স্তাবকদের কাছ থেকে দূরে হারিয়ে গেছে। মনের মানুষ খুঁজে পায়নি কাজলী। আর পদ্মও একটু ঝুটো গাম্ভীর্য্যের নির্মোকে নিজের নিসঙ্গতাকে আড়াল করে রাখে। মনের মানুষ হারিয়ে গেছে পদ্মর। তাই পদ্মর মনে হ'ল, হৃদয়ে যে তারে বেজে ওঠে ব্যথার রাগিনী। সে দুটো ওর আর কাজলীর একই সুরে বাঁধা। ওদের দুজনকেই ভুল বুঝেছে মানুষ। ভুল বুঝে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। দুর্নাম রটিয়েছে। কেউ ওদের ব্যথা বুঝতে পারেনি; বুঝতে পারেনি। শুধু নিজেদের ব্যর্থতা দিয়ে নিরূপণ করেছে ওদের মূল্য, ওরা অহঙ্কারী। ওরা ছায়া-মানুষ।

কাজলীরও মনে হল অনেকদিন পরে। মনের মানুষ নয়, মনের মত একজন বন্ধু চেয়েছে। যে ওর দুঃখের সমভাগিনী। ওর জ্বালা যন্ত্রনার অংশীদার।

আসরে আলো জ্বলেছে। উঁকি মেরে দেখে কাজলী। এখুনি 'জানান' বাজনা বাজবে। অর্থাৎ এবার নর্ত্তকী আসবে।

'ইবার আমি উঠি ভাই।' ওঠার উদ্যোগ করে পদ্ম। কাজলীও মনে মনে তাই কামনা করছিল। কারণ 'জানান' বাজনা শেষ হ'লেই ওকে উঠতে হবে। 'তবুও কাজলী বলে, বস কেনে আর একটুকু।'

না গো, 'পদ্ম জবাব দেয়' 'আসরে আলো জ্বলেছে। তুমার পতঙ্গরা পিতিক্ষা করছে পুড়্যে মরবার লেগ্যে। তুমি দেরী করলে উহারা আসরেই মর্যে থাকবেক।'

কাজলী ক্ষীণ হাসি হেসে বলে 'অগ্নি কি পতঙ্গের মৃত্যু চায়। পতঙ্গেই ছুট্যে যায় মরতে। আগুন দেখল্যে ঝাঁপটে পড়াই যে উহাদের রীত।

ঘুনসুটী করে পদ্ম বলে 'অগ্নি যদি দাউ দাউ করে না জ্বলে তাহ'লেই ত' পতঙ্গের মঙ্গল? ধিকি ধিকি জ্বললেই ত' পারে।'

'না ভাই সিটি লারব। আর ধিকি ধিকি জ্বলতে লারব। ইবার জ্বলব ছাই হবার লেগ্যে। জ্বলার সময় ত' কারো কাজে এল্য নাই। ছাই হ'ল্যে যদি কেউ ভাঙ্গা কুলায় তুলে ফেলে দেয়, সেও আমার ভাগ্যি। একটু থেমে আবার বলে কাজলী 'আমি কারো মরন চাই না ভাই, আমি নিজেই বাঁচতে চাই।'

এবার যেন মনে মনে রাগ হয় পদ্মর। এত কাঙ্গাল পনা কিসের। নাই বা পেল পুরুষের ভালবাসা, তাই বলে এত ছোট হওয়ার কি আছে? পদ্ম নিজেকে এত দীন ভাবতে পারে না।

'রাগ কর না ভাই,' পদ্ম বলে 'তুমি এত কাঙ্গাল কেনে?'

কাজলী খিল খিল করে হেসে ওঠে। ওমা তাও জান না? কাঙ্গাল হয় কারা যার, কিছুই নাই। কিন্তুক আমি ত' সব পেয়েও ভিখারী। সব থেকেও যার কিছুই নাই সে যে কাঙ্গাল।'

'না ভাই, এত ছোট হওয়ার কথা ভাবতেও আমার লাজ লাগে।

পদ্মর কথায় রাগ করে না কাজলী। তিয়াসির এই সীমিত পরিধিতে পদ্ম জানে না সূর্য্য কতখানি আলো ছড়ায়। রাত্রে কতটা

জায়গা জুড়ে আঁধার ঘনায়। কিন্তু জবাব না দিয়ে পারে না কাজলী 'পুরুষের কাছে ছোট হওয়ার আনন্দ আছে। ওরা ব্রেক্ষ। আমরা লতা। ওরা মাটি থেকে রস টেনে নিজে বাঁচে আমাদিকে বাঁচায়। লতা গাছকে পাকে পাকে জড়াই ধরে ডালের উপর ডানা মেলে। কি সুন্দর দেখায়। কিন্তুক সবই সেই ব্রেক্ষর দান।' জানান বাজন শেষ হ'ল। রসিক গনেশ বন্দনা ধরেছে। এবার নর্ত্তকী কে যে আসরে যেতে হবে। দুজনেই এক সঙ্গে ওঠে। কাজলী ঝম ঝম নুপুর বাজিয়ে আসরের দিকে চলে যায়। পদ্ম মেয়েদের যেদিকে বসার জায়গা হয়েছে সেইদিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। কিন্তু এই আধো আলোছায়ায় মহুয়ার গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে? কৌতুহলী হয় পদ্ম।

কাছে গিয়ে আবাক হয় পদ্ম। সবাই আসরের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ওর চোখের সেই স্বভাবসিদ্ধ বিস্ময় যেন হারিয়ে গেছে একটা শান্ত বিষণ্ণতার আড়ালে। আকাশের নীলিমা যেমন হারিয়ে যায় শ্যামমেদুর মেঘের অন্তরালে।

'হই, নগাই দাদা, ইখেনে কি করছ।'

নগাই কেমন যেন হকচকিয়ে যায়। সহসা কথা জোগায় না ওর মুখে। একটু ইতঃস্তত: করে নগাই বলে 'আমি ইখেন থিকেই নাচটি দেখব বলে দাঁড়াই আছি।'

'কিন্তুক আসরে যাও নাই কেনে?'

চারিদিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে নগাই বলে 'লত্তকি আমাকে দেখতে লারে পদ্ম। ইয়ার লজরটিকে আমি বড় ডরাই। দাঁড়াতে লারি উহার লজরের সামনে। তাই ত' আসরে না যেয়্যে ইখেনে দাঁড়াই আছি।'

'তবে লাচ নয়। লাচনীকে দেখবার লেগেই দাড়াই আছ বল।'

নগাই লজ্জিত হয়। পদ্মর অনুমান অভ্রান্ত। নাচনীকে দেখবার পর থেকে কি যেন হয়েছে নগাইএর। তাকে দেখার জন্য মনটা

আঁনচান করে। সেকথা অকপটে স্বীকার করে নগাই। 'মিছা লয় পদ্ম' নগাই বলে 'আমি লাচনীকে দেখার লেগ্যেই দাঁড়াই আছি। সি বেলা ডুবার থিকে দাঁড়াই দাঁড়াই দেখ্যেছি, উ কেমুন কর‍্যে, সাজগুজ করল, কাজল পারল্য চোখে। কপালে টীপ দিল। আমার হেদয়টি কেমুন উথলী পাথালী করতে লাগল্য পদ্ম। আমি ঘর যেতে লারলম।'

নগাইকে উপদেশ দেওয়া নিরর্থক। একটা আশ্চর্য্য নিটোল মুক্তোর মত মন নিয়ে জন্মেছে নগাই। কিন্তু এ কি ঘুর্ণিপাকে নিজেকে ফেলল ও। এই ধিকি ধিকি তুষের আগুনে ও যে পুড়ে ছাই হয়ে যবে।

শান্ত কণ্ঠে পদ্ম বলে 'ঘর যাও নগাইদাদা। নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। আসরের নর্ত্তকী আর বনের পায়রা আপন হয় না। মিছা তুমার এই আকুলী বিকুলী। তার চেয়ে ঘর যাও। একটি বিয়া কর। সুখে থাকবে।'

'বলিস না। বলিস না পদ্ম। আমি কিছু চাই না নত্তকির কাছে। শুধু উহাকে ছু চোখ ভর‍্যে দেখতে চাই।' পরক্ষণেই নগাই কেমন যেন ভেঙ্গে পড়ে। কেনে যে এল্য নর্ত্তকি। আমার মনের সুখটি উ ছিনাই লিলেক।'

এমনি হয়। ভালবাসা হলে এমনি হয়। তখন মনে হয় যে মনের শান্তি, প্রাণের আরাম কে যেন ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু নগাইএর কি ভালবাসা হয়েছে ?

হায়রে, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধাবমান একটি নির্বোধ পতঙ্গ। পদ্ম আসরের দিকে এগোয়।

আসরে যাবার জন্য উদ্যোগ করছিল পানু। আজ আর রেহাই পাওয়া গেল না। মাতব্বর বার বার করে বলে গেছে। 'হেই সন্ন্যাসি, আজ তুমাকে যেত্যেই হবেক ব, এত বড় গাজনের পরবটি গেল এল্যে নাই তুমি। গাঁয়ের ছোকরা পুলিনের জিদে লাচটি দুদিন বাড়াত্যে হ'ল। কিন্তুক যাবে হে। তুমি গেলে আসরের ইজ্জত বেড়ে যাবেক। সন্ন্যাসি মানুষ তুমি।'

নাচ আমার ভাল লাগে না হে মাতব্বর।' পানু জবাব দিয়েছিল। নাচ গান ওর যথার্থই ভাল লাগে না। দীর্ঘদিন ধরে তীর্থ যাত্রীদের সাহচর্য্যে মনের উপাদানগুলো বাস্তবিকই অনেক বদলে গেছে। অবশ্য সন্ন্যাসির আবরণটা ওর ভুয়ো। নিতান্তই বাহ্যিক। কিন্তু মনের মধ্যে অনেকগুলো দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে আজ। সংসারীদের পক্ষে যে গুলো অপরিহার্য্য।

'উ কথা বল্লে চ'লবেক নাই হে। আজ শেষ দিনের লাচ। আজ তুমাকে যেত্যেই হবেক'।

পানু আর অনিচ্ছা প্রকাশ করে না। তেত ওষুধও তো লোকে খায়। 'বেশ ত' তুমরা অমুন বুলছ অত করে্য তখন খাব। নিশ্চয় খাব। তবে লাচুনীকে দুটো নাম গান করতে বলবে হে। ভগবানের নাম গান। উহাদের আবার বিষ, অমৃত দুয়োণ ব্যবসা। খদ্দের বুঝে ফিরি করে।'

এক গাল হেসে মাতব্বর বলে 'ঠিকই বুলেছ হে। ই কদিন ছোকরাদের মন রাখতে শুধু রঙ্গের গানই গেয়্যেছে লাচুনী। আজ সবাই নাম গান শুনুক। ব'লব। তুমার কথাটি লাচুনীকে বুলে রাখব।'

কাজেই আজ আর উপায় নেই। নাচনী আর কানুদাস অনেকক্ষণ আগেই আসরে চ'লে গেছে। ওর আবার সাজ গোজ আছে। সেই বৃষ্টি বাদলার পর থেকে পানুও নগাইএর একটা ঘরে বসবাস করছে। অন্যটায় কাজলী। নগাই কখনও লক্ষ্মীন্দরের দাওয়ায়, কখনও বা গোয়ালে। পানু ওর ঘরেই নগাইকে থাকতে বলেছিল। কিন্তু নগাই রাজী হয়নি। 'বাবা হে, আগুনের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে লারব। পুড়্যে মরব যে।' কিন্তু নগাইএর কি যেন হ'য়েছে। কি যেন হারিয়েছে ও। উদভ্রান্তের মত যেন তাই খুঁজে বেড়ায়। ওর চোখের সেই সারল্য সব কিছু দেখে শিশুর মত অবাক হ'য়ে যাওয়া, ওর সদা জাগ্রত সৌন্দর্য্য পিপাসা যেন হারিয়ে গেছে। হঠাৎ যেন জোয়ান হয়ে গেছে নগাই। হঠাৎ যেন ওর যৌবনের স্ব

অনুভূতিগুলো সচেতন হয়ে ওকে একটা দুর্বোধ্য ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতের মধ্যে সহসা নিজেকে খুঁজে পেয়ে ও যেন দিশেহারা হ'য়ে গেছে। পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

দাওয়ার কাছে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কান পাতে পানু। কিন্তু সে শব্দ আর স্পষ্টতর হ'ল না। নিশ্চয়ই কানুদাসকে বিরক্ত না করে দাওয়ায় বসে ওর জন্য প্রতীক্ষা করছে কেউ। পানু বাইরে বেরোয়।

'শশীকমল যে হে? এতদিন দেখি নাই? এত বড় পরবটি গেল? কুথায় ছিলে?'

'মনে সুখ ছিল নাই হে।' শশী কমল আনমনে ওর অবিন্যস্ত চুলগুলোতে আঙুল চালাতে চালাতে বলে।

'আহা হা। মনে কি আর সুখ আছে।' পানুর মনটা ভারী হয়ে ওঠে। অমন সুস্থ সচল ডবকা বউটা। রোগ নেই। বালাই নেই। অথচ মনের অশান্তিতে দিন দিন শুকিয়ে গেল।

হাজার গেঁজেল আর নেশা খোর লোক শশীকমল, বউকে ভালবাসত ও। শশীকমলের প্রতি একটু কৃতজ্ঞতা বোধও আছে। দশের মজলিশে যেদিন ওকে গাঁয়ের লোক লজ্জিত ক'রেছিল সেদিন শশীকমলই ওকে দুহাত দিয়ে আড়াল করেছিল। অবশ্য তার চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু, তবু সেদিন এই একটা লোকেই যুক্তি দিয়ে হৃদয় দিয়ে পানুকে বুঝাতে চেয়েছিল। বোঝাতে চেয়েছিল অপরকে। অপর পক্ষে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নেশার দাস হয়ে কেমন করে যে ভোঁতা হয়ে যায় শশীকমল তার জলন্ত নিদর্শন।

'নাচ দেখতে যাবে নাকি হে?' পানু সুধোয় শশীকমলকে।

'না হে। উসব আর ভাল লাগে নাই।' আশ্চর্য্য হয় পানু। 'সে কি হে, তুমার হল্য কি? আজকাল আখড়াতেও আস না। বলি নেশা টেশা কি অন্য জায়গায় করছ না কি হে?'

'না হে। নেশা করা আজকাল ছেড়্যে দিয়েছি।' কথাটা এত সহজে বলে শশীকমল যে পানুর পক্ষে বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

আর এতদিনের নেশা, তাও আর নেশার রাজা গঁজার নেশা, ও কিনা ছেড়ে দিয়ে কত অনায়াসে বল্ল নেশা করা ছেড়ে দিয়েছি? সুরটা একই। একই ভাবে ও ব'লতে পারে 'গুরুগুলিন গোহালে তুলে দিয়ে এলাম হে।'

'তুমি অবাক করল্যে হে। সত্যি নেশা করাটি ছেড়ে দিলে ন কি।'

'সত্যি নয় ত' কি মিছা?' শশীকমল বিরক্ত হয়। ঘরেই যদি সুখ না রইল ত' নেশা করে কি হবেক? আগে ঘরের সুখটি তারিয়ে আস্বাদ করবার লেগ্যে ত' নেশা করতাম। এখুনে আমার ঘরেও সুখ নাই বাইরেও সুখ নাই। পিদিমের আলোয় কি দিনকে দেখা যায় হে।

কথাটা অবশ্য মিথ্যে বলেনি শশীকমল। ওর অবস্থা স্বচ্ছল। তাছাড়া যথার্থই ওর ঘর ভরা সুখ ছিল। কিন্তু আজ ওর কি হয়েছে? ওর মায়ের সঙ্গে বউএর যে ঝগড়া সেটাও তো একপ্রকার আনন্দ। মিষ্টি মিষ্টি ব্যথার মত। অসুখের একমাত্র কারণ ওদের সন্তানহীনতা। তা ক'বরেজ দেখালেই ত' হয়? তার জন্য এত গুমরে থাকার কি আছে। পানুর ইচ্ছে হয় ব্যাপারটা খোলা খুলি আলোচনা করবার। এরা গাঁয়ের মানুষ। অজ্ঞতাবশতঃ একটা ভ্রান্ত ধারণা মনের মধ্যে পুষে রাখে। হয়ত এমনি কোন একটা কিছু অন্ধ বিশ্বাস শশীর মনে বাসা বেঁধেছে। কিন্তু পানু ওর দীর্ঘ বারো বছরের জীবনে পৃথিবীর অনেকটা জেনেছে। পানু জেনেছে পৃথিবী অনেক বড়। মানুষ অনেক শক্তিশালা।

'তুমার বিত্তান্তটি কি বল ত হে?' পানু শশীর পাশ ঘেষে বসে।

'বউটাকে আমি সুখ দিতে পারলম নাই।'

'ভুল। সুখ বাজারে কিনা যায় না। সুখ মনের একটি অবস্থার নাম। সুখ কুড়্যাই পাওয়া যায়, মাঠে, ঘাটে নদীর ধারে। পরখ কর‍্যে তুলে লিতে হয়। সুখের পাসেই দুখও থাকে। চেনা

যায় না। মানুষের লজর ভুল করে। তাই সুখের বদলে দুখ কুড়ায়।’

‘কিন্তুক সন্ন্যাসি, বউটার অসুখটি হয়েছে আমার দোষে। সে জ্বালায় পুড়্যে মরছি। আমার দিনে রাতে শান্তি নাই’। শশীকে কেমন যেন বিধ্বস্ত মনে হয়। মনে হয় ওর কথাগুলো যেন হৃদয়ের কোন অন্তস্থলে ব্যথার সমুদ্রে অবগাহন করে আসছে।

‘কিন্তুক ইয়ার কারণটি কি? কি সুখ তুমি দিয়েছ তুমার বউকে?’ পানু বুঝোয়।

‘আমি উয়াকে ঠকাইছি হে। আমি উয়ার সঙ্গে বঞ্চনা কর্যেছি। উয়ার সুখকে সুখ বল্যে মনে করি নাই। শুধু নিজকেই ভালবেসেছি হে। উয়াকে ভালবাসতে পারি নাই।’

‘কেন হে তুমাদের ত’ সুখের সংসার?’

‘সব মিছা সন্ন্যাসি। আমি আগে ভাবতাম বউকে আমি কত ভালবাসি। কিন্তুক আজ আমার মনটির ভিতর হাতড়াই খুঁজে দেখলাম, না। উয়াকে ভালবাসি নাই। নিজকে ভালবেসেছি। উয়াকে ঠকাইছি। শুধু ঠকাইছি নিজের সুখের জন্যি। কিছুই হল্য নাই হে সন্ন্যাসি। দুটি জেবন আমি লিজের হাতে নষ্ট করলাম।’ শশীকমল ভেঙ্গে পড়ে। শশীকমলের কথাগুলো কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয় পানুর কাছে।

‘তুমার কথাগুলি বুঝতে লারছি হে। দুখের কথা মানুষের কাছে খোলসা করে বলে মনটি খানিক হাল্কা হয়।’

‘সি জন্যি তুমার কাছে এসেছি সন্ন্যাসি। কথা আমি কাউকে বলি নাই। বলতে পারি নাই লজ্জায় আমার কলঙ্কের কথা। লাজের কথা। কিন্তুক তুমাকে সব বলব। সন্ন্যাসি, আমি পুরুষ হয়্যেও পুরুষ লই। কপাল দোষে নিশক্তি হয়েছি। উয়াকে মিছা কথা বলেছি যে আমার মানত আছে স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ। কিন্তুক আর কতদিন মিছে কথা বুলে কাটাব সন্ন্যাসি। আমি যে আর পারছি নাই। আমি ঠকাইছি আমার বউকে। আমি ঠকাইছি, সন্ন্যাসী।

আমার ই পাপের কুন পেরাচিত্তির নাই। শশীকমলের চোখ দুটো জলে ভরে আসে। কথাগুলো চলার আবেগে ওর গলাটা যেন থর থর করে কাঁপতে থাকে। সন্ন্যাসি বিস্ফারিত চোখে শশীর দিকে তাকিয়ে থাকে। 'তুমি, তুমি কি বুলছ হে শশীকমল?'

'বুলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে সন্ন্যাসি। কিন্তুক তবু বুলতে হবেক। পাপের বোঝা আমি আর বইতে পারছি না। কিন্তুক তুমি পেত্যয় কর সন্ন্যাসি, বিয়ার আগে আমি ই কথা জানতম নাই। জুয়ান বয়সে অনেক পাপ করে্যেছি। ই তারই পতিফল। কিন্তুক যিদিন জানতে পারলম সিদিন সময় আর নাই। আমি তবুও ভেবেছিলাম সন্ন্যাসি যে সব কথা বউকে বলি। কিন্তুক যতবার বলতে গেছি, কে যেন আমার টুঁটিটা চেপে ধরেছে। যেন কানে কানে বুলছে, বলিস না হতভাগা। অমন ফুলের মতন বউটা এত বড় ব্যথা সইতে লারবেক। আমি বুঝতে পারি নাহ সন্ন্যাসি। ই দুঃখ ভুলবার লেগ্যে আমি সব সময় নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতাম। ঘর যেতাম নাই। বউটা কত কান্নাকাটি করত। কত রাগ করত। কিন্তুক ঝগড়া করত নাই। বউটা আমাকে বড় ভালবাসে হে। সি জন্যি ত' আমার যত দুঃখু।'

পান্নুর মনে হ'ল শশীকমলের কাহিনী শুনে বাইরের উতলা বাতাসও স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। গাছের পাতাগুলোও নড়ছে না। আকাশের চাঁদ অকস্মাৎ বড় বেশী পাণ্ডুর হ'য়ে গেছে। বিলম্বিত প্রত্যাবর্ত্তনের উৎকণ্ঠায় নীড়ের পাখী যেন সহসা পথ হারিয়ে ফেলেছে। দীর্ঘদিন ধরে একটি পুরুষত্বহীন স্বামী ভালবাসার অভিনয় ক'রে চ'লেছে। আসল পাওনার ধার শুধু শূন্য। নকল জমায় ভাণ্ডার ভরে উঠছে।

'কিন্তুক, এতদিন উয়ারে কি বল্যে ভরসা দিয়েছ তুমি।'

'বউটাকে দিনেকের জন্যেও আমি ছুঁই নাই পর্য্যন্ত। বুলেছি মানত আছে। পরিবারকে স্পর্শ করা বারন। উ সরল মনে তাই পেত্যয় করেছে। কিন্তুক একটি ছেল্যার জন্যি উয়ার মনটি পাগল হ'য়্যে উঠেছে, উ কত সপুন দেখ্যেছে, সুখের সংসার হবেক।

ধর আঙ্গনাতে খেল ধূল করবেক। মায়ের মনটি গরবে ভর্যে উঠবেক। কিছুই হল্যে নাই সন্ন্যাসি। উয়ার আশাও পুরণ হল্য নাই। আমার মানতও শেষ হল্য নাই। অথচ মনের সঙ্গে লড়াই করে মেইয়্যাটি পাগল হয়্যে গেলেন হে। কি দুখেই আমি নিশিদিন জ্বলে মরছি।'

'কুবরেজ দেখাও নাই কেনে? অসুখও ত ভালও হয়্যে যায়?' সান্ত্বনা দেখায় বেশী করে এক অক্ষম স্বামিকে।

'সব অসুক ভাল হয় না হে। কুবরেজকে সি সময়েই দেখাইছিলম। ও বল্যেছে ও অসুকটি ভাল হবার লয়। বউকে আমি সত্যি কথাটি বুলতে পারি নাই। পাছে উয়ার সুখের সপুনটি ভেঙ্গ্যে যায়। উ আমাকে বড় ভালবাসে হে সন্ন্যাসি। কিন্তুক শুধু মনটি দিলেই ভালবাসা হয় না। ভালবাসাটিতে শরীলের খাদ মিশাল দিতে হয়। কিন্তুক আমার দেহটি যে বিকল।'

'তাই ত' হে পানু গম্ভীর কণ্ঠে বলে, কুথায় যেন এক টুকুন ভুল হয়্যে গেছে। কিন্তুক সি ভুল তুমার না ভগবানের।'

ভগবানের ভুল শুধরাবার উপায় নাই, কিন্তুক আমার ভুল শুধরাবার উপায় আছে। কদমের সুখআদি ফিরাই দিব সন্ন্যাসি। উয়াকে আমি মরতে দিব নাই। উ আর এক জনকে বিয়া করুক। আমি দশের মজলীশ ডেকে নিজে দাঁড়াই থেকে ছাড়বাড় করে দিব। কিন্তুক তবু উ বাঁচুক।

সেই ভয়াবহ দিনের কল্পনায় শিউরে ওঠে পানু। দশের মজলীশের অপমান, লাঞ্ছনা সব মাথা পেতে নিতে হবে। শুধু শশীকমলকেই নয় ওর বউকেই। আর সে বড় কলঙ্কের কথা হবে। পৌরুষহীনতা পুরুষের সবচেয়ে বড় লজ্জা। আর সেই লজ্জার বোঝা মাথায় নিয়ে সমস্ত গাঁয়ের লোকের কাছে স্ত্রীর সৌভাগ্য ভিক্ষা করতে হবে।

'না, না, ই কাজ তুমি কর না শশীকমল। দশের মজলীসের অপমান শুধু তুমাকে নয়, বউকেও সইতে হবেক। উ অপমান কি তুমার বউ সহিতে পারবেক?'

'না না সন্ন্যাসি। সি অপমান উ সইতে লারবেক। আমার মাথা নীচু হল্যে উহার বুকটি ফেটে যাবে। তবে আমি কি করব। বল্যে দাও সন্ন্যাসি আমি কি করব? ডুকরে কাঁদে শশীকমল। সহসা কোন উপায় খুঁজেই পায় না পানু। 'তুমি বরং তুমার বউকে সব বুলে 'সাঙ্গার' জন্যি রাজী করাও। দশের মজলীশে নাই বা বললে?'

'দশের মজলীস ছাড়া ছাড়বাড়ের হুকুম কে দিবেক। তাছাড়া আমার লাজের কথা বউকে আমি বুলতে লারব সন্ন্যাসি, সি দুঃখু কি উ সইতে পারবেক। উ যে আমাকে ভালবাসে সন্ন্যাসি। উয়াকে আমি সব সুখ ফিরাই দিব সন্ন্যাসী। উয়ার সব আশা পুরণ হবেক। আমি পথের নিশানা খুঁজে পেয়েছি সন্ন্যাসি, আমি যাই, আমি যাই সন্ন্যাসি…'পানু দাওয়া থেকে নেমে উন্মাদের মত ছুটতে থাকে।

'শশী, শুন্যে যাও, শশী…'

পানুর ডাক শশীর কানে যায় না। অন্ধকারের মাঝে শশীর মূর্তিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। পানুর মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু শশীকমল কি অকস্মাৎ পাগল হয়ে গেল?

তিয়াসি বাবার থানে আসর হয়েছে। গাজনের উৎসব শেষ হয়ে গেছে কয়েকদিন আগেই। গাঁয়ের লোকের উৎসাহে কাজলীর নাচ আরও কয়েকদিন বাড়াতে হয়েছে। অবশ্য আয়োজন সব কিছু ওরাই করেছে। মুষ্টিভিক্ষা করে কানুদাসের মজুরী তোলা, আসরের আলো বাতির ব্যবস্থা করা, প্রায় সব কিছুই। সালের ডাল পালা দিয়ে আসর। চারপাশে বকুলতলার থেকে ভাড়া করা চারটে গ্যাস বাতি। আসরের খুঁটি গুলোতে পদ্ম ফুল দিয়ে সাজানো। এক পাশে বাখারি দিয়ে ঘেরা মেয়েদের জায়গা। সামনের দিকে ছোট ছেলেরা। পিছনে বয়স্করা। ছোকরারা সব ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। নাচটা তো ওদেরও স্ফুর্ত্তির ব্যাপার। মাথায় পাগড়ী বেঁধে হাতে একটা লাঠি নিয়ে একজন লোক অসীম উৎসাহে গোলমাল থামাচ্ছে। 'এক শান্তি, শান্তি, হল্লা মত করো।' সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিয়াসির সব

কিছুই বকুল নগরের অন্ধ অনুস্মৃতি। বকুল নগরের কোন উৎসব অনুষ্ঠানে এই ভাবেই গোলমাল থামানো হয়। বেশ একটা মেলাই বসে গেছে। এক পাশে একটা পান বিড়ির দোকান। একটা কেরোসিনের কুপী জ্বালিয়ে সে বেচা কেনা করছে। বসার জন্য কোন বিশেষ আয়োজন নেই। জায়গা টাকে গোবর দিয়ে নিকিয়ে শুকনো খড় বিছিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। যে যার ঘর থেকে ছেঁড়া চট, মাদুর, শতরঞ্জি, কাঠের টুকরো নিয়ে এসে বসেছে। নাচ আরম্ভ হবার সময় উত্তীর্ন হয়ে গেছে। নানান বাজনা শেষ হওয়ার পর নর্ত্তকী আসর ঘুরে গেছে। সন্নাসীর অপেক্ষায় নাচ এখনও সুরু হতে দেয়নি মাতব্বর কিন্তু এত দেরী হওরার তো কথা নয়। ঈশ্বরী উৎকণ্ঠার সঙ্গে বার বার পথের দিকে তাকায়। বকে নীলকণ্ঠ।

'অত অকবকাচ্ছ কেনে হে। আসবেক এখুনি। ছুটু ছেল্যা ত' লয়।'

'সি জন্যি ত' ভাবনা রে বাপ। ছুটু ছেল্যা লয়, কিন্তুক দেরী হচ্ছে কেনে?'

'কোন কাজ আছে কে জানে।'

কাজ? মাতব্বর অবাক হয়। সন্ন্যাসির আবার কাজ কি?

'তবে কারও সঙ্গে রাজন্ব করছেন?' এই কথাটি মাতব্বরের মনে ধরে। ঠিক কথা। তাই হবে হয়ত কারো সঙ্গে গল্প করছে। সন্ন্যাসি মানুষ। সবার সঙ্গেই মিষ্টি কথা ব'লতে হয়। কিন্তু আঁজ তো সবাই আসরে ব'সে আছে। সন্ন্যাসি গল্পই বা করছে কার সঙ্গে? বাস্তবিকই উৎকণ্ঠিত হয় ঈশ্বরী।

'হ্যাঁ বাপ লিলু, দেখবি না কি আধেক রাস্তা?'

অনিচ্ছার সঙ্গে নীলকণ্ঠ বলে 'তা তুমি যখন বলছ—নীলকণ্ঠ যাওয়ার উদ্যোগ করে। মাতব্বর স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলে কিন্তুক চাদরটি উড়ে যা বাপ, জাড় লাগবেক, মাতব্বর মনে মনে ভাবে সেই যে বলে নাই, 'র‍্যাজা মরে শীতে আর পীতে', ইয়ারা ইস্কুলে পড়া ছেল্যা—'

'র‍্যাজা মরে শীতে আর পীতে" র‍্যাজা অর্থ্যাৎ ফুল বাবুর কষ্ট

শীতে কারণ, সে শীত বস্ত্র পরিধান করতে চায় না, এবং পীতে অর্থাৎ পীত্তে বা ক্ষুধায়, কারণ অহেতুক লজ্জায় সে খাবার চাইতে পারে না বা খেতে সঙ্কোচ বোধ করে। কথাটি শেষ হওয়ার আগেই ভীড়ের মাঝে সন্ন্যাসিকে দেখা যায়: সঙ্গে সেই পাগড়ী বাঁধা লোকটি।

সন্ন্যাসি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে মাতব্বরকে বলে 'অপরাধ নিও না হে মাতব্বর। আসতে একটু দেরী হল্য।'

মাতব্বর জীব কাড়ে। 'ছিঃ ছিঃ উকথা বল্য না হে। আমারই অপরাধ হবেক। তুমরা সন্ন্যাসি মানুষ। তুমাদের কি অপরাধ ধরল্যে চলে।'

কিন্তু পাগড়ী বাঁধা লোকটি কে? যেন চেনা চেনা ঠেকছে? পানুর কৌতুহল হয়। পানু ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে ঈশ্বরীকে 'উ পাগড়ী বাঁধা লোকটি কে বটে হে? চিনতে লারলাম?'

'ও তুমি তাহলে কিছু শুন নাই। উ মাথা মুড়াইছে হে। তারপর লতীপাড়ার চন্দ সিং-এর বিটিকে সাঙ্গা কর্যে ফিরে আসেছে গাঁয়ে।'

কিশুন ততক্ষণে সন্ন্যাসির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঈশ্বরীর কথা শেষ হ'লেই পানুকে দণ্ডবৎ করে পায়ের ধুলো নেয় কিশুন। "আজই ফির্যেছি সন্ন্যাসি! লাজে দিনের বেলায় তুমার কাছে যেতে পারি নাই। ভেবেছিলাম রাতের আঁধারে যাব। আঁধারে সব অপরাধ ঢাকা পড়্যে যায়। কিন্তুক তুমার কাছে লাজই বা কিসের। তুমি ত' আমাকে বাঁচার পথ দেখাইছ সন্ন্যাসি। নাহলে আমি যে মরমে মর্যে যেতাম।"

'যা কর্যেছ ভালই কর্যেছ কিশুন। লিজের সঙ্গে পবঞ্চনা চলে না। তাতে ভগবান বিরূপ হ'ন।'

কিশুন যেন ওর বুকের বল ফিরে পায় পানুর কথায়। তুমি আশ্চয় দিলে ব'ল্যে আমি ফির্যে বিয়া করলম সন্ন্যাসি। আমি লোকলাজ, সমাজ কলহের জন্তি ডর্যাই নাই। আমি লিজকে ঠকাই নাই। ভগবানকে ঠকাই নাই সন্ন্যাসি।'

'সজ্ঞানে কুন অন্যায় কর না কিশুন। যা করবে ভগবানের নাম নিয়ে করবে। তুমি করার কে? সবই ত' তিনি হাতে ধরে করাছেন হে? দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্যি সবই তেনার। তুমি ত' শুধু তেনার কাজ কর্ম্মের আধার মাত্র।'

এসব কথা শুনলে কিশুনের মাথা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। সব বুঝতে পারে না। না, এখান থেকে দাঁড়িয়ে নাচ দেখা সুবিধা হবে না। ওপাশে গাছটার কোল ঘেঁসে দাড়ালে নাচও দেখা যাবে আর নতুন বৌ এর মুখটাও দেখা যাবে মাঝে মাঝে। বৌকে মাঝে দেখতে না পেলে কেমন যেন বুকটা আনচান করে। ডাগর ডাগর চোখ। গলায় রূপোর হাঁসুলী। কিন্তু কই মালতীর জন্য ত' মনটা এমন আনচান করত না? বোধ হয় হারানো জিনিসের জন্য মায়া এমনি বেশি হয়।

'আমি তবে যাই হে সন্ন্যাসি, উদিকের লোক গুলীন বড় বিকলাছেন। একটুকু সামলাই আসি।'

পান্নু মৃদু হেসে বলে 'যাও'।

এই সেই কিশুন। মালতীর মনের মানুষ। মালতী মারা গেছে। বদলে এসেছে অন্য একজন। পান্নুর মনে হ'ল, মানুষ বদলায় মন বদলায় কিন্তু প্রেম অবিনশ্বর।

সন্ন্যাসির জন্য একটা পৃথক আসনের ব্যবস্থা হয়েছে। সন্ন্যাসিই আজকার মধ্যমণি। নাচনীর আসার আগে পর্য্যন্ত সবাই সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে থাকে। আসা যাওয়ার পথের মাঝে তারা বহুবার দেখেছে সন্ন্যাসিকে। তবু আসরের মধ্যে ওদের দেখা যেন আর ফুরোয় না।

পান্নু হঠাৎ অনুভব করে কার যেন একটা দীর্ঘ ছায়া ওকে ঢেকে ফেলেছে। চাঁদের আলোয় ছায়াটা যেন কাঁপছে। পান্নুর বুকটাও যে অকারণে কেঁপে উঠল। পান্নু চোখ তুলে তাকায়। নীলকণ্ঠ দাঁড়িয়ে আছে পাশে। ওরই ছায়া। মাতব্বর ওকেই পান্নুর দেখা শোনা করবার ভার দিয়ে গেছে। কিন্তু নীলকণ্ঠকে দেখে বুকটা কেঁপে কেঁপে ওঠে কেন পান্নুর?

ঘুঙুরের শব্দ সোনা যায়। যারা এতক্ষণ সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়েছিল তারা চমকিত হয়ে দৃষ্টি ফেরায়। নর্ত্তকী আসছে, নর্ত্তকী। ঘুঙুরের বিলম্বিত অনুরনন এগিয়ে আসে। ঝম্—ঝম্। বুকের মধ্যেও যেন সেই শব্দ তরঙ্গায়িত হয়। ঢেউএর মত হৃদয়ের তটে এসে আঘাত করে ঝম্—ঝম্। মৃদু মেঘগর্জনের মত কানুদাস রসিকের মাদলও বেজে ওঠে। সুছন্দ গম্ভীর আওয়াজ। যেন মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মত ব্যঞ্জনা ময়। এখণ বন্দনা গান। কিন্তু যখন রঙের গান হবে, তখন এই মাদলই বেজে উঠবে দ্রুত তালে। দামাল ছেলের মত দুরন্ত গতি। বর্ষার পাহাড়ী নদীর মতই খরস্রোত।

নর্ত্তকী আসরে ঢোকে। বুকের ওপর আড়াআড়ি টান করে বাঁধা বাংলা গুণিত চিহ্নের মত জাপানী সিল্কের ওড়নার ওপর পুরুষদের পিপাসিত দৃষ্টি ওঠানামা করে বার কয়েক। গ্যাসের আলোয় ছটা লাগে ওর বেগুনী ব্লাউজের বর্ণালীতে। ঘাগরার চুমকিগুলো চিকমিক করে। যেন জোনাকি শরীর।

মাদল দ্রুত তালে বাজে। কানুদাস রসিকের বিরাট আলখাল্লার মধ্যে গুটিয়ে রাখা পাখীর মত শরীরটাও মাদলের তালে তালে কাঁপে। তেহাই-এর মাথায় হঠাৎ ঘাগরা উড়িয়ে কাজলী পায়ের দুটো বুড়ো আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে হাত জোড় করে বসে পড়ে। এরপর হবে শ্রীদুর্গার বন্দনা। বন্দনা করে দেবতার মনস্তুষ্টি করে রঙের গান গাইলে কোন পাপ হয় না। রঙের গান মানেই ত' দেহের গান। প্রবৃত্তির গান।

মৃদু কণ্ঠে বন্দনা গীত শুরু করে কাজলী—

জগৎ জননী কৈলাস রমণী শিবে ঐ পদে লুটায় রে,
ডাক ডাক ভাই মনের সুখে জয়মা ব'লে সবাইরে।
রমা, গণপতি, মাতা সরস্বতী দক্ষিণে বামে সবাইরে,
মধ্যে মৃগপতি, পৃষ্ঠে ভগবতী অসুর পদে লুটায়রে।
জয় দুর্গা বলি দিব পুষ্পাঞ্জলী রাঙ্গা জবা রাঙ্গা পায়রে।
ডাক ডাক ভাই মনের সুখে জয়মা বলে সবাইরে॥

বিলম্বিত সুরে বন্দনা গান। ওরা আর ধৈর্য্য রাখতে পারে না। ওরা রঙের গান শুনতে চায়। রসের গান। প্রেমরসের। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা। সে গান শুনে মনটা ভক্তিতে আপ্লুত হ'য়ে ওঠে না। কেমন যেন একটা মিশ্রিত অনুভূতিতে মনটা ভরে যায়। এই পুলকানুভুতির মধ্যে নিজেদের জীবনের বৃন্তে ওরা রাধা আর কৃষ্ণের মন নিয়ে স্বপ্ন দেখে। বিশেষ করে অনূঢ় যুবকরা। আর ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে পরকীয়া প্রেমে যাদের অসাধারণ আসক্তি। কেউ কেউ কল্পনার সাম্রাজ্যে নাচনীকেই রানীর আসনে বসিয়ে ঝুমুরের কলীগুলো গুণ গুণে করে। কিন্তু ঠাকুর দেবতার প্রেমলীলার গান গাইতে হ'লেও আগে বন্দনা করতে হবে গণদেবতাকে। মানুষের দেবতাকে। দেবতার দেবতাকে। নইলে পাপ হবে যে।

পাপ। নাচনীর আবার। কেউ কেউ বলেই ফেলে 'লাও হে, আর বন্দনা গীতের কাম নাই, ঝট করো্য একটি রঙ্গের গান ধর কেনে।'

কাজলীর রাগ হয়। রঙের গান শুনে যদি প্রাণে রস আনতে চাও তাহলে পরিবারের পাশে শুয়ে ঘুমোওগে, এখানে কেন। কিন্তু মুখ ফুটে ব'লতে পারে না। হাজার হোক খদ্দের। খদ্দের বৈকি। তার রঙ্গ-রসেরই খদ্দের। এদের রুষ্ট করলে ব্যবসার ক্ষতি। এতে পসার কমে যায়। আর একজন নর্ত্তকীর কথা মনে পড়ে কাজলীর। সে মেনকা। যৌবন কালে মাটীতে পা পড়ত না ওর। আসরে কেউ বেলাল্লাপনা করলে চড় কষিয়ে দিত মেনকা। কিন্তু কোথায় যেন বেমক্কা পা পিছলে গেল মেনকার। আস্তে আস্তে দুর্ণাম করতে লাগল। নাচনী মুখরা। বদ 'মেজাজী। প্রাণে রস নেই। পয়সা খরচ করে কে একটা বালির পাহাড় নিয়ে আসবে? তার চেয়ে রসের ঝরণা এনে গ্রামকে গ্রাম প্লাবিত করে দেওয়াই ভাল। না হয় মেনকার থেকে একটু নীরেস হবে নাচের দিকে। কিন্তু তাতে কি? নাচের ঘাটতি ও রসের মিশেল দিয়ে পুরন করে দেবে।

সেই মেনকাকেই একদিন শালবনীর হাটে ভিক্ষে করতে দেখেছিল কাজলী। সেদিন যেন হাট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। মেনকার কাছে যেতে কেমন যেন ভয় করছিল। নিজের ভবিষ্যতের ছায়ায় শঙ্কাতুর কাজলী বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছিল। তিন দিন আর আসরে নাচতে পারেনি। বন্দনা গীত শেষ করে একটা রঙের গান ধরে কাজলী। গানের শেষ কলীটা গায় কানুদাস রসিক। একটা পা উপরে তুলে লড়াইএর মুরগীর মত খানিকটা তরতর করে হেঁটে যায়। মাদল বাজে গিজতা গিজাং গিজাতা গিজাং মুখে মাদলের বোল—ধি তট ধি তট ললিতট···শেষ তেহাইএর চাঁটী মেরে পায়ের বুড়ো আঙুল দুটোয় ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে কানুদাস। সঙ্গে সঙ্গে কোমরে হাত দিয়ে জলদ ছন্দে নাচ শুরু করে কাজলী। তিয়াসির মরদদের রক্তে তুফান জাগে। পচাইএর নেশায় আমন্থর হয়ে আসে চোখের দৃষ্টি। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে। মনের মধ্যে রসের ঢেউ উথলি পাথালী। কাজলীর গান যেন সেই উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্রে আকাশ ছাওয়া কালো মেঘ। কাজলী গায়—

এ' হো ডর লাগে,
মোরা কাঁচি উমেরিয়া ডর লাগে
কাঁখে গাগরীয়া বীচে ডগরিয়া,
ডর লাগে, এ হো ডর লাগে।'

সমের মাথায় গ্রাম শুদ্ধ লোক একসঙ্গে হাত তালী দিয়ে ওঠে। ওদের নিজস্ব ভাষায় গান নয়। ভাষাটা করমালী। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে নেই। শ্রীরাধার কপট ভয়। এই কাঁচা বয়স নিয়ে আমি ভয়ে শিহরিত। কাঁখে গাগরী। মাঝে পথ। তাই এই ভয় কারণ—পরের কলীটা ধরে কাজলী—

কহনে না মানে কানু
ধরল আঁচরোয়া,
ঝিঁকা জোরি, এহো ঝিঁকা জোরি···
(আরে) বড় উট পটিয়া ঝিঁকা জোরি···

আবার সমস্বরে একটা প্রসংসার ধ্বনি ওঠে....হায়-হায়, সাবাস নাচনী।' এটুকু রাধিকার চাতুরী। কানু মানা শোনে না। পিছু থেকে আঁচল টেনে ধরে। কানু বড়ই ছটপটে। সোহাগ জানাবার জন্য টানাটানি করে। এবার শেষ কলাটা ধরে নাচনী,—

শাঁখা চুড়ী ফরিদেলী, ভরলি গাগরিয়া,
পন্থমাহী, কানু পড়ল ঝপটিয়া পন্থমাহী।
কহতী হাড়ীরাম, শুনি লো শ্রীমতীয়া,
তোরা ডর নাহী।
ধনি, তুহি যুবতীয়া, ডর নহী।'

হাততালীতে মুখরিত হ'য়ে ওঠে বাবার থান। অর্থাৎ নুতন শাঁখা চুড়ী পরে গাগরী ভরনে এসেছি পথের মাঝে কানু জাপটে ধরল। শাঁখা চুড়ী ভেঙ্গে গেল। কিন্তু ভয় নেই। হাড়ীরাম, অর্থাৎ পদকর্ত্তার আশ্বাস, শ্রীমতা তুমি যুবতী, তোমার কোন ভয় নেই। অর্থাৎ তুমি তোমার নবীন যৌবন দিয়ে কানুকে জয় কারবে।

দ্রুত লয়ে মাদলে বোল তোলে কানুদাস। তার তালে তালে দ্রুত ছন্দে নাচে কাজলী। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাস। আর উচ্ছাস জানাবারও অবকাশ পায় না, নর্ত্তকী নানা ভঙ্গীতে নাচে। কখনও একক, কখনও দুজনে। হেঁটে কুলীর নটবরের ব্যাটা চম্পাই একটা আধুলী নিজের কপালে টীপের মত সেঁটে রাখে। নাচের মাঝে নাচনী কোন উন্মুখ মুহূর্ত্তে ঠোঁট দিয়ে তুলে নিয়ে যাবে আধুলিটা। নর্ত্তকীকে পেলা দেওয়ার এই রীতি। কেউ হাতে রাখে। কেউ বুকে। কিন্তু চম্পাই বড়ই শেয়ানা। ও রেখেছে একেবারে কপালে। এবারে আর উপায় নেই নর্ত্তকীর। সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।

'হাত নয়, মুখ নয়, মাথা নয়, একেবারে কপালে?' ছোকরা গুলোর চোখ দুটো যেন কপালেই উঠে যায়! উচ্চকিত হাসির শব্দে কাজলী পিছু তাকায়। আধুলীটা দেখে মনটা কেমন যেন সিটিয়ে যায় ওর। কানুদাস বার বার চম্পাইএর দিকেই যাবার

জন্ম সহিত করবার চেষ্টা করছিল কাজলীকে। কিন্তু কাজলীর মনটা বিতৃষ্ণায় ভ'রে ওঠে। কাজলী নাচতে নাচতে ভীড় সরিয়ে যেদিকে পান্নু ব'সেছিল, সেই দিকে এগিয়ে যায়। তারপর পান্নুর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে মাতববরও ফিরে আসে। কাজলীকে পান্নুর পায়ের কাছে পড়ে থাকতে দেখে মাতব্বরের মনে হয় না নাচনীটির ধর্ম্মে মতি গতি আছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয়, এমন করলে তো চলবে না। পুরোপুরি মজুরী কড়ার করা হয়েছে। লোকের মন না ভরলে তো চ'লবে না।

'কানুদাস, নাচ বন্ধ করল্যে নাকি হে?'

'কেজানে মাতব্বর। কাজলী তো সন্ন্যাসীর চরণ ধর‍্যে পড়্যে আছে।'

'কিন্তুক সিটি বল্লে ত চলবেক নাই ব'। গেরাম বাসির কাছে শেষে আমি দুষী হব। পুরা সময়টি লাচতে হবেক।'

কানুদাস কাজলীর কাঁধটা আস্তে স্পর্শ করে মৃদু কণ্ঠে বলে 'উঠ, কাজলী, উঠ।'

কাজলী তবুও ওঠে না।

'কাজলী' আবার বলে কানুদাস, 'উঠ কাজলী। দেখ, মাতব্বর আবার গাইতে বুলছে।'

'লারব। আমি আর গাইতে লারব।' ঝাঁঝিয়ে ওঠে কাজলী।

'ছিঃ, মাতব্বর পবীন মানুষ, উহার মানটি রাখবি নাই?' মিনতি করে কানুদাস।'

'আমি থক্যে গেছি রসিক। আর নাচতে লারব।'

'সিটি বল্লে,' চলবেক নাই। আমি যে বায়না নিয়েছি।'

'বায়না নিয়েছ তুমি নিয়েছ। আমি তার কি জানি। আমি সন্ন্যাসীর চরণ ধর‍্যে পড়্যেছি।'

এবার খানিকটা রুষ্ট হয় কানুদাস। একি অবুঝ মেয়ে।

সন্ন্যাসীর চরণটি ত' পলাই যাবেক নাই। কিন্তুক ই রাতটি চল্যে গেল্যে আমাকে অন্য জায়গায় বায়না বাতিল করতে হবেক।'

'সি তুমি যা পার কর' সন্ন্যাসীর কাছ ছেড়ে ওঠে না কাজলী।

কাজলীকে বোঝাবার চেষ্টা করে কানুদাস। 'ছিঃ কাজলী লিবুঝ হস না। কত গুনিল লোক বস্যে আছে তুর নাচ দেখার পেত্যাশায়। তু নিরাশ করল্যে কি চলে'।

কাজলী অটল। 'সন্ন্যাসীর চরণে আশ্চয় লিয়েছি। আর রঙের গান গাইতে লারবো।'

'অমন বলিস না কাজলী, রঙের গান শুনবার লেইগ্যে বস্যে আছে সবাই।'

'লারব, লারব, লারব, আমি কি মানুষ না পাথর' সন্ন্যাসীর পা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় কাজলী। কাজলী যেন মানবী নয়। যেন দলিতা ফনিনী। 'আমার পরাণে কত জ্বালা, তা যদি দেখাতে পারতাম তুমাদের। আমি পারছি নাই গো, আমি পারছি নাই।' কাজলী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

পানু এতক্ষণ অত্যন্ত বিব্রত ভাবে বসেছিল। এতক্ষণ কোন কথা বলার সুযোগ পায়নি। কাজলী একটু শান্ত হতেই পানু বলে 'ছি', কাজলী কাঁদতে নাই। দুঃখু সবারই আছে। পৃথিবিটাই দুঃখের। যাও তুমি লাচ কর। এই দুঃখের সংসারে লোকের মনে আনন্দ দেওয়া যে সবচেয়ে বড় পুন্য। ইয়াতে ভগমান খুশি হন।'

'আমি যে লিজের ভার লিজেই বইতে লারছি সন্ন্যাসী।'

'মেইয়া মানুষকে লিজের ভার বইতে নাই কজলী। মেইয়া মানুষ হল্য লতার মতন। ব্রেক্ষকে আশ্চয় করে লতার বাস। তা সে ব্রেক্ষকেও মজবুত হওয়া দরকার। যেন লতার ভারে ভেঙ্গে না পড়ে। তুমিও একটি ব্রেক্ষকে আশ্চয় কর।'

'আমি যে বিষলতা সন্ন্যাসী। আমি যাকে আশ্চয় কোরবো সে যে পুড়ে খাক হয়ে যাবেক।'

'ভগবানের কেরপা পেলে বিষও অমৃত হয় কাজলী। তুমি যে ভগমানের সাধনা কর।'

'তুমিই আমার ভগমান সন্ন্যাসী। তুমিই আমাকে পথ বুলে দাও।'

'ছিঃ ছিঃ উকথা বল্লে পাপ হয়। মানুষ কোনদিন ভগমান হয় না কাজলী।'

'তবে কি কোরে ভগমানের আরাধনা করব বলে দাও।'

'তুমার কর্ম্মই যে ভগমানের আরাধনা কাজলা। লাচের মাঝেই তো তুমি ভগমানের সাধনা কর নিত্যদিন।'

'তুমি বুলছ সন্ন্যাসী, এই আমার সাধনা?' 'হঁ গো' বলছি হাঁসি মুখে পানু বলে।

কাজলী একবার পানুর চোখের দিকে তাকায়। তারপর ফিরে যায় আসরের দিকে। তারপর আবার গান ধরে। রাধার বিরহের গান। এক খণ্ডিতা নায়িকার বিলাপ। বিশ্বের যতেক বিরহিনীদের প্রীতি আকুল বেদনা যেন ছড়িয়ে পড়ে আকাশে, বাতাসে, ঘাসে, ঘাসে। প্রিয়জনের আসঙ্গ কামনায় বিধুর হৃদয়ের বিলাপ।—

সখন গহন রাতি, চমকে বিজরিয়া,
ললিতা, কেনে না আইলো কালিয়া,
হায় হায়, পঞ্চশরে মোর দহিছে হিয়া।

পানুর অকস্মাৎ মনে হয় একটি পরিচিত মুখ ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার দৃষ্টিতে যেন একটা আহ্বান ছিল হারিয়ে যাবার। কানায় কানায় যৌবনের পসরা নিয়ে যেন হাতছানি দিয়ে গেল একটি নিরুদ্ধ কামনার স্বপ্ন। এই জোৎস্না ভরা রাত; এই হিমেল হাওয়া, রাধার বিরহের বিলাপ, সবে মিলে যেন পরিবেশটা আশ্চর্য্য মায়াময় বলে মনে হয় পানুর কাছে। পানু ধীরে ধীরে উঠে নিশি পাওয়ার মত শালই ডহরের দিকে হাঁটতে থাকে। তিয়াসির প্রমোদ মত্ত জনতা তাকে লক্ষ্য করে না।

পানুর মনে হয় যেন কোন অশরিরীর ছায়াকে ও অনুসরণ করছে। আসর থেকে কাজলীর গানের সুর ভেসে আসছে। সেই সুর যেন তরল জোৎস্নার সঙ্গে মিশে অশ্রুর শিশির হয়ে ঝরে পড়ছে মাটীতে। ঘাসের শীষে জমেছে সেই শিশির। যেন পায়ে পায়ে লুটোপুটি করে বেদনার্ত্ত হৃদয়ের কান্না ঝরা মিনতি। পানুর পা দুটো ভিজে যায়।

আচ্ছন্নের মত পথ হাঁটে পান্নু। যেন একটা ছায়া সত্যি স্বপ্নের পিছনে হেঁটে চলেছে ও। সুচাঁদ সিং এর সমাধির কাছে এসে সহসা থমকে যায় পান্নু। কাজলীর গান যেন বাতাসে দোল খেতে খেতে দীর্ঘক্ষণ পরে এসে কানে বাজে, ললিতা, কেনে না আইল কালীয়া।

বিরহিনী নারীর যুগ যুগান্তরের কান্না। হয়ত মাতালী বুড়ীও একদিন এমনী কেঁদেছিল। হয়ত ওর শতধা বিদীর্ণ হৃদয়ের শতদল ফুটে উঠেছিল প্রিয়তমের ফিরে আসার আশ্বাসে। হয়ত সে আর আসেনি। হয়ত তার আকুল হৃদয়ের তীতিক্ষা আকাশের বুকে উদাসী তারা হয়ে মিটমিট করে জ্বলছিল।

সেই ছায়া শরীরিনির মুর্ত্তিটা এগিয়ে গেছে অনেকদুর। পান্নু সামনের দিকে তাকিয়ে তাকে আর দেখতে পায় না। পান্নুর বুকটা ধক করে ওঠে। পদ্মর কি ভয়ডর কিছু নেই? নিশুতি রাত। পান্নু দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায়। বাতাস মহুয়ার সুগন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। কোথায় যেন মহুয়া ফুটেছে। টুপটাপ শব্দে মহুয়া মাটিতে পড়ছে। ছোটবেলায় মহুয়া কুড়োতে যেত পান্নু আর পদ্ম। কতবার মহুয়ার কলিগুলো কাড়াকাড়ি করে খেয়েছে ওরা। নীচু হয়ে একটা মহুয়া কুড়োল পান্নু। রসে ভর্ত্তি। কাঁচা সোনার রং। চোখ দুটো নেশায় বুজে আসে। ওই তো বাঁকা পোল আর লেদা পিয়ালের গাছ। আগে তিয়াসির প্রেমিক প্রেমিকারা বাঁকা পোলে অভিসারে যেত। বাঁকা পোলের আসে পাশে এখনও এমন অনেক নিভৃত মিলনস্থান আছে সেখানে দিনের পর দিন অনায়াসে লুকিয়ে থাকা যায়। কতদিন পান্নু আর পদ্ম লুকোচুরি খেলেছে বাঁকা পোলের কাছে। বাঁকা পোলের পাশের বুড়ো অশ্বত্থটার নীচে দাঁড়াল পদ্ম। গাছটা বয়সের ভারে জীর্ণ। ডালপালা ঝরে গেছে। শুধু গুঁড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ওর অতীত গৌরবের সাক্ষর হিসাবে। আগে এই অশথ তলাটা একটা বিশ্রামের জায়গা ছিল। বকুল নগরের পথিকেরা বাঁকা পোলের পাশে এই অশথ গাছটার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করত। মুড়ি চিঁড়ে খেত। সেই পাতার বর্ম্ম ছেদ করে একটুকু আলো ঢুকতে পেত

না, মনে হত যেন একটা চিরছায়ার রাজত্ব। ওর ছায়ায় দাঁড়ালেই একটা ঘুমঘুম ঠাণ্ডায় চোখে শ্রান্তির জড়িমা নামত। আজ তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। যেন স্বসৃষ্ট গৌরবের একটা নিষ্ঠুর ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে অট্টহসি হাসছে কোন উন্মাদ কারিগর। পদ্মর মুখোমুখি দাঁড়ায় পানু। তিয়াসিতে ফিরে আসার পর এই প্রথম পদ্মকে এমনী নির্জ্জনতার মাঝে পেল পানু। এমনী মুখোমুখি দাঁড়াবার এই প্রথম অবকাশ পেল ও। পানুর মনে হল রাত্রির এই অন্তহীন অন্ধকার আর সুচীভেদ্য নৈঃশব্দের মাঝে ও সবকিছু ব'লতে পারে পদ্মকে। ওর এতদিনের জমানো আবেগ, ব্যথা, সব কিছু প্রকাশ করতে পারে আজ। এবং সব কথা বলার আবেগে উন্মুখ মন যখন প্রকাশের অপেক্ষায় বেপথুমান, ঠিক তখন এবং তখনই পদ্ম ওর হেঁয়ালী চোখ দুটো পানুর চোখের ওপর রেখে সুধোয়

'সন্নাসী, রোগ সারাতে পার তুমি?'

পানু চমকিত হয়। 'রোগ? কি রোগ, কার?'

'অত সব শুন্যে তুমার লাভ কি সন্নাসী। আমার কথাটির জবাব দাও, রোগ সারাবার দাওয়াই জানা আছে তুমার?

"সব রোগের ত' এক দাওয়াই হয় না। রোগের বিবরণটি শুনতে হয় আগে। লক্ষণ গুলিন জানতে হয়।'

'মন জ্বলনের দাওয়াই জানো?'

পানু জবাব দিতে গিয়ে থমকে যায়। 'উ অসুখটি কার হইছে গো? লোকটি কে? মেইয়া মানুষ না মরদ লোক?'

'অত শুন্যে কাজ কি? লোক হিসাবে দাওয়াই বদলায় ন কি? কই আমাদের উদাসী ওঝা ত মেইয়া মরদকে একই দাওয়াই দেয়?'

'সে যে দেহের রোগ পদ্ম। দেহের রোগে ভেদাভেদ নাই। কিন্তুক ই যে মনের রোগ। মেইয়া মানুষের এক ওষুধ মরদ মানুষের আর এক।'

'ধর কোন মেইয়্যা মানুষ।'

'বয়স কত?'

পদ্ম হাসে। নিঃশব্দ হাসি। তাই কোথাও এতটুকু শব্দ তরঙ্গর সৃষ্টি হয় না। গাছের পাতাগুলো হিল্লোলিত হয় না। কেঁপে কেঁপে ওঠে না পদ্মর সমস্ত শরীর।

পদ্ম বলে 'মেইয়্যা মানুষ। তায় আবার যুবতী।'

পানু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেয় 'তার দাওয়াই পুরুষ সঙ্গ।'

পদ্ম নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকে। পূবালী বাতাসে দোলন লাগে আমলকীর বনে। হঠাৎ লক্ষ্য করে পদ্ম, ন্যাড়া অশ্বত্থেও নতুন পাতা গজিয়েছে। একটি পরিণত হৃদয়ে যেন নতুন করে রং লেগেছে। একটা পুলকের ছোঁয়ায় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে শিহরণ হচ্ছে।

'সন্নাসী মনের জ্বালা বড় জ্বালা। মুচুকুন্দর পাতা বেটে অঙ্গে লেপন করল্যে দেহের জ্বালা কমে, কিন্তুক মনের জ্বালা কমে কিসে। মন যে দেখা যায় না। সিখেনে কেঁদে মরাই সার।' পদ্মর কণ্ঠ বেদনায় আপ্লুত।

কিন্তু পদ্ম যে এখনও নাগালের বাইরে। এ যেন জলের আয়নায় মুখ দেখা। হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে আর হাওয়ায় যখন ঢেউয়ের বুকে কাঁপন লাগে তখন সব হারিয়ে যায়। কিন্তু এই নিশীথ নির্জনে পদ্মর চোখে কিসের হাতছানি দেখেছিল পানু? কিসের ইসারায় সব ভয়কে তুচ্ছ করে মন্ত্র মুগ্ধের মত ও ছুটে এসেছে? একি তার মরনাভিসার? পানুর অবরুদ্ধ হৃদয় যেন না বলা কথাগুলো প্রকাশ করবার অন্ধ আবেগে ব্যাকুল হয়ে উঠল। পানুর ইচ্ছে হল সে চীৎকার করে বলে সব মিথ্যে পদ্ম সব মিথ্যে, মিথ্যে আমার সাধুত্বের আবরণ, মিথ্যে আমার প্রব্রজ্যার নির্মোক, মিথ্যে আমার গেরুয়ার ভেক। সত্যি শুধু দীর্ঘ দিন ধরে হৃদয়ের মনিকোঠায় লালিত একটি স্বপ্নের প্রতিবিম্ব। কিন্তু তার আগেই পদ্ম, ভয়ার্ত্ত স্বরে বলে 'সন্নাসী, আমার মনে পাপ লেগেছে, আমি কি করব বল্যে দাও।'

'পাপ পুণ্যের হিসাব ভগবান করেন। কিন্তুক নিজের মনের কাছে সুদ্ধ থাকার নামই ধর্ম্ম।'

'কিন্তুক আমি যে লারছি সন্নাসী। লিজের মনের সঙ্গে লড়াই

করে আমি যে হয়রান হয়ে গেলম। মন যে আমার কি চায় তা যদি তুমাকে বলতে পারতাম সন্নাসী।' পদ্ম ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। "আজ বারো বছর ধর্যে আমি শুধু ভেবেছি আর দিন গুণ্যেছি। সেই দিনটি যখুন এল্য, আমার মনের ফুল গুলিন তার আগেই ঝর্যে গেছে। সেই ঝরা ফুল দিয়ে পুজা করব কুন পাথরের দেবতার?'

পান্নুর অদম্য ইচ্ছে জাগে এই মুহূর্ত্তে নিজের সত্যি পরিচয় প্রকাশ করে পদ্মর দুই ব্যগ্র বাহুবন্ধনের মাঝে ধরা দিতে। এই মুহূর্ত্তে গেরুয়ার ভেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে পদ্মর হাত ধরে হারিয়ে যেতে ওই নিবিড় অরণ্যের মাঝে। কিন্তু একটা অপরাধ বোধ ওকে পীড়া দেয়। পদ্মকে ও ছলনা করেছে। এ তো পান্নুর সত্যি রূপ নয়, এ যে ধার করা।

দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আজ যখন সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে তাকে দুহাত বাড়িয়ে তাকে আমন্ত্রণের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে নিঃশেষে।

পান্নুর গেরুয়ার বেশই দুস্তর বাধার মত দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার আড়ালে যে একটি পিয়াসি মন পদ্মর আসঙ্গ কামনায় ব্যাকুল, তাকি পদ্ম জানে না? এই ছদ্ম আবরনটুকুই একটি নিভৃত নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু এই ছলনার নির্মোকই পদ্মর কাছে দুস্তর বাধা হয়ে থাক, এ পান্নু কোনদিনই চায়নি।

'তুমি বল্যে দাও সন্নাসী, আমি কি করব 'ডুকরে ওঠে পদ্ম। কিন্তু জীবন সমুদ্রে পান্নুও যে পদ্মর মতই দিশেহারা। এই মুহূর্ত্তে পান্নুর মনে হয় ওর দীর্ঘদিনের নিরুদ্ধ আবেগ বুঝি বা ওকে ভেঙ্গে চুরে তচ নচ্ করে দেবে। পদ্মর এই আকুল কাকুতির কাছে বুঝি বা পান্নুর সব অ ভনয় ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু পান্নু তো পদ্মর কাছে অভিনয় করতে চাযনি। সে তো ধরা দিতেই চেয়েছিল। পদ্ম বুঝতে পারেনি কিন্তু না, এখন আর সম্ভব নয়। এই মুহূর্ত্তে পদ্মর কাছে ও সত্যিকারের পরিচয় জানালে হয়ত—কিন্তু ক্ষতি কি? যদি পদ্ম জানতেই পারে যে সব মিথ্যে, এ শুধু পদ্মকে কাছে পাবার কৌশল তাহলে? না, আজ আর পেয়ে হারাতে চায় না পান্নু। তাহলে

পদ্মর শ্রদ্ধার ইমারত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। পান্নুর এই ছলনা পদ্ম মার্জনা করবে না কোনদিন। কারন পদ্ম তো এতদিন পান্নুর পথ চেয়েই বসেছিল। না হলে ভূমিজদের ঘরে এতদিন কেউ অঁনূঢ়া থাকে না।

সহসা উল্লসিত হয়ে ওঠে পান্নু, পদ্ম তো তারই, এতদিনের নির্বিকার যৌবন অপচয়ের পর আজ পদ্মকে কাছে পেয়েছে সে। এতদিনের অবরুদ্ধ কামনা উপছে ওঠে মনের মধ্যে। কিন্তু পান্নু প্রকাশ করতে পারে না। এত জ্বালা, এত বিষ ওর গেরুয়ার ভেকে। পান্নুর মনে হয় ওর সারা অঙ্গ যেন বিষে জ্বলে যাচ্ছে। সামনে সুধার সমুদ্র অথচ এক ফোঁটা পান করে তৃষ্ণা মেটাবার সামর্থ নেই ওর। পদ্ম আঁচল ভরে তুলে ধরেছে ওর অফুরন্ত যৌবনের সম্ভার, অথচ পান্নুর দুহাত কোন অদৃশ্য শিকলে বাঁধা। পান্নু প্রাণপণ চেষ্টা করে কিন্তু কোথা থেকে রাজ্যের বাধা যেন ওর কণ্ঠ রোধ করে দেয়। বলা আর হয় না। মাথার মধ্যে চিন্তার পোকাগুলো কিলবিল করে। আজকার রাত হয়ত আর ফিরে আসবে না, এমন নিঃসঙ্কোচ আত্ম সমর্পনের ক্ষণিক মুহুর্ত্তটি হারিয়ে যাবে অতীতের গভীরে। আজকার এই মায়াময় রাত্রিতে হয়ত পদ্মর চোখের স্বপ্নও ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু পান্নুর মনের কথাটি না বলাই রয়ে যাবে। অনেক চেষ্টা করেও পান্নু বলতে পারে না যে পদ্ম আমি তোমারই। পান্নুর অজ্ঞাতেই পান্নুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে 'ভগবান তুমার কামনা পুরন করুন পদ্ম।'

'আজ আমার কুন কামনা নাই সন্ন্যাসী। আমি ফুর‍্যাই গেছি। আমি দেউলে হয়্যে গেছি।'

পান্নু লজ্জিত হয়। না, না পদ্ম তুমি ফুরিয়ে যেও না। এখনও যে অনেক পথ বাকী। পদ্মকে আবার নতুন করে ফুটতে হবে। ভোরের শিশিরের মত, শরতের ঝলমলে সকালের মত। পদ্মর প্রতীক্ষার বৃন্তে কি কোন আকাঙ্খা, কোন কামনার স্বপ্ন নেই? পদ্মকে ঘিরে যে অনেক কল্পনার রঙ্গীন ইন্দ্রজাল রচনা করেছে পান্নু, সব যে নষ্ট হয়ে যাবে।

মনের সব উত্তেজনাকে সংহত করে পান্নু, শান্ত কণ্ঠে বলে ভগমানের চরণে আশ্রয় লাও পদ্ম। আমরা ত নিমিত্ত মাত্র।'

অকস্মাৎ দলিতা ফনীনির মত ফুঁসে ওঠে পদ্ম 'সে ভাবনা তুমার নয় সন্ন্যাসী। তুমি কি ভাবো আমি ভগমানের চরণ আশ্রয় করবার লেগ্যে তুমাকে আমার পারের পরাণী করতে চেয়েছি?

পান্নু যেন কুণ্ঠিত হয়ে বলে 'আমি কি তাই বুলেছি তুমাকে?

পদ্ম দৃপ্ত হয়ে ওঠে। একটা জীবন্ত দিপশিখা যেন হঠাৎ প্রদীপ্ত জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

'সন্ন্যাসী আমার কি বুঝার বয়স হয় নাই? তুমি কি ভেবেছ এই রাত দু পহরে তুমার কাছে রঙ্গের কথা বলতে এসেছি?'

পান্নু বাস্তবিকই বিস্মিত হয়। পদ্মর হঠাৎ রাগ হয়ে ওঠার কারণ বুঝতে পারে না ও।

পদ্মর মনের জ্বালা মেটে না। 'সন্ন্যাসী, যৈবনের সব দিনগুলি আমার একা কেটেছে। কিন্তুক তুমাকে আশ্রয় কর্যো ভগমানের চরণে পৌঁছাবার কথা স্বপনেও ভাবি নাই।'

পান্নু আশ্চর্য্য হয়। এ কথা তো পান্নুও বলতে চায়নি। বরং নিজের হৃদয়ের উদ্দাম কলরোলকে গোপন করবার জন্য পদ্মকে ভগবানের চরণে আশ্রয় নেবার কথা বলেছিল। তাছাড়া, অসতর্ক মুহূর্তে সন্ন্যাসীর বাঁধা বুলিগুলো মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। পান্নু মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেয়। পদ্ম যেন পান্নুর কাছে আরও দুজ্ঞেয় হয়ে ওঠে। পান্নু কোনদিন পদ্মর মনের নাগাল পায়নি। আজও পায় না। পান্নু ভাবে বারো বছরে কত মাস কতদিন? এতদিনেও কি ওর মনের সায়রে পলি জমে তার গভীরতা হ্রাস পায়নি একটুকুও? এখনও কি তেমনি অতলান্ত? তেমনি রহস্য ভরা?

ঠিক সেই মুহুর্ত্তে পদ্মও ভাবে, পান্নু হয়ত আশঙ্কা করেছে পদ্ম ওর দুর্বল মনকে ভগবানের পায়ে সমর্পন করবার আশায় পান্নুকে আশ্রয় করতে চায়। সব প্রত্যয় সব সংযমকে কঠোর অনুশাসনে

বেঁধে পদ্ম ভাবতে চেষ্টা করে—ভুল। সব ভুল। সব মিথ্যে। পান্নুর প্রতি আজ তার আর কোন আকর্ষণ নেই। কোন মোহ নেই পদ্মর। তাছাড়া পান্নু সন্ন্যাসী। যুগে যুগে সন্ন্যাসীদের তপোভঙ্গ করেছে উর্ব্বসি, মেনকা, রম্ভার দল। তারা সব বেশ্যা। কিন্তু পদ্ম? পদ্মর অবচেতনায় ওর আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে। ছিঃ, পদ্ম কি এতই ছোট? আঠাশটি মুকুলিত বসন্ত ওর মনের বন্ধ দুয়ারে আঘাত করে ফিরে গেছে। অনেক স্বপ্নময় জীবনের হাতছানীকে সে উপেক্ষা করেছে। অনেক পুরুষের ভালবাসার অর্ঘ্য আর আকাঙ্ক্ষার উপাচার চোখ মেলে তাকিয়েও দেখেনি। পদ্ম বহু বাঞ্ছিতা। পদ্ম ভুমিজ কুলে অনন্যা। এখনও পদ্মর চোখের তারায় চকিত খঞ্জনার দৃষ্টি। এখনও দেহের রেখায় রেখায় কুল ভাঙ্গা যৌবন অজস্র ধারায় উপছে পড়ে। তবু, তবু পদ্ম আজও পিপাসিতা। কৈশোরের কোন এক ক্ষণে বসন্তে পদ্ম ওর হৃদয় হারিয়ে ফেলেছিল শালই ডহরের মাঠে। পদ্ম যে আজও তারই প্রতীক্ষায় অমুঢ়া। সবাই যখন অনুরোধ উপরোধে বিব্রত করে তুলেছে পদ্মকে তখনও পদ্মর মন গুণ গুণ করেছে, সে আসবে, সে আসবে। সে এল, কিন্তু এ কি তার বেশ। এ যেন খরার আগুণে পোড়া তিয়াসি। উষর, রুক্ষ, অফলা। প্রাণের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এ যেন উদাসীন 'ধরিত্রীর বেশ। মানুষ পান্নুকে সমস্ত অন্তর দিয়ে আকাঙ্ক্ষা করেছে পদ্ম, কিন্তু সন্ন্যাসী পান্নুকে পথভ্রষ্ট করবে কোন সাহসে? হঠাৎ যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। পদ্ম হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে উঠল 'ই আমি চাই নাই,? আমি সন্ন্যাসী, তুমাকে বেপথে নিয়ে যেতে চাই নাই।

পান্নুর চেতনায় একটা অপরাধ বোধ পীড়া দেয়। পান্নুর অবাধ্য মন যেন সহসা বিদ্রোহ করে ওঠে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও পান্নু ওর অতৃপ্ত পিপাসা রোধ করতে পারে না। পান্নু পদ্মকে ভালবেসেছিল। সে ভালবাসা আজও অক্ষত, আজও অম্লান।

সহসা পান্নুর রক্তে তুফান জেগে ওঠে। তড়িৎ শিখার মত

একটা আকাঙ্ক্ষার শিহরণে ওর বুকটা থর থর কেঁপে ওঠে। পদ্মকে বুকের মধ্যে দৃঢ় আলিঙ্গণে পীষে ফেলবার জন্য দুর্বার হয়ে ওঠে ওর অবাধ্য মনের কামনার অঙ্গীকার। অকস্মাৎ একটি তীব্র স্নায়ু যন্ত্রনায় পানু চীৎকার করে ওঠে না—তারপর পানু সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে।

পদ্ম চেতনায় ফিরে আসে। রাজ্যের অন্ধকার যেন কালো জমাট কতকগুলো বিভৎস মুর্তির মত দেখায়।

আধো ঘুমে আধো জাগরনের মাঝে পানুর মনে হয় পৃথিবীতে আর কেউ নেই। যেন সংখ্যাহীন বিভীষিকার ছায়া ওকে তাড়া করছে। আরও উন্মত্তের মত ছুটে চলেছে। কিন্তু আর যে পারছে না। উঃ ক্লান্ত। কত ক্লান্ত। পানুর স্বপ্নের সেই বিভীষিকা গুলো বুঝি দু হাত দিয়ে পীষে ফেলবে। কিন্তু পানু আর পারছে না।

ঠিক সেই মুহুর্তেই বাঁকা পোলের পাশ দিয়ে কার ছায়া পলকের মধ্যে সরে যায়। পদ্ম শঙ্কিত হয়। পদ্মর মনে পড়ে যায় ও তিয়াসির মাতব্বরের মেয়ে। তার কাছে কোন সামাজিক অপরাধের ক্ষমা নেই। আর ধর্মান্ধ মানুষ কোনদিন বিশ্বাস করবে না ওদের এই কলুষহীন নিশীথ আলাপন।

তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করবে পদ্মই সন্ন্যাসীকে নিয়ে গিয়েছিলে ওর অতৃপ্ত কামনাকে চরিতার্থ করতে। এই উদ্বেগ আকুল মুহুর্তে এ কথাও মনে হল যে হয়ত তখন পদ্ম পানুর আসল চরিত্রটা প্রকাশ করে দিতে পারে। কিন্তু বদলে দুজনেরই লাঞ্ছনা। অথচ একটি তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্বন্ধে পদ্ম নিসন্দেহ। কারণ বাঁকা পোলের পাশ দিয়ে যে সরে গেল সে কোন অশরিরী নয়। কোন কৌতুহলী মানুষ। নানান ভয় ও আশঙ্কার তাড়নায় একটা দ্রুত সঞ্চারীণী হরিণীর মত পদ্ম বাঁকা পোল পার হয়ে মাঠের মাঝে মিলিয়ে যায়।

পরদিন অনেকগুলি উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির সামনে চোখ মেলে পানু। অনেক মানুষ। অনেক মুখ। প্রথমে সব ঝাপসা মনে হয়। তারপর

সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভোরের আবছা আঁধার যেমন প্রত্যুষের আলোয় হারিয়ে যায়। একে একে সবাইকে চিনতে পারে পান্নু। বেজ, নসীরাম, কিশুন। হেটকুলীর হু একজন আছে। ওই তো মাতব্বর ঈশ্বরী সিং। থম থমে মুখে বসে আছে ঈশ্বরী। একটা সন্দেহ যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক হেনে যায়। পান্নুর ভয় হয়, তাহলে কি? ভয় আর আশঙ্কায় চোখ বন্ধ করে পান্নু। তাহলে কি পদ্ম সব প্রকাশ করে দিয়েছে? পান্নুর আসল পরিচয়, ওদের নিশীথ অভিসারের কাহিনী, সব? এলো মেলো চিন্তা গুলো পান্নুর মাথার মধ্যে জট পাকায়। ঈশ্বরী পান্নুর শিয়রের কাছে বসে মৃত্যু কণ্ঠে ঈশ্বরী ডাকে—ঠাকুর

একটা দুরাগত আহ্বানের মত সে ডাক পান্নুর কানে পৌঁছায়। কিন্তু কাকে সম্বোধন করছে মাতব্বর? তবু পান্নুর মন অকারণে আশ্বস্ত হয়। ঈশ্বরীর কণ্ঠে উত্তাপের আভাস নেই। পান্নুর অন্তর পদ্মর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

ঈশ্বরী আবার ডাকে 'ঠাকুর'

এবার নিশ্চিত হয় পান্নু। পান্নুকেই নতুন নামে ডাকছে ঈশ্বরী। কিন্তু কেন?

আস্তে আস্তে চোখ মেলে ও। উদগ্রীব কণ্ঠে ঈশ্বরী শুধোয় কাল কি হয়েছিল ঠাকুর।'

পান্নু সব কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করে। কুয়াশায় অস্পষ্টতায় ঢাকা শীতের সকালের মত কতকগুলো স্মৃতি ভেসে ওঠে ওর চোখের সামনে। পদ্মর উচ্ছসিত কান্নার দুর্ব্বার কামনা আবেগকে সংহত করতে গিয়ে পান্নুর সম্বিৎ হারানো। তন্দ্রার ঘোরে সেই বিভৎস ছায়া মূর্তিগুলোর সঙ্গে লড়াই। তারপই একটা অপরিসীম ক্লান্তির ভারে এলিয়ে পড়া। কিন্তু কাল যেখান থেকে পান্নুকে উদ্ধার করল কে? পদ্ম?

'ঠাকুর' ঈশ্বরী আবার ডাকে। পাছে পান্নু আবার বেহুঁস হয়ে পড়ে সেই জন্য ওর চেতনাকে জীবিত রাখতে চায়।

কিন্তু কি জবাব দেবে পান্নু? পান্নুর রগত্নুটো টীপটীপ করে। অত রাত্রে অমন নির্জন স্থানে যাওয়ার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ হাতড়ায় মনের মধ্যে। তারপর একসময় পান্নুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'কাল আমার গুরুদেবের সাক্ষাৎও পেয়েছিলাম হে মাতব্বর। তেনার ডাক শুনল্যে যে সব ভুল্যে যাই।' পান্নু হাতজোড় করে গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম জানায়।

বিস্ফারিত চোখে সবাই পান্নুর ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

রেতের বেলায় অমন নির্জন জায়গায় গুরুদেব কোন পথে এল্যেন?' বেজ শুধোয়।

'বোধ হয় যোগ সাধনা কর‍্যে' নীলকণ্ঠ জবাব দেয়।

পান্নুর শরীরটা একবার শিহরিত হ'য়ে ওঠে। পরক্ষণে প্রশান্ত নির্বেদ হাসি হেসে পান্নু বলে 'লীলু ঠিকই বলছে। আমার গুরুদেব যোগ সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন। গাছ চালাতে জানতেন। আকাশ পথে আনাগোনা করতে পারতেন।'

'গুরুদেব কি একবার দেখা দিয়েই ছন্ন হয়্যে গেলেন?' অগাধ ঔৎসুক্যের সঙ্গে নসীরাম শুধোয়।

'তা কেনে, আমাকে ডাকলেন। সঙ্গ্যে কর‍্যে লিয়ে গেলেন। নানা রকমের রাজট হল্য। তারপর চল্যে গেলেন।' কথাগুলো অত্যন্ত সহজ ভাবে বলে পান্নু। যেন এ প্রায়দিনের ঘটনা। নগাইএর ছোট ঘরটা একজনের আনাগোনায় আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কেমন যেন ভ্যাপসা হ'য়ে উঠেছিল। পান্নু অস্থির বোধ করছিল। সেটা লক্ষ্য করে ঈশ্বরী বলে তরা থাম দেখি। অত বকাস না ঠাকুরকে। ঘরটি যে কামারশাল করে দিলি।' ছোটছেলেদের উদ্দেশে মমতা মেশানো সুরে বলে ঈশ্বরী, তরা সব যা দেখি বাপ, টুকুন 'বাসাত' আসত্যে দে। 'ইঠিনে' কি ছাতাপরবের মেলা লেগেছে?'

ওরা সব হুড় হুড় করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ঈশ্বরী পান্নুর

শিয়রে পরিপাটী করে বসে। তারপর বলে 'বেত্তান্ত'টি ভাল কর্য়ে বল ঠাকুর শুনি।'

বেজ, নসীরাম আর কিশুন মাতব্বরকে ঘিরে বসে। নীলকণ্ঠ এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

পান্নু চারদিকে তাকিয়ে ওদের আগ্রহের পরিমাণটি অনুমান করে নেয়। তারপর সুরু করে 'তুমরা সবাই তখুন লাচ দেখায় বিভোর। আমার মনটা কেমন যেন আকুলী বিকুলী করে উঠল। পেরথমে ভাবলম বুঝি নাচনীর মুখে কৃষ্ণ নাম শুন্যে মনটি ব্যকুল হল্য। মিন্তক ভাল কর্য়ো ঠাহর করতেই, বলল্যে পেত্যয় যাবে নাই মাতব্বর, কে যেন আসর থেকে হাতে ধর্য়ে টেন্যে কুলীতে নামালেক। আমি যেন আর লিজের বশে নাই। তারপর চেঠা-অচেঠার মাঝে বাঁকা পোল পেঁৗছলম। সিখেনে গুরুদেব সশরীরে দেখা দিলেন। (কথার মাঝেই পান্নু হাতদুটো কপালে ঠেকায় এবং দেখাদেখি অনেকেই) ঘুটঘুটি রাত। রাভচরা পাখী ডাকছে। কি ঠাণ্ডা বাসাত। মনে হল্য অঙ্গটি জমে যাবেন। (এমুন সময়—উত্তেজনায় পান্নু উঠে বসে)'।

উন্মুখ আগ্রহে সবাই পান্নুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওদের মুখে কথা সরে না।

'এমুন সময় চারিদিক আলায় ভর্য়ে গেল। যেন হাজারটা গ্যাসের বাতি জ্বলছেন। আমার চক্ষু দুটি ধাঁধাই গেলেক। বাবারে—আলায় আলা, তার মাঝে আমার গুরুদেব। (আবার কপালে হাত ঠেকায় পান্নু) আহা কি তেনার জ্যোতি। ব্যাসাম বেলার সুয্যির মতন। আর কি বা অঙ্গের সুবাস। চন্দনের লাখান। নানা রকম উপদেশ দিলেন। তারপর হঠাৎ ছন্ন হয়্যে গেলেন। আবার সেই ঘুটঘুটি অন্ধকার। রাতচরা পাখীর ডাক। আলাথেকে এক চটকে অন্ধকারে আসাটা সইতে লারলাম হে। চোক্ষু দুটি আবার ধাঁধাই গেলেক। আমি অচেঠা হয়্যে পড়লম। তারপর আর খেয়াল নাই।'

'আহা, আহা' পরান গদগদ হ'য়ে ওঠে। কোন কথা বলতে পারে না। বেজ আর নসীরাম হতবাক। ঈশ্বরী খানিক্ষণ নেশা-গ্রস্তের মত বুঁদ হ'য়ে বসে থাকে। নীলকণ্ঠর মুখে কোন পরিবর্ত্তন নেই।

'গুরুদেব কি এখুনও বেঁচ্যে আছেন ?' নীলকণ্ঠ শুধোয়।

'না, 'বেগত' হয়্যেছেন। হরিদ্বারে দেহরক্ষা কর্য্যেছেন পাঁচ বছর আগে।'

কিশুনের ঘোরটা সবে কেটেছে। 'সন্নাসীর সঙ্গে কি কি কথা হলেক।' ও শুধোয়।

'সি কথা বলবার লয় হে। উনারা হলেন অন্য জগতের জীব। আর আমরা হলম মর্ত্ত্যের মানুষ। উনাদের তুলনায় কীটানুকীট। জ্ঞানে অজ্ঞানে উনাদের সিচরনে কত অপরাধ কর্য্যেছি তার কি অন্ত আছে।'

পান্নুর তত্ত্ব কথায় সবাই মুগ্ধ হয়। আহা, এই তো যথার্থ সন্নাসীর মত কথা। কত বিনয় কত নম্রতা। এতটুকু অহমিকার চিহ্ন ও নেই। নেই আমিত্বের বড়াই। পান্নু নিজেও আশ্চর্য্য হয়। ঠিক এই সময় এই কথাগুলো কি করে ওর মুখে জোগাল পান্নু ভেবে পায় না। অথচ কথাগুলো খুবই অবস্থানুগ।

মুর্চ্ছিত হওয়ার পর আর কিছু মনে নাই পান্নুর। কে ওকে বাঁকা পোলের নির্জন যন্ত্রনা থেকে উদ্ধার করে এনেছে ? একটা আবছা স্বপ্নের মত পান্নুর মনে পড়ে। হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল। একটা উন্মত্ত আবেগের বন্যায় পান্নু হারিয়ে গেল। রাত্রির বিহ্বলতায় পদ্মকে কিছুই বলা হ'ল না। অপ্রকাশের বেদনায় দুর্ব্বার যন্ত্রনা গুলো পান্নুর বুকটাকে তোলপাড় করে তুলল আর পদ্ম হারিয়ে গেল অন্ধকারের অরণ্যে। ঠিক সেই মুহুর্ত্তেই একটা ছায়াশরীর বরা-ভয়ের আশ্বাস নিয়ে পান্নুর শিয়রে এসে দাঁড়াল। তারপর আর কিছু স্মরণ নেই।

কিন্তু কে সে? পান্নুর মনের মধ্যে একটা অভিসন্ধির ইশারা সহসা ঢেউ খেলে যায়।

'আচ্ছা মাতব্বর, আমি ত' অচেঠা হয়্যে গেলম। মিন্তুক আমাকে উখেন থেকে লিয়ে এলেক কে হে?'

'ও কাজটী লর্ত্তকীর। উ না থাকল্যে 'বেতাক' হত হে। তুমাকে বাঁকা পোলের কাছে পড়্যে থাকতে দেখ্যে উ একা তুমাকে কাঁধে কর্যে কুলী মুড়া তক্ লিয়ে এসে তারপর লোক জড় করে। তুমি তখুন বেহুঁস।'

নর্ত্তকী? কাজলী? পান্নু যেন চমকে ওঠে। কিন্তু অত রাত্রে কাজলী কি করতে গিয়েছিল বাঁকা পোলের ধারে? একটা অস্থিরতা গুমরে মরে পান্নুর বুকের মাঝে।

'সবই গুরুদেবের কেরপা 'পান্নু বলে' তা না হল্যে লর্ত্তকীর বাঁকা পোলের ধারে কি পেয়োজন?'

'ঠিকই বুলেছ সন্নাসী।' কিশুন বলে 'সি কথাটি আমি শুধাইছিলি লর্ত্তকীকে। সন্নাসীকে তুমার লেগে ফেরৎ পেলম ঠিক কথা, মিন্তুক অত রেতে উ বন বাদাড়ে তুমার কি পেয়োজন ছিল শুনি? তা সি বল্লেক উ কথা তুমি বুঝতে লারবে। আমি মাতব্বরকে বুলব।' কিশুনের কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা। কিশুন নাচনীর কথায় বেশ আহত হয়েছে বোঝা গেল। কিশুনকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে ঈশ্বরী।

'তার লেগে গোসা করিস না বাপ। মানলে শিব, না মানলে পাথর তুরা মাতব্বর কর্যেছিস বুলেই ত মাতব্বর। না হল্যে সেই ঈশ্বরী ভুমিজ। কুন গুরুতর কথা ত' মাতব্বরকেই আগে বলা দরকার। সি জন্যি তুকে বলি নাই।

কিশুনের মুখে হাসি ফোটে। হক কথা বলেছে মাতব্বর। তারা মানে বলেই ত' ঈশ্বরী তিয়াসির মাতব্বর। পরগণা চৌরাশির একটা মানীগুনী লোক নইলে কিসের কি?

পান্নু কিন্তু মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়। তাহ'লে কি কাজলীই সব

ব'লে দিয়েছে মাতব্বরের কাছে? পদ্মর সঙ্গে পান্নুর গোপন অভিসারের কথা? কিন্তু মাতব্বরের কণ্ঠে তো সেই বিশ্বাসের আভাস নেই। তাহলে কি মাতব্বর পান্নুর কথা বিশ্বাস করেনি? শুধু পান্নু কি জবাব দেয় তাই শুনবার জন্য সব জেনে শুনেও ছল করে ব'সে আছে? কিন্তু যদি তাই হয়? যদি মাতব্বর সব জেনে থাকে তাহ'লে? যদি মাতব্বর বুঝে থাকে যে এতক্ষণ গুরুদেবের দোহাই দিয়ে পান্নু যা বলেগেছে সব নির্জ্জলা মিথ্যে এবং একটা অপরাধকে ঢাকতে গিয়ে সে এতগুলো মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তাহ'লে? বারো বছর আগের সেই দশের মজলীশের কথা মনে পড়ল পান্নুর। সেখানে হাজার জনেব জনতার মাঝে ধিকৃত হয়েছিল পান্নু। সেখানে প্রতিটি মুখই মুখর হয়েছিল পান্নুর মায়ের কলঙ্ক ভাষণে। তিয়াসির লোকদের পান্নু চেনে। তাই ভয়ে পান্নুর চোখ দুটো বুজে আসে।

'নাচনী আমাকে সবই বলেছে সন্নাসী।' সব বলেছে? বিদ্যুৎপৃষ্টের মত উঠে বসে পান্নু। সব বলেছে, সব?

ব্যস্ত হয়ে ওঠে সবাই। আহাহা, 'উঠ না হে উঠ না। অসুখী শরীল তুমার।' সবাই ধরাধরি করে পান্নুকে শুইয়ে দেয়।

নাচনীর 'বেত্তান্তটি তাহল্যে তুমাকে শুনাই' ঈশ্বরী বলে 'কই হে বেজ একটা চুটী দাও ত।'

বেজ যত্ন করে শুকনো শালপাতায় ক্ষানিকটা গুঁড়ো তামাক দিয়ে চুটী বানিয়ে দেয়। বেশ আমেজ করে চুটীটায় টান দেয় মাতব্বর। তারপর বলে 'ই' কথাটি তুমরা কেউ এখুনও পর্য্যন্ত জান নাই হে। নাচনীও ভগমানের কেরপা পেয়েছে।

'সেকি?' সবাই বিস্ফারিত চোখে মাতব্বরের দিকে তাকিয়ে থাকে। নর্ত্তকীও ভগবানের কৃপা পেয়েছে। সেই নর্ত্তকী? ওদের কল্পনার শয্যাসঙ্গিনী? যাকে ওরা মনে মনে কামনা করেছে যার নাচে ওদের রক্তে তুফান তুলেছে, যার রঙ্গ রসে ওদের বুক উথালি পাথালি করেছে? হেই ভগবান, কোন পাপ নিও না।

চোখ বুজে খানিকটা চুটীর ধোঁয়া ছেড়ে মাতব্বর বলে 'কাল রাধার গান গাইতে গাইতে লত্তকীর রাধা ভাব হ'য়েছিল। সেই ঘোরে ঘর ছেড়্যে বেরাই গেছলেন মিস্তুক সন্নাসিকে দেখে উনারও চেঠা ফিরে আসে।' আশ্চর্য্য হয় সবাই। কি আশ্চর্য্য যোগাযোগ। ভগবানের কি বিচিত্র লীলা। ছুজনেই বিপদগ্রস্ত। অথচ ছুজনই ছুজনকে বিবদ মুক্ত করল।

কিন্তু ভগবানের কৃপা পেল নর্ত্তকী শতেক মনোহারিনী বিলাসিনি? হ'তেও পারে। ছলা কলা যাই করুক না কেন, ভগবানের নাম তো করছে। ভুল করে ভগবানের নাম করলেও পাপ নন হয়।

'যাই বল মাতব্বর কাকা, যোগাযোগটি ভগমানের লীলা ছাড়া আর কিছুই লয়' কিশুন বলে, ভেব্যে দেখ কেনে, যদি লত্তকী না থাকত তাহল্যে উ গহীন জঙ্গল থিকে সন্নাসী ঠাকুরকে কে উদ্ধার করত? আবার সন্নাসীর দেখা না পেল্যে নত্তকীকে অচেঠায় কুন বেঘোরে পড়তে হত কে জানে। বাঁকা পোলে তো খানা খন্দ আর 'লাকড়া' কি 'অধবাঘার' অভাব নাই।

ঠিক কথা। ঠিক কথা। এক বাক্যে সবাই স্বীকার করে। এটা ভগবানের বিচিত্র যোগাযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

'তুমি কি বল হে সন্নাসী?' 'পরাণ' সন্নাসীকে সাক্ষী মানে।

অত্যন্ত স্তিমিত কণ্ঠে পান্নু বলে 'তা বৈকি। লত্তকি হল্যে গো কৃষ্ণদাসী। রাতদিন ত ঠাকুরেরই গান করছে। তাঁর কৃপা পাওয়া বিচিত্র কি বল।'

কিন্তু তাই ব'লে নত্তকী ভগবানের কৃপা পেল? মনটা যেন সবার খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে। তাহলে তো মৌজ করে নাচনীর সঙ্গে ছুটো রসের গল্প করা যাবে না। ছু দণ্ড চোখ বুজে ওর কথা ভাবাও যাবে না। এখন থেকেই কেমন যেন একটা সন্ত্রাসের ভাব জাগছে। নাঃ এই ভগবান লোকটাই পৃথিবীটাকে আনন্দ শুন্য করে দেবে। লোকটার রসবোধ একদম নেই। যখন তখন যাকে

ইচ্ছে কৃপা করলেই হল? মুখটা ব্যাজার করে বসে থাকে কাশীনাথ।

'কি হল্য কাশীনাথ' পান্নু শুধোয়।

'না হে। ভাবছি তুনিয়াটায় হল্য কি।'

কেনে?

শেষে কিনা নত্তকীও ভগমানের কিরপা পেল যে কিনা কথায় বার্ত্তায়, চোখের ধারে মরদদের বুকে পাহাড়্যা আগুন জ্বেলে দিয়েছে।

পান্নু মৃদু হেসে বলে উয়াতে কি হল্য। দেহটা কিছুই লয় ভাই। অন্তরটাই সব। দেহ অশুচি হয়, অন্তর অশুচি হয় না। অন্তরটিকে ভক্তি দিয়ে শুদ্ধ কর্যে লিতে হয়। লত্তকীর অন্তরটি ভারী সাদা হে। সিখেনে কলঙ্কে কালি নাই।

নিজের কথাগুলো নিজের কাছেই নতুন শোনায় বাস্তবিক, মিথ্যা যে এত মনোমুগ্ধকর আগে তা জানা ছিল না। ঈশ্বরী ভাবে ভগবানের কি লীলা, একজন সর্বস্ব ত্যাগ করে বিরাগী হ'য়ে তাঁর সেবা লাভ করছে। আর একজন কলঙ্কের পঙ্কে আকণ্ঠ ডুবে তাঁর কৃপা লাভ করছে।

উঠোনের সজনে গাছটার ছায়াটার দিকে তাকিয়ে বেলা আন্দাজ করে মাতব্বর বলে 'চলহে, উঠ দেখি ইবারে, সন্ন্যাসীকে খানিক 'জিরাত্যে' দাও।'

কুলী মুড়ায় কার যেন সরব কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। পান্নু চকিত হয়ে জিগ্যেস করে 'কে কাঁদছে হে মাতব্বর? রাটি চিনা চিনা মালুম হছে।'

'ফুলমতী কাঁদছে। শশী কমলের মা'।

পান্নু উৎকণ্ঠায় উঠে বসে। কেনে, কিসের জন্যে একটা সন্দেহ যেন ঢেঁকির পাড়ের মত পান্নুর বুকের মধ্যে ধুক ধুক করে।

'শশীকমল কাল রেতের বেলায় কালিন্দী সায়রে ডুবে মর্যেছে। গেঁজেল মানুষ লেসা কর্যে দিশা ছিল নাই। পা হড়কায় পড়ে গেছেন।' অত্যন্ত সহজ ভাবে কথাগুলো বলে ঈশ্বরী। শশীকমলের

মৃত্যু গ্রামের পক্ষে এমন কিছু মারাত্মক ক্ষতির সূচনা করেনি। জীবন যাত্রা ব্যহত হবে না একটুও। শুধু হিসেবের খাতা থেকে একটা নাম বাদ পড়ে যাবে। অথচ যে সংসার সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিল শশীকমল সেখানে ভাঙ্গা হাল ছেঁড়া পালের নৌকো ঘুর্ণির আবর্তে পড়ে কূল খুঁজে পাবে না।

'উয়ার বহুটা খবরটি শুনে বেঁহুস হয়্যে পড়েছেন। এখনও চেঠাঁ ফিরে নাই।'

একটা অসহ্য কাঁপুনীতে পান্নুর সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে কুঁকড়ে ওঠে। সেটা লক্ষ্য করে মাতব্বর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে 'এই তুমার আবার কি হল্য হে?'

পান্নু জড়িত কণ্ঠে বলে 'কিছু হয় নাই হে। বেড়ে জাড় লাগছে, আমার গায়ের উপরে কম্বলটি চাপাই দিয়ে তুমরা ঘর যাও। বেলা হইছে অনেক।'

কম্বলটা পান্নুর গায়ে যত্ন করে জড়িয়ে দেয় পরাণ। ফুলমতীর উচ্চকিত চীৎকার বার বার কানে এসে লাগে। একটা অস্থির যন্ত্রণা বুকটাকে তোলপাড় করে।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তালু আর টাকরার সহযোগে একটা আক্ষেপের ধ্বনি সৃষ্টি করে কিশুন বলে 'হায়, হায় বউটাকে দিনেকের জন্যি সুখ দিল নাই লোকটা।'

কম্বলের ভেতর একটা অসহ্য স্নায়ু যন্ত্রণার মাঝে পান্নু ভাবে সত্যিই কি তাই?

কিন্তু শশীকমল তো ওর বউকে সুখ দিতেই চেয়েছিল। এবং তার সুখের জন্যই এতবড় মূল্য তাকে দিতে হয়েছে। বেঁচে থেকে তার বৌকে সুখ দেবার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। মরণে সে তাই সফল করে তুলতে চেয়েছে। শশীকমল ওর বউকে সুখ দিতেই চেয়েছিল। বেঁচে থাকলে হয়ত ওর সুখের কাঁটা হয়েই বেঁচে থাকতে হত, তাই ত নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। আর কোন বাধা নেই। সুখ, অথবা সুখের স্মৃতি। যদি সুখ চায়, তা'হলে

এক বিচ্ছেদ, এই বেদনা ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে জীবন গড়ে তুলতে হবে আবার নতুন করে জীবন গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে হবে। আর যদি সুখের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে চোখের জলই হবে সারাজীবনের সাথী। স্মৃতি সুখ দেয় না, দেয় শুধু বেদনা। কিন্তু কদম বাঁচুক। আবার নতুন জীবনের নতুন সাথীকে নিয়ে সে ঘর বাঁধুক। সোনালী স্বপ্নে ভরে তুলুক দিনগুলি। আর শশীকমল আকাশের বুকে রাত্রির হাসি হাসি তারা হ'য়ে তাই দেখবে। শশীকমল তো তাই চেয়েছিল।

দাওয়ায় বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছিল পদ্ম। গত রাত্রির দুঃসাহসিক অভিযানের কথাটা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু এ নিয়ে কোন গুঞ্জনের সূচনা হয়নি গাঁয়ে। সব কিছু ঢেকে গেছে পান্নু আর কাজলীর চাতুরীতে। কিন্তু পদ্ম অবাক হয় অত রাত্রিতে বাঁকাপোলে কাজলীর উপস্থিতিটা অত্যন্ত বিচিত্র। কিন্তু কাজলী কি পদ্মকে দেখেনি? নিশ্চয়ই দেখেছে? তাহ'লে এমন একটা মিথ্যার বেসাতিতে কি প্রয়োজন ছিল ওর? সে কি পান্নুকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য? না কি কাজলী পদ্মকে করুণা করেছে? কথাটা ভেবেই সর্ব্বাঙ্গ রী রী করে উঠল। শেষ পর্যন্ত নর্ত্তকীর করুণা আঁচল পেতে নিতে হ'ল পদ্মকে? এ গ্লানি যে মরলেও ফুরোবে না!

কাজলী কি পান্নুর প্রতি অনুরক্ত? সন্দেহ জাগে পান্নুর। কিন্তু না সে সন্দেহকে সত্য হ'তে দেবে না পান্নু।

তিয়াসীর সরল মানুষদের কাছে একটা অলীক কাহিনী প্রচার করে ওরা পান্নুকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেনি, নিজেদের লোকচক্ষুতে নিজেদের মর্য্যাদাকে আরও উন্নীত করেছে ও। পদ্ম এ কাহিনীর নেপথ্যচারিণী মাত্র। পান্নুর কথা অকথিতই রয়ে গেছে অথচ—

কিন্তু কাজলী কি সত্যিই পান্নুর প্রতি আসক্ত? ক্ষণপর্বের অনুমানটা খোঁচা দেয় পান্নুকে। তাই বা কি করে সম্ভব? পান্নু

সন্ন্যাসী। পান্নু পদ্মকেও ফিরিয়ে দিয়েছে। নারীর প্রতি মোহকে সে জয় করেছে। কাজলী সর্বজনভোগ্যা জনপদবধূ। ঘৃণ্য বার-বণিতা। নির্লজ্জ নর্ত্তকী। কিন্তু কেন গিয়েছিল কাজলী বাঁকা পোলের ধারে? পান্নু ভেবে কূল পায় না।

বেলা গড়িয়ে বিকেল হ'ল। শুকনো গাছের ডালে একটা ডাহুকী শীষ দিচ্ছে। জল পায়রাগুলো পদ্মবীজ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। পান্নু উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকে। সব মিথ্যে হয়ে গেছে আজ। মিথ্যে ওর যৌবনের সম্পদ সম্ভার, মিথ্যে ওর কাজল কালো চোখের তীব্র কটাক্ষ, উত্তুঙ্গ বক্ষের উল্লাস, ক্ষীণ কটী আর সুঠাম নিতম্বের সর্বনাশের সঙ্কেতে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে অনেক পুরুষের দীর্ঘশ্বাস অভিশপ্ত যৌবনের উত্তাপ। আজ যৌবনের সূর্য পশ্চিম গগনে। পদ্মর মনে হ'ল সে নিঃস্ব, রিক্ত। সব থেকেও তার আজ কিছু নেই।

যার সব কিছুই আছে তার মনে যদি কোনদিন শূন্যতা দেখা দেয় তার চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর কিছুই নেই। সাধ আছে অথচ সামর্থ্য নেই এই দুর্বিসহ অবস্থা যেন কারু জীবনে না আসে।

পদ্মর অকস্মাৎ নিজেকে অত্যন্ত একাকী ব'লে মনে হল। মনে হ'ল জীবনের সব আলো, সব বাতাস যেন ফুরিয়ে গেছে। একটা নিরন্ধ্র অন্ধকার পক্ষীকোটরে পদ্ম যেন চেতনা হারিয়ে ফেলেছে।

কাজলী কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি পদ্ম। আস্তে আস্তে পদ্মর কাঁধে হাত রাখে কাজলী।

পদ্ম চ'মকে ওঠে। 'কে?'

'আমি গো। ভয় পেল্যে নাকি?' কাজলীর কণ্ঠে আগের চাঞ্চল্য নেই।

'না, ভয় পাব কেনে। ভাক্যাই গেছলম।'

'হাতটি মেইয়া লোকের কি মরদ মানুষের ঠাহর করতে পার নাই বুঝি?'

'তা বা পারি নাই।' পরে একটু হেসে বলে 'কেমন করে

পারব বল, কেউ ত' কুনদিন ছোঁয় নাই।' পদ্ম ভেবেছিল এই কথা বল্লে হয়ত কাজলীর কাছে গতকাল রাত্রির ব্যাপারটার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। কিন্তু কাজলী সে ধার দিয়েও যায় না। ওর নিস্তরঙ্গ কণ্ঠে শুধু একটা আক্ষেপ ধ্বনিত হয় 'হায়, হায়, কি আফশোষের কথা। সিদিকে দেখ কেনে, আমি, সারা অঙ্গে এক সিকি জায়গাও বাদ দি নাই যিখেনে পুরুষের ছোঁয়া পেঁছায় নাই। মিস্তুক পুরুষের ভালবাসার লেগ্যে আমার মন আজও কাঙ্গাল। একটু থেমে কাজলী আবার বলে 'আচ্ছা পদ্ম আমার সঙ্গে 'ফুল' পাতাবি ?'

পদ্ম আশ্চর্য হয়। হঠাৎ এমন সখ কেন কাজলীর ?

পদ্ম ঘাড় ফিরিয়ে শুধোয় 'হঠাৎ এমন সখ' ? 'সখ লয়, সাধ পদ্ম, ফুল পাতাতে হয় সমানে সমানে। মিস্তুক তুমার আমার মাঝে ত' আসমান জমীনের ফারাক। তুমি মাতব্বরের বিটি, আমি নগরের নাগরী। মিস্তুক একদিকে মিল আছে। আমাদেব দুঃখ এক।'

'কে বল্লেক ?' পদ্ম ঝাঝিয়ে ওঠে 'মিছা কথা, কুন দুঃখু নাই আমার।'

কাজলী হাসে। দুঃখুকে কি চেপে রাখা যায় ভাই ? মন দিয়ে মন বুঝতে হয়। যার মনে যে দরদ সে অন্যের দরদ টের পায়।

পদ্ম এবার আর রাগ করে থাকতে পারে না।

'মরণ হোক তুমার।'

'আমর ছুঁড়ী লিয়াই করছে দেখ। সেই যে বলে না লিয়াই না পায় ত' ঘুঙ্গি নিয়ে জলকে যায়।'

'হুই দেখ, আমি কি লিয়াই করলাম ?'

'তুই ছুঁড়ী বেতাক লিয়াইয়া বটিস।'

ওদের অন্তরঙ্গতা নিবিড় হয়। সম্পর্ক তুমি থেকে তুইতে নেমে আসে।

'মরতে ত' চাই।' কাজলী বলে 'মিস্তুক যমরাজাও ত' পুরুষ মানুষ। ইহকালে পুরুষের কোল পেলম নাই সেই জ্বালায় মরতে যেয়্যে যমরাজার কোল পাবার সাধ আমার নাই।'

পদ্ম ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে বলে 'ফুল, তুমি ব্যথা পেলে ?'

'সুখ দুখের বোধ আমার নাই। হেদয়টি পাথর হয়্যে গেছেন।'

কাজলী চোখের কোণে জমে ওঠা একবিন্দু অশ্রু আঁচলে মুছে বলে 'ফুল আজ আমি ইখেন ছেড়ে চল্যে যাব'।

'সেকি ?' পদ্ম অবাক হয় 'আজই' ?

ঘাড় নাড়ে কাজলী। মাতব্বর গাড়ী ঠিক কর্যে দিয়েছে। সাঁঝের গোড়ায় গাড়ী ছাড়বেক। জোছনা রাত। ভোর রাতে পোঁছাব ভিন গাঁয়ে।

'এত তাড়া কিসের ?'

'কাজ ফুরাল্যে থেকে কি করব ভাই ? আমাকে যে খেটে খেতে হয়।'

'কাজ তো তুমার আগেই ফুর্‌যাইছে, এতদিন ত' তবু ছিলে ?'

'তুমাদের গ্যাঁটি বড় ভাল লেগেছিল। বড় মন বস্যেছিল।'

'মিস্তুক যাবে কুথাকে ?'

'সি ত' আমার জানার কথা লয়। সি জানবেক আমার রসিক। আমি শুধু জানি আমাকে যেতে হবেক। এখনও অনেক পথ বাকী।'

নর্ত্তকীর অনেক ছলা কলা। কখনও মুখে হাসি কখনও চোখে জল। হাজার পুরুষের মন পুড়িয়ে নর্ত্তকী। কিন্তু কাল রাতের ঘটনাটার কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না ওর কথায়। তা'হলে কি পদ্মকে ও দেখতে পায়নি ? পদ্ম কৌতুহলী হয়। খানিকটা সাহসও হয় পদ্মর মনে। এক সময় জিগ্যেস করে ফেলে পদ্ম।

ফুল, কাল নাকি তুমি একটা পুণ্যির কাজ করেছ ? ঈষৎ হেসে কাজলী বলে 'পুণ্যির কাজ ? না পাপের ?'

'পাপের কাজ কেনে হবেক ?'

'জানি না। মিস্তুক এই পাপের জন্যি ত' সেই শিকারীকে বাল্মিকী মুনি শাপ দিয়েছিলেন।'

পদ্মর বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে। তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে পদ্ম বলে 'সিটি আবার কি গো?'

'যাক, সি উপাখ্যানটি শুন্যে তুমার কাজ নাই। আর আমারও দেরী হয়্যে যাবেক।'

'তিয়াসির লোকের মুখে মুখে তুমার যশ। তুমি কাল রেতে সন্নাসীকে বাঁকা পুলের থেকে উদ্ধার করেছ।'

'বিষ পান কর্যে মহাদেব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। কলঙ্কের বিষ পান কর্যে আমারও সব্ব অঙ্গ নীল হয়্যে গেছে। সন্নাসীকে উদ্ধার করেছেন ভগবান। মিস্তুক লোকে যশ করছে আমার। সেই লজ্জায় আমি তুমাদের গাঁ ছেড়ে চল্যে যাচ্ছি ফুল!'

'কেনে?'

'সি কথাটি শুধায়ো না বুন।'

পদ্মও আর জিগ্যেস করতে ভরসা পায় না। এই জন্যই কি সব জানা নয়?

তবুও পদ্ম জিগ্যেস করে 'ভাবের ঘোরে তুমি নাকি কাল বাঁকা পোলে চল্যে গেছলে?'

কঠিন কণ্ঠে কাজলী বলে 'মিছা কথা। ভাবের ঘোরে লয়। অভাবের ঘোরে। আমার মনের মধ্যে একটা পাগল আছে। সে আমাকে ঘোড়ার মতন ছুট্যাই লিয়ে বেড়ায়। মিস্তুক আর কিছু তুমি শুধায়ো না।'

পদ্ম বিরত হয়। তুজনই তুজনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পদ্ম বোঝে কাজলী সবই দেখেছে। সবই জেনেছে। তাই সব কথা ও এড়িয়ে যেতে চায় আর সে শুধু পদ্মকে লজ্জার হাত থেকে নিস্কৃতি দেবার জন্য। তাই এই মুহূর্তে কাজলীকে খুব ভাল লাগে পদ্মর। পদ্মর মনে হয় কাজলী ওর ব্যথার ব্যথী। বেদনার সহচরী।

ডাহুকীটা উড়ে গেছে অনেক্ষন। আল্‌তো বাতাসে পুকুরের জলে কাঁপন লাগছে।

খানিক পরে কাজলী বলে 'আচ্ছা ফুল কথা শুধাব? বল রাগ করবে নাই?'

পদ্ম ভয়ে ভয়ে বলে 'কি কথা?'

'বাঁশি শুন্যে কি মন দেওয়া যায়?'

পদ্ম সহসা জবাব দিতে পারে না। একটা লজ্জার বেড়া আগুন যেন ওকে ঘিরে ধরে। সেটা লক্ষ্য করে কাজলী আবার বলে 'ভয় নাই ফুল। যা তুমি ভাবছ সে কথা আমি শুধাব নাই। রাতের লজ্জা রাতের অন্ধকারেই ঢাকা থাক। তাকে দিনের আলোয় টেনে লাভ কি? মিস্তক শুধাই তুমাকে, মাতব্বরের বিটি তুমি, এতদিন বিয়া কর নাই কেনে?'

পদ্ম নতদৃষ্টিতে দাওয়ায় দাগ টানতে টানতে বলে 'মনের মানুষ পেলম নাই বলে।'

পদ্ম হেসে বলে 'বড় উঁচু লজর তোমার। মিস্তক ভুলে যদি বা, ভাদরের ভরা নদীতে লোক ডুব দিয়ে সিনান করে, চৈতের নদীতে ধূ ধূ বালী, সিখেনে কেউ পাও ধোয় না।'

'আমি ত ফুল লদী লই। আমি যে পানা পুকুর। সিখেনে কে আসবেক ডুব্যে মরতে?'

'তুমি লদী লও। পুকুর লও। তুমি অগ্নি। তুমার মাঝে শান্তি নাই। আছে জ্বালা। তুমি সাঞ্জিবনী দিতে পারবে নাই। মানুষকে বাঁচানো তুমার এক্তিয়ারের বাইরে। তুমার ছোঁয়ায় শুধু মিত্যু। তাই এখনও বলি, ইবার তুমি ঘর বাঁধো।'

'কার সঙ্গে?'

'তুমার মনের মানুষের সঙ্গে। তুমার মনের মানুষ কে আমি তা জানি।'

'মনের মানুষ কি অত সহজে মেলে ফুল? তার জন্য অনেক সাধনা করতে হয়।'

'সাধনা কি তুমি কম করেয়েছ? যৈবন কালটি তুমি মনের মানুষের পথ চেয়্যে কাটাই দিয়েছ।'

'মিস্তুক তাও ত' পেলম নাই। তুমি ত' অনেক পথে পথে ঘুরেছ, গাঁয়ে গাঁয়ে কত মানুষের সঙ্গে তুমার পরিচয় হুয়্যেছ। কত লোক মনের দুয়ার খুল্যে দিয়েছে তুমার সামনে। মিস্তুক মনের মানুষের সন্ধান পেয়েছ কি?'

'পেয়েছি ভাই। তুমাদের গেরামেই পেয়্যেছি সেই পরশ মনি। ধূলার আড়ালে লুক্যাইছিল। তাকে ধূয়ে মুছে আঁচলে বেঁধেছি।'

'কে সে?'

'সময় হল্যেই জানতে পারবে। পদ্ম, যিদিন তুমাকে পেরথম দেখলম, সিদিনই ভালবেসে ফেললম। আমি যে ভালবাসার কাঙ্গাল। পুরুষ মানুষ হল্যে বোধ করি তুমাকে পাবার জন্যি তপস্যা করতাম। তাই বলছি ফুল, যৈবন জেবনে একবারই আসে, তাকে কানাকড়িতে বিকাই দিও না।'

পদ্মর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

পানু কি চায় পদ্ম তা জানে না। পদ্ম জানে না পানুর হৃদয়ে তার কোন স্থান আছে কি না। পানু সন্নাসী। তার ব্রতভ্রষ্ট করবে সে কোন সাহসে।

কিন্তু সে কথা কাজলীকে বলা যায় না। কাজলী পদ্মর কাছে আরও ঘন হয়ে বসে। পদ্মর মুখটা নিজের বুকের কাছে টেনে এনে ওর মাথার চুলে আঙ্গুল দিয়ে বিলি করতে করতে কাজলী বলে 'মেইয়্যা মানুষের জেবন ঘর বাঁধবার জন্যি। কিন্তু আমার কপাল পোড়া তাই আমার অদৃষ্টে না জুটল স্বামি, না সংসার, না ঘর। মিস্তুক তুমি তো মানী লোকের বিটি, জেবনটি গাঙ্গের জলে ভাসাই দিছ কেনে?

পদ্ম জবাব দিতে পারে না। পদ্ম কাজলীর বুকের মধ্যে মুখ লুকোয়। ওর বুকের মাঝে যেন একটা অদ্ভুত আরাম আর স্নেহের স্বচ্ছন্দ খুঁজে পায়। পদ্মর কেমন যেন মনে হয় একটা সমস্থের

ঝরণা ধারা সারাক্ষন নিস্থত হ'চ্ছে ওর বুক থেকে। যা বাইরে থেকে ঠাহর করা যায় না। পদ্মর কাঁদতে ইচ্ছা করে।

কাজলী আবার বলে, 'নাচনীর সম্বল শুধু পথ আর পথের ধারের মানুষ। কেউ আদর করে কাছে ডাকে, কেউ ঘেন্নার সরাই দেয় দূরে। মনের তিয়াস মিটে কই? তাই বলি ফুল, ঘর বাঁধো। সুখী হও। সংসাবী হও।'

পদ্মর দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু কাজলীর হাতের উপর পড়ে। কাজলী হাত সরিয়ে নেয় না। ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, নেই কোন আত্মীয়তার বন্ধন। তবু মনে হল ওর শুভ কামনায় কোথাও একটুকু ফাঁকি নেই। নিজের সারা জীবনের অতৃপ্তিতে ও আরেক-জনের পূর্ণতার মধ্যে খুঁজে খুঁজে পেতে চায় নিজেকে। ঈর্ষা নেই একটুকুও। আজ অপরের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার নিজের আনন্দ।

সেই জোতদারটির কথা মনে পড়ে কাজলীর। যার বিয়েতে কাজলীর নাচের বায়না হ'য়েছিল। বিয়ের রাতে ওর নাচ দেখে বেসামাল হয়ে গিয়েছিল জোতদারটি। নতুন বৌকে ছেড়ে চ'লে এসেছিল কাজলীর কাছে। ওর নজর দেখেই বুঝেছিল কাজলী ও কি চায়। জোতদারকে ঘর থেকে তাড়ায়নি। আদর করে পার্টি পেতে বসিয়েছিল। তারপর বলেছিল 'কি জন্যি এসেছ তুমি?'

'নাচনীর কাছে লোকে কি জন্যি আসে?' 'আসে নাচ দেখতে গান শুনতে। তা আমার বায়না ত' ফুরাইছে। আজ আবার কি দরকার?'

'কি চাই সি কি তুমি জান না?' আবেগের সঙ্গে বলে জোতদার। তবুও কঠিন হয়নি কাজলী। মৃদু হেসে বলেছিল 'জোতদার, লতুন বিয়ার করেছ। বউএর কাছে যাও। বেচারী পিতিক্ষা কর‍্যে বসে আছে।

জোতদার সাহসে চঞ্চল হয়। 'সি ত' থাকবেকই। জন্ম জন্ম অপিক্ষা কর‍্যে থাকবে। তার লেগেই ত'

বিয়া করেছি। কাজলীর রাগ হয় শুনে। কিন্তু বিবাহিতদের রীতিনীতি কিছু জানা নেই তাই জবাব দিতে পারে না। আগের কথাটা শেষ করে জোতদার বলে 'মিস্তক নাচনী, তুমি চল্যে গেলে তুমাকে আর পাওয়া যাবেকনি।' শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল কাজলী। ও, মূলের উপর উপরি। 'আমার যা আছে সবই তো আছে তুমার লতুন বৌএর কাছে তবে আমার কাছে এসেছ কেনে ?'

'না, নাচনীদের কাছে যা আঁছে বৌএর কাছে তা থাকে না। লতুন বউ কাদার তাল। তাকে যেমন খুসি গড়া যায় হাতে ধার আসে না। মিস্তক, তুমি ছুরীর ধার। হাতে নিয়ে লুফালুফি করল্যে হাত কাটে। মিস্তক তাতে আরাম আছে। তাছাড়া ঘরেব বউ ত' ঘরেই রইল।'

জোতদারের ইশারা বোঝে কাজলী। তবুও নির্বোধের মত বলে 'জোতদার, তুমাদের ত' দু তিনটি বিয়া করা চলে।'

'তা চলে বৈকি।'

'তাহল্যে আমাকে বিয়া কর কেনে ? চেরদিন তুমারই থাকব ?'

শিউরে ওঠে জোতদার এই অসম্ভব কথা। নাচনীকে বিয়া ? কাজলী কি পাগল হয়েছে !

'কি হইছে তাতে ? নাচনী কি মেইয়া মান্নষ লয় ?'

'না। নাচনী নাচনীই। তার সঙ্গে দুদিন ফূর্তি করা চলে। বিয়া করা চলে নাই। ঘরের বৌএর সঙ্গে আর যাই হোক ফূর্তি করা চলে না'।

হঠাৎ খুন চড়ে যায় কাজলীর মাথায়। চীৎকার করে ওঠে কাজলী চল্যে যাও তুমি ইখেন থিকে। বেরাই যাও।'

চীৎকার শুনে লোক জমে গিয়েছিল। জোতদার বুঝিয়েছিল পাওনা কড়ির গোলমালের জন্যই এই চেঁচামেচি। সত্যি কথা ফাঁস করে দেয়নি কাজলী। কারণ কাজলী জানত কেউ তাকে বিশাস উরবে না। কেউ বিশ্বাস করবে না যে ঘরে নতুন বৌকে

ছেড়ে নাছনীর টানে বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু জোতদার প্রতিশোধ নিতে ছাড়েনি। চারিদিকে রটিয়ে দিয়েছিল নাচনী বিষকন্যা। ওর নজরে বিষ আছে।

কিন্তু তবুও, কাজলী ভাবে, পুরুষ মানুষকে সে ঘৃণা করতে পারে কই ?

আর একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। গ্রামান্তরে যাত্রা করবে কাজলী। পথের ধারে দুদিনের বসতি তুলে দিয়ে আবার নতুন ঠিকানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। দুদিনের নৃত্য গীতের আনন্দে ভরা দিনগুলি শেষ হ'য়ে গেল। কাজলীর সঙ্গে পদ্মর পরিচয় দুদিনের। তবু মনের অন্তস্থলে একটা দুঃখ অনুভব করল পদ্ম। স্বজন বিচ্ছেদের দুঃখ। দুজনেরই হৃদয়ের তারগুলো একই সুরে বাঁধা তাই একই দুঃখ সঞ্চারিত হ'ল কাজলীর হৃদয়েও। কাজলীর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল. টন টন করে উঠল বুকটা আসন্ন বিদায়ের উন্মুখ মুহূর্তে।

'ফুল, আবার কবে দেখা হবেক ?' পদ্ম শুধোয়।

'বেঁচে থাকল্যে আবার দেখা হবেক বুন। পৃথিবি অনেক বড়। কুন 'ঠিনে' না কুন ঠিনে দেখা হবেকই। অনেক জ্বালা লেগে আমার হেদয়টি ফালা ফালা হয়্যে গেছে, সেই ছেঁড়া হেদয়টি যে রেখ্যে গেলম তুমাদের গাঁয়ে। তুমাদের গাঁয়ে আমাকে ফিরে ফিরে আসত্যে হবেক। মুখে একটা প্রশান্ত হাসি ফুটিয়ে কাজলী বলে, 'ইবার তবে আসি ফুল ?'

'দাঁড়াও' পদ্ম মাথা নুইয়ে প্রণাম করতে যায় কাজলীকে। কাজলী শশব্যস্ত হয়ে সরে যায়। 'উকি করছ বুন, আমার পাপের বোঝা বাড়ায়ো না। আশিব্বাদ ত' আদরই রইল তুমার উপরে। তুমাকে যে আমি ভালবেস্যেছি……কথাগুলো বলতে বলতে গলাটা ভারী হয়ে আসে কাজলীর। চোখ দুটো ভরে আসে জলে। সস্নেহে পদ্মকে বুকের কাছে চেপে ধরে কাজলী বলে 'নিজেকে ঠকায়ো না বুন। তাহল্যেই সুখী হব।

'নাম কি বেচবার জিনিষ? তুমিই বল না হে নসীরাম। মিস্তুক করব কি? পোড়া পেটের জন্যি ভগবানের নামের বেসাতি করত্যে হয়। আর নাম কি শুকনা বিক্রী হয়? লোকে মুলেব উপরে উপরি চায়। তাই ত' সঙ্গে নত্তকী।'

বিদায়ের প্রাক্কালে গ্রামের লোকদের সঙ্গে আলাপ করছিল কানুদাস। এবারে তিয়াসির মানুষদের সঙ্গে সোহার্দ্দটা বাস্তবিকই নিবিড় হ'য়েছে। কোন গ্রামেই একটানা এতদিন থাকেনি। এটা মরসুমের শেষ। হাতে অঘ্রাণ সময়। তাছাড়া কাজলীর মেজাজটাও ভাল নেই! কি যে হয়েছে কাজলীর—কানুদাস ভেবে পায় না। মেয়েদের কোনদিনই বুঝতে পারেনি কানুদাস রাইকিশোরীকেও না কাজলীকেও না।

পোটলা পুটলাগুলো দাওয়ায় বার করে রাখে নসীরাম। খোল কর্তাল আব কাজলীর নাচের সাজ।

'ঠিক করো দেখ্যে লাও হে কানুদাস। কিছু পড়েটড়ে রইল নাকি।'

কানুদাস দাওয়ার দিকে না তাকিয়েই বলে 'মিস্তুক একটি জিনিষ ত' পড়েই রইল ভাই! সিটি ত লিয়ে যেতে লারছি।

লক্ষ্মীরাম তটস্থ হয়। সে কি? ও ভাল করে দেখে এসেছে ঘরের মধ্যে কোন জিনিষই পড়ে নেই। সব বেঁধে দিয়েছে লক্ষ্মীরাম। কানুদাসেব চুড়ো বাঁধা কাঠেব চিরুণীটা পর্য্যন্ত। তাহলে কি কিছু চুরী টুরী গেল নাকি?

'ভয় পেও না ভাই। ওসব লয়। সংসারে ব্যবহারের কুন জিনিষ লয়। আমার মনটি পড়ো রইল তুমাদের কাছে।' গুন গুন করে গানের একটা কলী ভাঁজে কানু দাস—

লোতুন বন্ধু হে, আমার মনটি ফেলে
গেলাম তুমার ঠাঁয়ে
দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই
কুথাও আমার ঠিকানা নাই
রাঙ্গামাটীর পথের ধূলা মাখি সারা গায়ে

নটবরের মন বড় সহজেই আর্দ্র হয়। চোখে জল আসে। ঘন ঘন চোখ মোছে নটবর।

'যাই বল নটবর তুমাদের গেরামটি বড় ভাল হে। আহা।'

নসীরাম অত্যন্ত চতুর। কথার মারপ্যাঁচে ভোলবার লোক নয়। কানুদাসের সঙ্গে বকুল নগরের হাটে দরকষাকষিটা মনে পড়ে যায়। 'কানুদাস, তুমরা ঝুমুর ওয়ালা। তুমাদের মুখে মধু মাখান। তাই সব গেরামই তুমাদের কাছে সবার সেরা গেরাম।'

কানুদাস একটু অপ্রতিভ হয়। 'হক কথা। সব জায়গায় একই কথা বলতে হয়। না হল্যে যে ব্যবসা চলে না। মিস্তক মন ভুলানো কথা বলি বল্যে কি মন বল্যে কুনো বস্তু নাই? আছে হে আছে। তুমাদের গেরামটি সত্যি আমার মন ভুলাইছে। আমি ভাই বাউল মানুষ। ঘর ছাড়া। সংসার ছাড়া। আমার চোখে রাঙ্গামাটীর কাজল। যিখেনে দূর টীলার মাঝখানে লাল মাটীর পথ শেষ হয়েছে সেই অজানা দেশ আমাকে হাতছানি দেয়। শালফুলের গন্ধে বাসাত যখন ম' ম' করে, আমার খেপা মনটিও তখন ময়ূরের মতন পেখম তুলে নেত্য করে। পলাশে পলাশে যখন মাঠে মাঠে আগুন জ্বলে আমার অন্তরেও তখন তার আঁচ এসে লাগে। মানুষের শরীলে ভগবানের সব চেয়ে ডাগর আশিব্বাদটির নাম চক্ষু। যার চক্ষু আছে, তার সব আছে। চক্ষু ছুটিকে দেখতে শিখাতে হয়। দেখতে জানলে যা দেখবে সব ভাল লাগবেক। আর শুধু কি দেখা? চক্ষু দিয়ে হেন কম্ম নাই যা তুমি না করতে পারো। চোখ দিয়ে দেখা, চোখ দিয়ে শুনা, চোখ দিয়ে আস্বাদ করা। সেই সাতরাজার ধন পরম রতন চক্ষু দিয়ে আমি তুমাদের আস্বাদ করে্যছি ভাই। তাই ত' ই কথাটি এত জোর করে বলতে পারলম? তা না হল্যে কি জোর করে্য বলা যায় তুমাদিগকে ভাল লেগেছে?'

কানুদাসের কথাগুলি তুর্বোধ্য ঠেকে ওদের কাছে। এসব তত্ত্বকথা ওরা বোঝে না বুঝতে চায় না। এদের জীবনে কোন চড়াই

উতরাই নেই। গতিমন্থর গরুরগাড়ীর মতই সহজ, স্বচ্ছন্দ। প্রয়োজন নেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাই অভাবের বিড়ম্বনাও নেই। বালক বেলায় গোঠালীতে দিন কাটে। তারপর কৈশোরের চাপল্য শেষ হ'য়ে যৌবনের ঢল নামে। চোখে রঙ্গ লাগে। ভিন গাঁ থেকে বিয়ে করে আনে। ডাগর ডাগর চোখ। হাতে বাজু, কোমরে বিছে, গলায় হাঁসুলী শ্যামলা বউ। জীবন যেন স্বচ্ছন্দ বাতাসে পাল তুলে তর তর করে এগিয়ে চলে ময়ূরপঙ্খী নাওএর মত।

কানুদাস ছিলিমে দুটো টান দিয়ে ছিলিমটা সোজা বাড়িয়ে দেয় নসীরামের দিকে। ছিলিমটাতে মুখ ঠেকাবার সময় মনে প'ড়ে যায় শশীকমলের কথা। আহা বোখারে মারা গেল লোকটা। ঘরে ডাগর বৌ।

'কানুদাস তুমাদের ঘর কুন ঠিনে হে ? নটবর শুধোয়।

কানুদাস হেসে বলে 'কেনে ? ঘরের সম্বাদে পেয়োজন কি হে ? তুমার ঘর কি আমার ঘর লয় ?

'সত্যি কথাটি বল কেনে। তুমার ঘরটি কুন্ ঠেঁয়ে ?

বিবাগীর কি ঘরের ঠিকানা আছে ? সারা দুনিয়াই আমার ঘর ?

'তবে তুমার নত্তকীও কি বিবাগী ?'

'তা কেনে। নত্তকীর সঙ্গে আমার কি সম্পক্ক ?

'কুন সম্পক্ক নাই ?

'তা আছে বৈকি। বনের সঙ্গে হরিণীর যা সম্পক্ক, আকাশের সঙ্গে পাখীর।

ছিলেমে টান দিয়ে একটু নেশা মত হয়েছিল নসীরামের। চোখ দুটো নেশাতে বুজে আসছিল। হঠাৎ এক সময় নসীরামের মনে হয় ও বোধহয় আলোচনা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। 'তুমরা ইখেনেই থেকে যাও কেনে হে ?' নসীরাম বলে।

কন্নুদাস হাসে 'তুমরা বড় সরল লোক হে। মিস্তুক আমাদের মন বসবেক নাই। অবস্থাটি হবেক সেই সোনার শিকলে বাঁধা

পিঞ্জরের পাখীর মতন। তুদিন বাদেই আমার মন উড়ু উড়ু করবেক। তখন চল মুসাফির বাঁধ গঁঠরিয়া। পথের ডাক এড়ান বড় কঠিন। সে যে নিজের ডাকের মতন। যেজন বাইরের আস্বাদ পেয়েছে সেকি ঘরে থাকতে পারে? রাধা কি পেরেছিলেন শ্যামের বাঁশি শুনে ঘরে রইতে?

'আহা' গদগদ স্বরে নটবর বলে কানুদাস তুমার কথাগুলি বড় মিঠা হে।'

কানুদাস দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে 'ভগবান মুখ দিয়েছেন মিষ্টি কথা কইবার জন্যি। গাল দিবার জন্যি লয়। তা মিষ্টি কথা কইতে ত' আর পয়সা লাগেনা। সিখেনে কঞ্জুস হয়্যে লাভ কি?'

'তা বৈ কি। তা বৈ কি কানুদাসের বাক চাতুর্যে ওরা সবাই মুগ্ধ হয়। কানুদাস কথার ব্যাপারী। কানুদাস মাত্র কয়েকদিনের স্বল্প পরিচয়ে সবাইকে আপন করে নিয়েছে। ওরা যাযাবর পাখীর জাত। এক জায়গায় স্থিতি নেই। তবু যে কটা দিন ওরা কাটিয়ে গেল এই গাঁয়ে সেই দিনগুলিই এবা জমিয়ে রাখবে জীর্ণ হিসেবের খাতায় উদ্বৃত্ত সম্পদের মতই।

কিছুক্ষণ পরে কাজলী ফেরে। আশ্চর্য্য। কাজলীর আগেকার সেই চাঞ্চল্য, সেই পরিহাসপ্রিয়তা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কাজলী যেন ক্লান্ত। ওর সব আনন্দ, সব উজ্জ্বলতা যেন অবসিত হ'য়ে গেছে। কাজলীর চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্তির কাজল মাখানো। দাওয়ার উপরে স্তুপাকার জিনিষপত্রগুলো দেখে কাজলী শুধোয়' 'রসিক, সব গুছানো হয়্যে গেছে?'

রহস্য করে বলে কানুদাস সব গুছান হয়্যে গেছে। খেয়া পারের ঘাটে দাঁড়াই আছি। পারাণীর কড়িটুকু ফেল্লেই হয়।'

এই অপরিসীম ক্লান্তির মাঝেও কানুদাসের রসিকতার জবাব দেবার লোভটুকু সম্বরণ করতে পারে না কাজলী 'তুমি যে নাওএর মালিক গো। মালিক কি আর বৈঠা ধরতে পারে। পারাণীর মাঝি কৈ?'

'একদিন না হয় আমিই মাঝি হ'লম। কেনে আমাকে কি মনে ধরছে নাই ?'

'আমার তাতে আসাধ কিসের রসিক ? মিন্তুক হাল ধরার ক্ষেমতা নাই তুমার বুড়া হাড়ে। শেষে মাঝ গাঙ্গে যেয়ে তরী ডুবাবে।'

বাহবা দিয়ে নসীরাম বলে' ঠিক বলেছ লওকী। আহাহা, একেবারে মুখের মতন। লাও হে, কথার ব্যাপারী ইবার কি জুবাব দিবে দাও।' কানুদাসের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচায় নসীরাম।

কানুদাস হার মানে। না, বলবার কিছু নেই। 'তবে কিনা লত্তকীর সঙ্গে ডুবে মরাও আরাম। কানুদাস দাড়ীতে হাত বুলোয়।

'আহারে কাজলী খোঁচা দিয়ে বলে 'সি আরাম ত' দুজনার লয় গো। একাই তুমার। কারও কাছে ওষুধ, কারো কাছে বিষ। আবার কারো কাছে যা আরাম কারো কাছে তা জ্বালা।' বলতে বলতে কাজলী পাশের ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে কাকে যেন বলে কই হল তুমার ? আ গেল যা, তুয়ার ঠেসাই ফুলশয্যার কন্যার মতন বসে আছে দেখ। বলি এত লাজ কিসের ? লত্তকী ত আর রাক্ষসী নয়।'

হাতে একটা পুঁটুলী নিয়ে কেমন যেন জড়সড় হয়ে বাইরে বেরোয় নগাই। এতক্ষণ ও লজ্জায় বেরোতে পারেনি।

নগাইকে দেখে নটবর অবাক হয়ে জিগ্যেস করে হেই ? তু কুথা চল্লিরে ?

নগাই মেয়ে মানুষের মত শরমে রাঙ্গা হয়ে চোখ নীচু করে জবাব দেয় 'আমিও চল্লম লত্তকীদের সঙ্গে ?'

'মিন্তুক যাবি কুথাকে ?'

'সি জানি না। লত্তকী যিখেনে লিয়ে যাবেক'

নটবরের প্রায় মুখের গোড়ায় এসে গিয়েছিল কথাটা 'বাপ হে, ভিতরে ভিতরে এত ?' অন্য সময় হ'লে বলেই ফেলত। কিন্তু এখন ত সংযত করে নিজেকে। আর কিছু বলা চলবে না

কাজলীকে। ভাবাও চলবে না। ভগমানের কৃপা পেয়েছে ও। নত্তকী এখন আর সাধারণ নাচনী নয়। কোন শাপভ্রষ্টা অপ্সরী। ধন্য তিয়াসির অধিবাসীরা, এ জন্মের সীমান্তেই এমন একজন পুণ্য শ্লোক নারীর সাহচর্য্য পেয়েছ। সুতরাং আর নত্তকী নয়। আর কাজলীকে কেন্দ্র করে রাত্রির গভীরে দেখা চলবে না কোন মনোরম সুখ স্বপ্ন। কাজলীকে নিয়ে আর কোন রসালো গল্প জমে উঠবে না কোনদিন। দাঁতের মাছে পয়সা রেখে হাতছানি দেওয়া চলবে না আর।

এই সময়ে হঠাৎ নটবরের মনে পড়ল মাত্র এই সেদিন নাচের আসরে ও কপালে একটা আধুলী সেঁটে নাচনীকে ইসারা করেছিল এবং নাচনী কপালে মুখ ঠেকিয়ে সেটা তুলে নিয়ে গিয়েছিল? এই ঘটনাটা মনে পড়ায় শঙ্কিত হল নটবর এবং ভাবল এক সময়ে কাজলীর কাছে ওর ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন।

কাজলী ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ওব পা দুটো জড়িয়ে ধরে নটবরই। কাজলী অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে। প্রথমে মুহূর্ত্তের জন্য ও বিমূঢ় হয়ে যায় তারপর সম্বিৎ ফিরতেই সঙ্কোচে একটুকু হ'য়ে যায়। 'ছিঃ ছিঃ, হে ভগবান। ইয়াতে যে আমার অপরাধ হবেক।'

নটবর তবুও পা ছাড়ে না। 'অপরাধ তুমার' লয় অপরাধ আমাদের। না জেন্যে কত অপরাধ করেছি।'

কাজলী সুধোয় 'কি না জেন্যে?'

চম্পাই সঙ্কুচিত হয়ে বলে 'আমারা সব জেন্যেছি।'

কাজলী বিস্মিত হয় 'কি জেনেছ?'

জেন্যেছি যে তুমি ভগবানের কেরপা পেয়্যেছ। হঠাৎ যেন সব গুলিয়ে যায় কাজলীর তারপর অকস্মাৎ মনে পড়ে এটা গত রাত্রির ঘটনার জের। হায়রে মানুষ। কাজলীর হাসি পায়। এই ত সেদিনও এরা ওর পিছনে ঘুর ঘুর করেছে। ইশারা করেছে। শীষ দিয়েছে। আর আজ? একমুঠো ধর্মের ধুলো ছুঁড়ে কাজলী এদের

অন্ধ করে দিয়েছে। তবুও ভালই লাগে কাজলীর। এই মিথ্যা-চারটুকু দিয়ে সে শুধু সন্ন্যাসীর পদ্মর কলঙ্ক ঢেকে দেয়নি, নিজের ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবনকেও মহীয়ান ক'রেছে।

এবার নিসংশয়ে দেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় কাজলী।

'অজ্ঞানে অপরাধ করল্যে কুন পাপ লাগে না। মানুষ অতি মূঢ় পেরাণী।

সবাই সায় দেয় 'অতি মূঢ়, অতি মূঢ়'।

'না জেনে' ত কত পাপই করে মানুষ। ভগবান সব ক্ষমা করেন।'

আহা। সবাই আশ্বস্ত হয়।

কাজলী আবার বলে 'মানুষ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর সব যুগে অপরাধ করেছে। কলি যুগেও করবেক ইয়াতে আর আশ্চর্যির কি? রামচন্দ্রকেও মানুষের কাছে কষ্ট পেতে হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ লোক নিন্দার হাত থিকে 'পরিত্তান' পান নাই। আমি অতি অধম পেরাণী। 'বলতে বলতে অদম্য হাসি পায় কাজলীর। হাসিটা সামলে ঝটিতে কানুদাস আর নগাইয়ের কাছে গিয়ে বলে 'কই হল্যে'।

কানুদাস অবাক হয়। গাড়ীতে সব জিনিষপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন শুধু কাজলী গাড়ীতে চড়ে বসার অপেক্ষা। আর ও কি না এমন ভাব করছে যে ও তৈরী, বিলম্ব শুধু নাগাই আর কানুদাসের জন্য। ওরা গাড়ীতে চড়ে বসে। কানুদাস বসে গাড়োয়ানের পাশে। প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে। নগাই আর কাজলী মুখোমুখি বসে। নগাই কাজলীর মুখের পানে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষে। চির বিমুগ্ধ, চির বিস্মিত দৃষ্টি। কাজলী গুনগুন করে গান ধরে

মরম সখীরে এই পিরীতির রীতি বুঝা দায়।
এই পিরীতি জগতকে হাসায়
আর জগতকে কাঁদায়
এই পিরীতির রীতি বুঝা দায়।

পিরীত জলে চান করিলে শেষে প্রাণে বাঁচা দায়।
মরম সখীরে, এই পিরীতির রীতি বুঝা দায়।
এই পিরীতির এমনী ধারা
বহে লদীর স্রোতের পারা,
কারো দেয় সে দিশাহারা.
না বুঝিয়া ঝাঁপ দিলে হাবুডুবু খায়,
শেষে হাবুডুবু খায়
মরম সখীরে, এই পিরীতির রীতি বুঝা দায়।

গরুর গাড়ী হেঁটকুলীর বাঁকে অদৃশ্য হয়।

বেজ, নসীরাম আর অন্যান্য সবাই ওদের যাওয়ার পথের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এই কদিনের স্বল্প অবস্থিতিতে কেমন যেন একটা সখ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ওদের সঙ্গে। এরপর কয়েকটা দিন একটা শূন্যতা বোধ পীড়া দেবে মনটাকে। কে যেন ছিল, কে যেন নেই এমনি একটা অনুভব। তারপর ধীরে ধীরে প্রিয়জন সঙ্গহীনতার বেদনা হারিয়ে যাবে নানান সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনার মাঝে। যেমন তিয়াসির মেহ্নতী মানুষের প্রতিদিনের থাকা-না-থাকার মাঝে অনেক আনন্দই হারিয়ে যায়। আবার অনেক দুঃখই অনুভব করার অবকাশ মেলে না। কাজলীর গানের সুরটা তখনও কানে বাজে—'মরম সখীরে, এই পিরীতির রীতি বুঝা দায়।'

কয়েকদিনের একটানা পরিশ্রমের পর সমস্ত শরীরটা যেন ক্লান্তি আর অবসাদে ঝিমিয়ে পড়েছে। সমস্ত গ্রামটাই অবসাদ গ্রস্ত। কাজলী কাল চ'লে গেছে। ওর গানের কলীগুলো মুখে মুখে ফেরে। ধীরগতি মহিষের পিঠে শুয়ে শুয়ে গুনগুন করে গোঠালীর রাখাল ছেলেরা। কচি বয়সের মেয়েরা ঘাটে জল ছোড়াছুড়ী করছে গায়। গরুর গাড়ীর চাকা ঠারী করতে করতে, অবসর সময়ে বিড়িতে টান দিতে দিতে গায় কেউ। ফরাতিরা গান গাইতে গাইতে করাত চালায়। কাজলী চ'লে গেলেও

ওর একটা অশরীরী অস্তিত্ব অনুভব করে সবাই। মাতব্বরের মনেও ক্লান্তির পাহাড় জমেছে। এই কদিনের অফুরন্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনার শেষে হঠাৎ যেন মনে হ'চ্ছে এই কর্মহীন অবকাশ বড় বিরক্তিকর। কাজের মানুষের হাতে কাজ না থাকলে শরীর মন তুইই ভারী হ'য়ে ওঠে। কাজ ব'লতে তিয়াসি বাবার থানে মন্দির নির্মাণের তত্ত্বাবধান করা। সে কাজের ভার নীলকণ্ঠের উপরে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছে ঈশ্বরী। নিজেও মাঝেসাঝে যায়। দেখে আসে। কখনও সখনও মিস্ত্রীদের পরামর্শ দেয়। মিস্ত্রীরাও খুব মানে ঈশ্বরীকে। ঈশ্বরী বহুদর্শী লোক। ঈশ্বরীর পরামর্শে মাঝে মাঝে এটা ওটা বদলানো হয়। সব সময়ে উপস্থিত থেকে তত্ত্বাবধান করে নীলকণ্ঠ। ছেলেটি বেশ চৌকস আছে। মাতব্বর ভাবে। সেদিন তো পিঠ চাপড়ে গ্রামশুদ্ধ লোকের কাছে বলেই এসেছে মাতব্বর — 'তু বেটা মাতব্বর হবিই হবি।' বাস্তবিকই, ঈশ্বরীর মৃত্যুর পর নীলকণ্ঠ ছাড়া আর কে মাতব্বর হবে? মাতব্বর হওয়া কি সোজা কথা? এতগুলি লোকের সুখ তুঃখের কথা ভাবতে হবে। বিপদ আপদ মাথা পেতে নিতে হবে। কিন্তু নিজেকে আজ অত্যন্ত ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে ঈশ্বরীর। উঃ ক্লান্তি যেন শরীরের গাঁটে গাঁটে বাসা বেঁধেছে। সত্যিই কি তাহ'লে এতদিনে বুড়ো হ'য়েছে মাতব্বর। ঈশ্বরীর হাসি পায়। বয়সটাকি কম হ'ল? সেই উনাশির খরার সময় জন্ম। তারপর কত কাণ্ডই না দেখল ঈশ্বরী। রাণী রাজা হ'লেন। টাকার উপরে রাণীর ছবি ছাপা হ'ল। তারপর স্বদেশী বাবুদের সাহেব মারার ধুম। ক্ষুদিরামের ফাঁসি। বকুল নগরের হাটে বসে সেই অন্ধ ভিখারীটা গান গাইত। কি যেন গানটা? 'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি—' গানটা শুনে চোখে জল আসত ঈশ্বরীর। তারপর গান্ধীবাদ ছেলে ছোকরাদের জোর করে বিলাতী কাপড় পোড়ান—ধর পাকড়। সেবারে কে যেন একজন বাবু এসে দাস পাড়ায় কৈবর্ত্তদের ঘরে লুকিয়েছিল। কানাঘুষোয় শুনেছিল স্বদেশীবাবু। তারপর

রাণীর মৃত্যু। দাড়ীওলা সাহেব রাজা হ'লেন। আবার টাকায় তাঁর ছবি ছাপা হ'ল। সেই সময়ে একটা কথা খুব শোনা যেত—কনরেস। একবার ভ'য়ে জিগীস করছিল ঈশ্বরী—'কনরেস' কার নাম ?

'একটা পার্টির নাম।' কে যেন জবাব দিয়েছিল বকুল নগরের হাটে' কংগ্রেস আমাদের দেশে স্বরাজ আনবে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সর্ত নিয়ে বৃটিশ্ সরকারের আলোচনা চলছে তাই।'

'ও' বিশেষ কৌতূহল হয়নি ঈশ্বরীর। স্বরাজ আসা মানে রাজা বদল হবে। তার মানে বুড়ো রাজা মরলে পরে কনরেস রাজা হবে, এই আর কি। তাতে আর এমন পরিবর্তন কি হবে দেশে ? রাজা বদল মানে তো টাকায় নতুন রাজার ছবি ছাপান। কনরেস রাজা হলে কনরেসের ছবি ছাপা হবে। তা এই জওয়ান হবার বয়সে ছুজন রাজা বদল দেখেছে ঈশ্বরী। কিন্তু কোথায় কি। ওবা আশা করেছিল বুড়ো রাজা মরলেই কনরেস রাজা হবে। আর কনরেস তো আর সাহেব নয়। আমাদের দেশের লোক। কাজেই সাধারণ মানুষের ছুঃখের কিছুটা লাঘব হ'তে পারে। কিন্তু বুড়ো রাজার মৃত্যুর পর রাজা হ'ল কে একজন গোঁফ কামানো সাহেব। সেই থেকে স্বরাজের আশা ছেড়ে দিয়েছে ঈশ্বরী। এখনও মাঝে মাঝে বকুল নগরের হাটে মাচা বেঁধে বক্তৃতা দেয় স্বদেশী বাবুরা। মাঝে মাঝে হাতে টীনের চোঙায় মুখ দিয়ে কি যেন বলে। আজকাল আর অত আগ্রহ বোধ করে না ঈশ্বরী। তোদের জারিজুরী তো সব দেখা গেল। সেই তো বুড়ো রাজার সময় থেকে কনরেস রাজা হবে ব'লে চীৎকার করছিস। তারপরও পার হ'য়ে গেল একটা কাল। আর তোরা রাজা হ'লেই বা তিয়াসির কি উবগারটি হবে ? রাজা হ'য়ে তো কেবল টাকার উপরে ছবিটা বদলাবি আর কি ? আজকাল আবার আর একটা দল হ'য়েছে। কি যেন একটা খটখটে নাম। কাস্তে হাতুড়ী ছাপ মারা লাল পতাকা নিয়ে রাত্রিবেলায় মশাল জ্বেলে রাস্তা দিয়ে কি সব যেন বল'তে বল'তে যায়। একদিন

এদের ব্যাপারটা জানবার জন্য কৌতূহল হ'য়েছিল ঈশ্বরীর। ওই লাল পতাকা-ধারীদের একজনকে ডেকে জিগোসও করেছিল। 'ইটি কাদের দল বটেন আঁজ্ঞা?'

লোকটি রাস্তার একপ্রান্তে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ঈশ্বরীকে। তারপর ঝাড়া একঘণ্টা ধরে কি সব যেন বুঝিয়ে ছিল ঈশ্বরীকে। ঈশ্বরী ওর কথার এক বর্ণও বুঝতে পারেনি। শুধু বুঝেছিল যে লোকটি বলতে চায় সারা পৃথিবীর মেহনতী মানুষ চাষী, মজুর সবাইকার একমাত্র দল এইটাই। লোকটি কোন একটি দেশের কথাও বলেছিল যেখানে নাকি রাজা নেই। তাদের মত মানুষরাই রাজ্য চালায় সেখানে। কথাটা শুনে খুব হাসি পেয়েছিল ঈশ্বরীর। কিন্তু ভয়ে সেই লোকটির সামনে হাসতে পারেনি। বাড়ী ফিরে এসে খুব হেসেছিল ঈশ্বরী। বলে কিনা তাদের মত লোকই রাজ্য চালায়। আরে হো হো। রাজার জাতই আলাদা। জন্মে রাজা হওয়া যায় না। রাজা হয়ে জন্মাতে হয়। তারপর সে রাজত্বের টাল মাটাল অবস্থাও দেখেছে ঈশ্বরী। যুদ্ধ বাধল। জাপান না জার্মান কোন দেশের সঙ্গে। জিনিষপত্রের দাম দ্বিগুণ বেড়ে গেল। চাল নেই। 'খাঁটী' তেল উধাও হয়ে গেল দেশ থেকে। কাপড় নেই। গোবিন্দপুরের সদগোপ বাড়ীর একটা বউ তো কাপড়ের অভাবে গলায় দড়ী দিয়ে মরল। তিয়াসিতে তব নিজেরা সুতো কাটত, কাপড় বুনত ব'লে বেঁচে গেল সে যাত্রা। পাঁচ বছর টানা পোড়েনের পর সে যুদ্ধ থামল। তারপর সত্যি সত্যি স্বরাজ এল। কনরেস রাজ্য হ'ল ঈশ্বরীর বয়স যে আর সত্তরের কোঠায়। কিন্তু সব দুখ ঘুচল কই?

আজ সমস্ত দিন ধরে পুরোন কথাগুলো মনে পড়ছে। বুকের সেই মিষ্টি মিষ্টি ব্যথাটাও মাঝে মাঝে জেগে উঠছে। নানা স্মৃতিচারণের আড়াল দিয়ে ঈশ্বরী ওর ব্যথার উৎসটা চেপে রাখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু যৌবনের দিনগুলির অনেকখানি জুড়ে যে সে বিরাজ করছে। নানা সূত্রে নানা প্রসঙ্গে তার কথা মনে পড়ে যায়।

মাঝে মাঝে ঈশ্বরীর ব্যথার উৎসমুখ খুলে যায়। এমন অবিরাম রক্তক্ষরণ হয় সেই ক্ষতমুখ তুর্বল করে। পীড়িত করে ঈশ্বরীকে। সারাদিন ধরে চিন্তাগুলোকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করে নানান্ কাজে। কিন্তু ঘুরে ফিরে তার কথাই মনে পড়ে যায়। তাকে ও কিছুই দিতে পারেনি অথচ যাকে সব কিছুই দেবার শপথ করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, বিয়ের পরে একটি দিনের জন্যও উমাশশী ঈশ্বরীকে পুরোন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়নি। সেই রঙ্গীন দিনগুলোর ওপরে কোন স্বপ্নসৌধ রচনা করতে চায় নি। আর প্রাণ ধরে ঈশ্বরীকে ফিরিয়ে দিতেও পারেনি ওর শ্বশুর বাড়ীর তুয়ার থেকে। ওর ডাগর চোখ তুটোতে একটি অসহায় হরিণীর মত মিনতি ফুটে উঠত যখনই ঈশ্বরী গোপন সাক্ষাতের অনিচ্ছা প্রকাশ পেত। এস। আবার এসো। জীবনে কিছুই পেলাম না। যদি তোমার সঙ্গে তুদণ্ড কথা বলে শান্তি পাই তাই কি কেড়ে নেবে? এতে কোন দোষ নেই।

ঘুরে ফিরে আবার উমাশশীর কথাই ভাবছে ঈশ্বরী। মনটাকে একটা কঠিন ধমক দেয় ঈশ্বরীর। নাঃ এভাবে চুপ করে বসে থাকলে শুধু তার কথাই মনে পড়বে এবং লোকের সঙ্গে গল্প করে যদি মনটাকে মেয়ানো যায় সেই উদ্দেশ্যে সন্ধ্যের গোড়ায় ঘর থেকে বেরোয় ঈশ্বরী। পথ এখন জনবিরল। কাজের মানুষরা এরপর ঘরে ফিরে। ঈশ্বরী আপন মনেই পথ হাঁটে। গাঁয়ের বৌঝিরা গা ধুয়ে ভিজে কাপড়ে ঘাট থেকে বাড়ী ফিরছে। অন্যদিন হ'লে ঈশ্বরীই রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ায়। ওরা সমীহ করে ঈশ্বরীকে। ঈশ্বরীও সেই মর্য্যাদার মূল্য দিতে কসুর করে না। আজ অত্যন্ত অন্যমনস্কের মত পথ হাঁটে। মেয়েরা পথের এক পাশে সরে দাঁড়ায়। ঈশ্বরী খেয়াল করে না। উমাশশীর ভিটের কাছে এসে আপনা আপনি থমকে যায়। তুলসী তলাটা ভেঙ্গে গেছে। একটা শুকনো তুলসির ডালকে ঘিরে রাশি রাশি অপরাজিতা ফুটে আছে। ভাঙ্গা পাঁচীলটার গা বেয়ে উঠেছে একটা অতসি লতা। আহা। এইখানে

কতবার—ঈশ্বরীর বুকটা আবার চনচন্ করে উঠল। আজ আবার লায়া গুনীনের কাছে যেতে হবে। সব ভুলে যেতে হবে। সর্ব্বজ্বালা হয় একপাত্র উগ্র পাণীয়। তারপর নিঃঝুম তন্দ্রা। সেই তন্দ্রার অবকাশে স্বপ্নগুলো সত্যি মনে হবে। মনে হবে পৃথিবীতে কোন জ্বালা নেই। কোন দুঃখ নেই। ঈশ্বরী খর খর পা চালায়।

লায়া গুনীন তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। কোন ভিনদেশী লোক। দর্শণীর দরকষাকষি চলছে বোধহয়। লায়া ঈশ্বরীকে ইশারায় দাওয়ায় বসতে বলে। ঈশ্বরী মাচুলীটা টেনে নিয়ে দাওয়ায় বসে।

কিছুক্ষণ পর কথা শেষ ক'রে গুনীন ফিরে আসে। 'নপাড়ার মুদীঘর নিতে আসেছিলেন।'

'নপাড়া? সি যে অনেক দূর হে?'

'দূর? তা বটে। সেই চন্দনপুর পেরাই গোবিন্দপুর। তার উত্তরে নপাড়া। তা কোশ আধেক হবেক।'

'ব্যেমারীটি কি?'

'উয়াদের ঘরের একটি বহু কাল খুলা চুল্যে নদীতে জল আনতে গেছলেন। মাঝ রাত থেকে চমকে চমকে চিল্লাই উঠছে। ভুলে বকছে। কুন 'অপদেবতা' ভর করেছেন হতে পারে।'

সব কথা ঈশ্বরীর কানে যায় না। কারণ এসব কথা শোনার তেমন আগ্রহ নেই। মনটা বারবার যেন অবাধ্য পাখীর জন্য ঈশ্বরীর একটা ডালেই বসতে চাইছে।

'তুমি হঠাৎ কি মনে করে মাতব্বর?'

মাতব্বর চোখের ইশারায় জিজ্ঞাস করে আছে নাকি? উদাসী উৎফুল্ল হয়। 'লায়া গুণীনের কাছে মদ নাই আর গঙ্গা নদীতে জল নাই ই কুন্থু দিন হয়?'

লায়া ভেতরে ঢোকে। ভেতর থেকে দুটো বোতল আর একটা গ্লাস নিয়ে আসে। সঙ্গে শালপাতায় মোড়া খানিকটা ছোলা সিদ্ধ।

ঈশ্বরী প্রথমেই একগ্লাস পান করে কয়েকটা ছোলাসেদ্ধ

মুখে দিয়ে চিবোতে থাকে। হ্যাঁ এবার মনটা অনেকটা শান্ত হ'য়েছে।

লায়া গ্লাশটা হাতে নিয়ে কয়েক চুমুক পান করে শুধোয় 'মাতব্বর তুমি কি পদ্ম বিটির বিয়া দিবে নাই ?'

'দিব ত' হে। মিন্তুক মেইয়াটির লজর বড় উঁচা। পসন্দই হয় না কাউকে। দাসপাড়া, গোবিন্দপুর, চন্দনপুর সব থানেই ত' দেখলম মিন্তুক যুতসই ছেল্যা পেলাম নাই হে। এখন আবার মেইয়াটি বলছেন বিয়াই করব নাই।'

'কেনে ?'

'বলছেন বিয়া করলেই তুমাকে ছেড়্যে যেতে হবেক। সি আমি লারব।

'উটি বিয়ার আগে সবাই বলেন। মিন্তুক বিয়ার পর আর বুড়া বাপের কথাটি খেয়াল থাকে না। হোঃ হোঃ হোঃ' লায়া জোরে জোরে হাসে। অর্থাৎ এবার নেশা লাগতে স্ুরু করেছে।

'না হে। বিটিটি আমার অমন লহেন। তাইত' এতদিন পর্য্যন্ত বিয়াটি দিতে পারি নাই।'

'মিন্তুক ইটি ঠিক লয় মাতব্বর। তুমি লিজে মাতব্বর, নাহলো লোকে ব'লত ইটি অসরণের কাজ। তুমাদের সমাজে এত বয়সের 'থুবড়া' মেইয়া কি আছে কুথাও ?'

ঠিক কথা। এতদিন মনে পড়েনি ঈশ্বরীর। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। কিন্তু সে অন্ধকার অপসারণের জন্য কোন আগ্রহ নেই। ঈশ্বরীর মনে হ'ল ঠিকই ব'লেছে লায়া। গ্রামের লোক সঙ্গত করলেই ব'লতে পারে। কারণ ঈশ্বরী সমাজের রক্ষক। সেই যদি এমনি অসামাজিক কাজকে প্রশ্রয় দেয় তাহ'লে ত' সাধারণের প্রতি কোন অনুশাসনই প্রয়োগ করা যাবে না আর। তা ছাড়া, ভারী ভুল হ'য়ে গেছে। বাস্তবিকই বয়সটা অনেক হয়েছে পদ্মর।

লায়ার চোখ দুটো আস্তে আস্তে গোলাপী হ'য়ে আসে। ঈশ্বরীর চোখ দুটোও আধ বোজা।

'তাছাড়া, তুমি দেখ কেনে 'লায়া আবার বলে' যি বয়সের যা। খিদার সময়ে খাদ্য না পেলে কি শরীল টিকে? বিয়ার সময় কালে বিয়া না হলেও শরীলটি ভেঙ্গ্যে যায় মাতব্বর। তুমি পদ্মা বিটির মুখটির দিকে ভালেছ কুন্ দিন? আগে তো বেলা উঠার সূর্য্যের মতন জ্বলজ্বল করত। এখুন বেলা ডুবার সূয্যির মতন ছমছম করে।'

তাই নাকি? ঈশ্বরী এতদিন খেয়াল করেনি। সত্যিই কি পদ্মর চেহারা খারাপ হ'য়ে গেছে? বাপ হ'য়ে ঈশ্বরীর বোঝা উচিত ছিল ওর ব্যথা ওর জ্বালা। কিন্তু সমস্ত গাঁয়ের সুখ দুঃখের ভাবনা যার মাথার উপরে, সে নিজের ভাবনা ভাবার সময় পায় কই। অনুশোচনায় দগ্ধ হয় ঈশ্বরী। না, এর একটা বিহিত করতেই হবে।

ঈশ্বরী বার বার মাথা দোলায়। 'ঠিক বুলেছ। ঠিক বুলেছ গুনীন। ইয়ার একটি বিহিত করতেই হবেক। ফিরে আসলে বিয়াটি দিতেই হবেক মেইয়াটির। ভাল করল্যে কথাটি স্মরণ করাই দিয়ে।'

গুনীন হাসে। নির্বোধ হাসি। চোখ অর্দ্ধমিলিত। নেশা ধরেছে। তুমার কি আর লিজের কথাটি ভাববার সময় আছে হে। পরের ভাবনা ভেব্যেই কুল নাই।' শেষের দিকে কথাটা জড়িয়ে আসে।

রঙ্গ ধরেছে ঈশ্বরীর চোখেও ঈশ্বরীর বেশ একটা স্ফূর্তি স্ফূর্তি লাগে। গুনীনের প্রশস্তির জন্যই নয়। ক্ষণপূর্বের ব্যথাটা বাস্তবিকই ভুলতে পেরেছে বলে।

গুনীন একটি একটি ক'রে ছোলা মুখের মাঝে ছুঁড়ে চিবুতে থাকে। 'তবে ইবারে তুমি একটি কীর্তি রাখল্যে ব মাতব্বর। নাচনীটি বড় ভাল লাচলেন।'

মাতব্বর জবাব দেয় না। শুধু মাতব্বরি ভঙ্গীতে একটু হাসে মাত্র।

ইয়ার ঠাটটি ঠিক সেই গোলাপী নাচনীর পারা হে। উয়ার

নাচ দেখ্যেছি ঐ জুয়ান বয়সে গোপালপুরের মেলায়। আহা রক্তে তুফান তুল্যে দিত হে বুকের মাঝে শব্দ শুনতাম সাঁই সাঁই।'

আবার সেই জোয়ান বয়সের কথা! গুনীনের জোয়ান বয়সকে ঘিরে আছে অনেক রঙ্গ রসের কাহিনী। কিন্তু ঈশ্বরীর জোয়ান বয়স মানেই একটি ফুলকে ঘিরে একটী তৃষ্ণার্ত্ত ভ্রমরের গুঞ্জন। একটি হৃদয়ের চারিপাশে আর একটি হৃদয় অনুভবের বৃত্ত। আবার সেই সব দিন গুলোর কথা মনে পড়ে যায় ঈশ্বরীর না, এই সব স্মৃতির প্রেতচ্ছায়াগুলো ঘুরিয়ে মারবে ওকে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মাঝে একটা মৃদু কম্পনও অনুভব করে ঈশ্বরীর। হঠাৎ উঠে পড়ে ঈশ্বরী। 'চলি হে গুনীন। আজ ভাল লাগছে নাই মনটি।'

গুনীন অবাক হয়। 'সে কি হে'? মন ভাল করবার অমন সাঁঝাল দাওয়াই দিলম—'

'না হে ইবার তেমুন 'তিয়ার করতে পার নাই জিনীষটি। ঝাঁঝ কই পেলম' কেমুন ফিকা লাগল্য।

'সে কি বলছ হে? 'গুনীন বিস্মিত হয়' সব নিশীমের মিশাল দিয়েছি। একটুক তুরুটি নাই। তবু তুমি কি বুলছ—নাহে তুমি ইবার খরিশ সাপের বিষ ও হজম করে দিবে। লেশাটি তুমাকে হিস্কাল্য বটে।'

মাতব্বর হাসে। তারপর আস্তে আস্তে দাওয়া থেকে পথে নেমে হাঁটতে সুরু করে ঘরের দিকে।

পদ্মকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মাতব্বর। বাস্তবিকই কি হতশ্রী হ'য়ে গেছে পদ্ম? ওর যৌবনবতী, রূপ গরবিনী মেয়ে পদ্ম? ভাল করে নজর করে দেখে। বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন মনে হয় না। তবু স্নেহ সিক্ত বাপের মন। ঈশ্বরীর মনে হয় চোখ দুটো যেন অদ্ভুত শান্ত হয়েগেছে পদ্মর। যে চোখ দুটো হাসত, খেলা করত চঞ্চল শিশুর মত দিন রাত্রি। আরও মনে হয় যে ঈশ্বরীর, পদ্মর লাবণ্যর মাঝে কোথায় যেন একটা অভাব চোখে পড়ছে। আগের সেই জৌলুষ, সেই চিক্কনতা যেন আর নেই। এবং আরও স্নিগ্ধ আরও

শান্ত আরও স্তিমিত মনে হ'চ্ছে। এ যেন বর্ষায় খরস্রোত নদী নয়। টলটলে জল নিস্তরঙ্গ গভীর কালিন্দী সায়র। নিজেকে অপরাধী মনে হয় ঈশ্বরীর।

পদ্মও অবাক হয়। আজ কি হল ঈশ্বরীর? পদ্ম জানে ঈশ্বরী আজ মদ খেয়ে এসেছে। মদ খেয়ে ঈশ্বরী যেন সব ভুলে যায়। ওর বয়স, পদমর্য্যাদা, মাতব্বরের গুরু দায়িত্ব সব, সবকিছু। অমন স্বভাব গম্ভীর লোকটা কেমন যেন ছেলে মানুষে রূপান্তরিত হয়। তখন মেয়ে নয়, মায়ের ভূমিকা নিতে হয় পদ্মকে।

পদ্ম ঈশ্বরীর ভাত বাড়তে বাড়তে জিগ্যেস করে 'কি হলা তুমার? কি দেখছ অত?

চমক ভাঙ্গে ঈশ্বরীর। তুকে দেখছি পদ্ম। তু বড় ত্বলো্য গেছিস বিটি'

পদ্ম হাসে। 'বাপের চোখ বিটিটিকে তুবলাতেই দেখ্যে।

'না, না, মিছা লয়। তু সত্যি ত্বল্যে, গেছিস বিটি। তুর মা বেঁচে থাকল্যে তুর শরীলের দিকে লজর রাখত। কিন্তুক উয়ার না থাকায় আমারই উচিত ছিল। পারি নাই। ভুল হয়্যে গেছে। তুর দিকে লজর দিতে পারি নাই'

লাও রাত তুপহরে, উ জন্যি আর আক্ষেপ করত্যে হবেক নাই। 'খেত্যে বস দেখি।'

'না, না, বিটি, তু লুকাছিস। তুর কিসের তুঃখু, তু আমাকে বল।'

'তুঃখু?' আবার হাসে পদ্ম 'তুঃখু কিসের গো? দিব্যি ত' খাই দাই হেসে খেল্যে দিন কাটাই।

'তু হাসিস না। তু হাসিস না পদ্ম। তুর হাসি শুনল্যে আমার বুকটি হিম হয়্যে যায়। আমার মনে হয়' মনের একটি বড়' তুঃখুকে আড়াল দিবার লগে অত' হাসিস।'

লাও। তবে আর হাসব নাই। মিস্তুক তুমি খেতে বস দেখি।'

ঈশ্বরী হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে। মাঝে মাঝে চিন্তা এসে ভীড় জমায় মনে। তখন খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পদ্ম ঈশ্বরীর সুমুখটিতে বসে থাবে।

'তু আমার উপর রোষ করেছিস বিটি ?'

'কিসের লেগে ?'

'আমি তুর বিয়ার চেষ্টা করি নাই বল্যে ? মিন্তক তু পেত্যয় কর বিটি কুন্থু পাত্রকে আমার মনে ধরে নাই। কাউকে তুর উপযুক্ত মনে হয় নাই মিন্তক ভারী অপরাধ হয়্যে গেছে।'

'কিসের অপরাধ ?'

'তুকে এতদিন থুবড়াই রেখ্যেছি। লোকে ভাবকে বাপহারাটা লিজের সুখের লেগে বিটিটার বিয়া দিছেনি। বিয়া দিলেই ত পরের ঘর চল্যে যাবেক। তখুন ত' বুড়া একা হয়্যে যাবেক তাই। তাছাড়া ?'

'তাছাড়া কি ?' পদ্ম শুধোয়।

'তাছাড়া এমুনও বলতে পারে যে মাতব্বর সমাজের মালিক মিন্তক লিজের বিটিকে এক কুড়ি আট বছর থুবড়াই রেখেচে।'

পদ্ম মাতব্বরকে আঁচাবার জল দিয়ে বলে সে 'যে যাই বলে বলুক। আমি তুমাকে ছেড়্যে কুথাও যাব নাই।'

সস্নেহে ঈশ্বরী বলে 'উ কথা বল্লে কি চলে মাই। ফিরে অখনেই আমি তুর বিয়া দিব।'

কথা বাড়ায় না পদ্ম। পদ্ম জানে সকালের মাতব্বর অন্য মানুষ। তাছাড়া এ নিয়ে কোন ক্ষোভ নেই পদ্মর। পদ্ম ইচ্ছে করলে অনেক আগেই বিয়ে করতে পারত। কিন্তু পদ্ম তা করেনি শুধু একটি প্রতীক্ষায়। পদ্মর ভালবাসা প্রতীক্ষার স্বপ্নে বিলীন হয়ে গেছে তাই আজ পদ্ম নতুন করে আর বিয়ের স্বপ্ন দেখে না। কিন্তু সে কথা ঈশ্বরীকে বলে লাভ কি ? ঈশ্বরী, শুধু পদ্মর বাপ নয়, তিয়াসির সুখ দুঃখের হুঁসিযার কাণ্ডরী।

মাতব্বর খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে। পাশে বসে পদ্ম। মাতব্বর

পদ্মর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে 'তু ই কথা লিচ্চয় জানবি বিটি, যি তুর বাপ যা করেছে তুর ভালর লেগেই করেছে। আর সি লেগে তু মনে কুন্থ দুঃখ রাখিস না।'

না। কোন দুঃখ নেই পদ্মর মনে। কোন অভিযোগ নেই। যে পাথর একদিন তরল ছিল, আজ তা জমাট, কঠিন। সেখানে সুখ-দুঃখ বেদনাবোধের কোন আভাস নেই। মাতব্বর ঘুমিয়ে পড়ে।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় মাতব্বরের। মাতব্বরের মনে যে এক রাশ সচল ছায়া ওর চারপাশে বিচরণ করছে। আর সেই অস্থির বিচরণকারী ছায়ার মাঝে শিহরিত ঈশ্বরীও দাঁড়িয়ে আছে বিচারের আশায়। বুকের সেই মৃদু ব্যথাটা একটা অসহ্য যন্ত্রণায় রূপান্তরিত হ'য়েছে। হঠাৎ এক সময় ঈশ্বরীর মনে হ'ল একটা ছায়ামূর্তি ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কি যেন বলতে চাইছে কিন্তু ঈশ্বরী বুঝাতে পারছে না। ঈশ্বরী চীৎকার করে ব'লতে চাইল…না, না। আমার কোন অপরাধ নেই, সব অপরাধ ভগবানের সব অথরাধপ্রেমের সেই অন্ধ দেবতার। 'কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না ঈশ্বরীর। মনে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর কাল রাত্রির কথা।

উমাশশীর সঙ্গে ঈশ্বরীর প্রণয় ছিল এ কথা ত' অজানা ছিল না অর্জুন সিংএর কিন্তু কোন অনুশাসনে বদ্ধ করতে চায়নি উমাশশীকে। উমাশশী আর ঈশ্বরী ভেবেছিল এ বুঝি দুটি অনুভ প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি অবাধ প্রশ্রয়ের ইশারা। তাই আর একটু বেশী বেহিসেবী হ'তে আর একটু বেপরোয়া হ'তে ভয় করেনি ওদের। সেদিন, সেই বর্ষার রাত্রিতে উমাশশীদের রাংবিতার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে ওরা দীর্ঘক্ষণ গল্পর করেছিল। যে গল্পে কোন অর্থ নেই। কোন অর্থ হয় না অথচ যে প্রলাপ সৃষ্টির গতি থেকে আজ পর্যান্ত প্রেমিক প্রেমিকার চিরন্তন আলাপন। ঠিক সেই সময়েই মানকিদের বাড়ী থেকে ফিরছিল অর্জুন সিং। এক হাতে লণ্ঠন। এক হাতে টাঙ্গী। 'কে, কে উখেনে চীৎকার করে ওঠে।

উমাশশী বেড়ার ওপাশে সরে যায়।

'আমি' গম্ভীর গলায় ঈশ্বরী বলে 'আমি ঈশ্বরী সিং'

'ঈশ্বরী ? ইখেনে, এত রেতে ? 'সন্দেহের সুর সুস্পষ্ট ওর কণ্ঠে।

এর কোন সন্তোষ জনক জবাব নেই। মিথ্যে কথা বলতে মন চায়নি ওর।

'উমাশশীর সঙ্গে রাজট করছিলম।'

'রাজট' জিগ্যেস করতে গিয়ে থমকে যায়। কিসের রাজট একথা জিগ্যেস করা অর্থহীন। ঈশ্বরীর কাছে এগিয়ে আসে অর্জুন। অত্যন্ত শান্ত স্বরে বলে পরের বহুর সঙ্গে রাত বিরাতে রাজট করা ঠিক লয় ঈশ্বরী। মানুষের মন আর টাঙ্গীর ধার দুই সমান। লিজেকে একটু সামলাই চলাই ভাল।'

চাঁদের আলোয় চিক চিক করে ওঠে ওর ধারাল টাঙ্গীটা। কোন জবাব দিতে পারে না ঈশ্বরী। অধোবদনে বেরিয়ে আসে।

এরপর নিজেকে শামলাবারই চেষ্টা করেছিল ঈশ্বরী। কিন্তু অকস্মাৎ এসেছিল সেই আড্ডায়। মানকিদের দুই শরিকে জমির দখল নিয়ে বিবাদ বেধেছিল।……বড় মানকি অর্জুন আর ঈশ্বরী দুজনকেই তলব করতে চেয়েছিলেন। সময় সময় মানকিদের সম্পদ রক্ষার জন্য ওরা পেশাদার লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করত। পক্ষাপক্ষ বিচার ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরীকে ডাকতে দেয়নি অর্জুন। ব'লেছিল উয়ার সঙ্গে এক সঙ্গে লাঠি ধরতে লারব আঁজ্ঞা, মাফ করবেন।'

এর কারণ জিগ্যেস করেছিল মানকি।

'না আঁজ্ঞা কারণটিও বুলতে লারব।'

…বড় মানকি অর্জুনকে রুষ্ট করতে সাহস করেননি। কারণ অর্জুন এখন এ তল্লাটের নাম করা লাঠিয়াল। অর্জুন ইচ্ছে করেই এটা করেছিল। কারন ও জানত বড় মানকি না ডাকলে ছোট তরফ ঈশ্বরীকে ডাকবেই এবং সেই সময়েই লাঠির মুখে ফয়সালা হবে। শুধু ছোট তরফ আর বড় তরফের জমির স্বত্বের নয়। উমাশশীর উপরকার সত্ব সেই প্রশ্নেরও মীমাংসা হবে।

সেদিন বিকেলেও দেখা হয়েছিল অর্জুনের সঙ্গে বেশী কথা বলেনি মিতভাষী অর্জুন শুধু বলেছিল, টাঙ্গীটাতে ভাল করো শান দিয়ে লিয়ে যাবি ঈশ্বরী। আমার টাঙ্গীটাতে মিস্তুক ঘাড়টি ছুঁলেই মূড়টি টুনাই যায়। ঝালদার কামারদের তৈরী বটে।

ঈশ্বরীও জবাব দিতে কসুর করেনি। 'আমার টাঙ্গীতে ধার নাই। মিস্তুক ভার আছে। অনেক শেয়াল, খটাস মেরেছি উটাতে। 'শুধু শেয়াল খটাসই নয়। ওটা দিয়ে বাঘও মেরেছে ঈশ্বরী। কিন্তু অর্জুনকে ও শেয়াল খটাসের চেয়ে বেশী কিছু মনে করে না পরোক্ষে সেই কথাই জানিয়ে দেয়।

চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে অর্জুনের। 'এক আকাশে দুই সুয্যি থাকতে পারে না ঈশ্বরী।'

'সি ত জানা কথা' ঈশ্বরী বলে।

'আমিও জানি। মিস্তুক এক আকাশে দিনের বেলায় সুয্যি কিংবা রেতের বেলার চাঁদ, এই দুটিরও একটি থাকবেক নাই। ইটি তুর জানা কথা লয় বোধ হয়।'

ঈশ্বরী তবুও সহজ। 'বেশ ভাল কথা। পৃথিমিতে হয় শুধু দিন থাকবেক, না হলো রাত।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি। 'শোভা নদীর কিনার। মালিকদের জমির দুপাশে সমবেত দুই পক্ষের সৈনিক। একপক্ষের নেতৃত্ব করছে অর্জুন। অপর পক্ষের ঈশ্বরী। হঠাৎ একসময় দুই পক্ষ পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই রণোন্মাদ যুযুধান দুইপক্ষের পাশবিক চীৎকার পিছনে ফেলে ঈশ্বরী আর অর্জুন পরস্পরের প্রতি রুখে দাঁড়াল। ঈশ্বরীর ঠোঁট দুটো কাঁপছে রাগে প্রতিহিংসায় আর অর্জুনের চোখদুটো খটাসের মত জ্বলছে। দুটো লড়াইএর মুরগীর মত দুদিকে দাঁড়িয়ে ওরা অসতর্ক মুহূর্তের ক্ষণ খুঁজছে। দুজন একসঙ্গে বেঁচে থাকতে পারবে না। উমাশশীর একজন দাবীদারকে সরে যেতে হবে পৃথিবী থেকে। আর তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে ঈশ্বরী নিজে।

ঘাড়ের কাছে দুটো সবল সুপুষ্ট পেশী ফুলে ফুলে উঠছে দুজনেরই। নিঃশ্বাস প'ড়ছে ঘন ঘন। বুকটা ওঠানামা করছে কামারের হাপরের মত। হঠাৎ নদীর ওপার থেকে একটি আর্ত্ত চীৎকার শোনা গেল। কেউ প'ড়েছে। একটু অসতর্ক হ'ল অর্জুন। পিছনে এক লহমার জন্য তাকাল। মুহূর্তে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঈশ্বরী। প্রথম আক্রমণের ধকলটা সামলাতে না পেরে ধরাশায়ী হয় অর্জুন। ঈশ্বরী ওর বুকে বসে পড়ে। একটা পাশ। ঠিক আনন্দে চীৎকার করে ওঠে ঈশ্বরী। ইবার 'তুকে কে বাঁচাবেক।'

দুহাতে ঈশ্বরীর গলাটা টিপে ধরে অর্জুন। 'তু বিষ গাছের বংশ। তুদের ঝাড় আমি রাখব নাই। শিকড় শুধু উপড়াই ফেলব আমি।'

ইঙ্গিতটা বোঝে ঈশ্বরী। ইঙ্গিতটা মাতালীর সঙ্গে সুচাঁদের প্রেমের প্রতি উদ্দেশিত। মাতালী ওর সৎ মা। তবুও মাতালী ঈশ্বরীর মা। ঈশ্বরীর মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

'ঠিকই বুল্যেছিস। মিস্তুক ভালবাসার পথে কাঁটা আমরা রাখি না। আমার বাপ ও রাখে নাই। সুচাঁদকে উ খুন করেছিল। সি কথা কেউ জানে না। সবাই জানে উয়াকে সাপে দংশেছিল। উটি মিছা কথা। আমার বাপ উয়াকে খুন করে কালিন্দির কিনারে ফেলে দিয়াছিল।' ঈশ্বরীর দ্রুত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অর্জুনের বুকের ওপর পড়ে। সাঁড়াশীর মত দুটো কঠিন হাতে ঈশ্বরীর গলাটা চেপে ধরে অর্জুন। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ঈশ্বরীর। সমস্ত শরীরটা যেন অবশ হ'য়ে যায়। ঈশ্বরী আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ে। সেই সুযোগে এক ঝটকায় ঈশ্বরীকে ফেলে দিয়ে ওঠে দাঁড়ায় ও। টাঙ্গীটা তুলে ঈশ্বরীকে একটা মোক্ষম আঘাত করে অর্জুন। ঈশ্বরী পাশ ফিরে আঘাতটার হাত থেকে বাঁচে। দ্বিতীয় বার টাঙ্গীটা তুলবার আগেই প্রাণপণ শক্তিতে ধারাল বল্লমটা অর্জুনের তল পেটে আমূল সেঁধিয়ে দেয় ঈশ্বরী। তারপর দুর্ব্বল শরীরটা কোন রকমে তুলে মাটিতে বসে ধুঁকতে থাকে ঈশ্বরী। এবং ঈশ্বরী ভেবেছিল বোধ হয় উমাশশী খুশি হবে। কিন্তু আশ্চর্য্য।

শেষ রাতে হেঁটকুলীর থেকে একটা কান্নার আর্ত্তরব শুনে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল ঈশ্বরী। সে কান্না উমাশশীর। তারপর অনেকদিন কেটে গেল। কেউ জানল না ঈশ্বরীর সঙ্গে দ্বৈরথে মৃত্যু হয়েছে অর্জুনের। সবাই জানল দাঙ্গা করতে গিয়ে খুন হয়েছে এবং ধীরে ধীরে আবার সবাইর জীবন যাত্রা সহজ হ'য়ে এল। উমাশশীর অনেক কাছে এল ঈশ্বরী। অনেক চড়াই উৎরাই পার হ'য়ে বার্দ্ধক্যের সীমানায় এসে পেঁ ছাল ঈশ্বরী। কিন্তু আজ এত অন্ধকার মনে হচ্ছে কেন সমস্ত পৃথিবী। আকাশে কি তারা ফোটে নি? ঈশ্বরী প্রাণপণ চেষ্টা করে ও বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। উঃ বুকের সেই যন্ত্রণাটা ক্রমশই বাড়ছে। পৃথিবীর সব আলো কি নিভে গেছে? সব বাতাস কি হারিয়ে গেছে? অত্যন্ত কষ্ট হয় ঈশ্বরীর। উমাশশী আর অর্জুনের ছায়া মূর্ত্তিগুলো যেন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই তো অর্জুনের রক্তাক্ত মুখ। ঐ তো উমাশশী। উমাশশীর চোখে জল কেন? উঃ ভগবান একটু আলো দাও। একটু বাতাস দাও। একটু বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার শক্তি দাও। বুকের সেই ব্যথাটা যেন একটা সুচামুখ তীব্র হ'য়ে সমস্ত স্নায়ুগুলোকে অসাড় করে দিচ্ছে। যেন ব্যথাটা ঠিক অনুভব করতে পারছে না ঈশ্বরী। উঃ কি অপরিসীম ক্লান্তি। অন্ধকারে কাকে যেন হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে। কিন্তু কেউ নেই। সব অবলম্বন আজ হারিয়ে গেছে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হয় ঈশ্বরীর। তারপর একসময় সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে, সেই অচল ক্লান্তির সমুদ্রে হারিয়ে যায় ঈশ্বরী।

একটা দীর্ঘ ইতিহাসের সমাপ্তি হ'ল। একটা বিরাট অধ্যায় অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। মানুষের মনের খাতায় রইল তার হিসাব। আর মহাকালের দর্পণে। একটা অখণ্ড যুগাবসানের বিরতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হ'ল তিয়াসির মানুষদের কাছে মনে হ'ল তা ইন্দ্রপতনের মত অপুরণীয়। ঈশ্বরীর মৃত্যুতে প্রথমটায় ওরা বেশ মুসড়ে পড়ল। বৈশাখের ঝড়ে যেন একটা উপকারী বট

বৃক্ষ সমূলে উৎপাটীত হ'য়েছে। প্রখর মধ্য দিনের অবকাশে আর তার ছায়ায় দুদণ্ড দাঁড়িয়ে তৃপ্তি পাওয়া যাবে না। গামছায় আলতো হাতে ঘামমুছে সুখদুখের কথা নিশ্চিন্তে ভাবা যাবে না আর। ঘাটে মেয়েরা গল্প করে। 'আহা, লোক ছিল যেমুন বট বৃক্ষ। তার ডালে ডালে পাখীর বাসা, ছায়া যেমন মানুষের প্রাণের আরাম। সবাইকে পক্ষীর মতন ডানা দিয়ে আগলায় রাখত।' কথাটা মিথ্যে নয়। অনেক ঝড় ঝাপটা গেছে ঈশ্বরীর ওপর দিয়ে তিয়াসির মানুষরা তা টেরও পায়নি। ওর স্থান কে পূর্ণ করবে ওরা ভেবে পায় না। কে আছে এমন যোগ্য লোক। ঈশ্বরীর স্মৃতিই কয়েকদিন ধরে ওদের আচ্ছন্ন করে রাখে। তারপর ধীরে ধীরে সব সহজ হয়ে আসে। জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। সব শোক সব বেদনা ধীরে ধীরে অপসৃত হয় যেমন পাতা ঝরার বেদনা হারিয়ে যায় নব কিশলয়ের জাগৃতির স্বপ্নে। যেমন চৈত্রের ঘূর্ণি হাওয়ায় রিক্তপত্র গাছের ডাল বর্ষার সমাগমে আবার কচি পাতায় ভ'রে ওঠে। সময় দুঃখহর। মৃত্যুর শোক মানুষ চিরকাল মনে রাখে না। কারণ কেউ কারো কাছে অপরিহার্য্য নয় এবং বেঁচে থাকারই অপর নাম ধর্ম। সেখানে, সেই আত্মকেন্দ্রিক বৃত্তের মাঝে কেউ কারো আপন নয়। সেখানে শুধু চিরন্তন আমিরই ব্যপ্তি। ঈশ্বরীর মৃত্যুর শোকও ওরা ভুলে যায়। ঈশ্বরীর স্মৃতি ওদের হৃদয়ে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হ'য়ে আসে। ভুলতে পারে না শুধু পদ্ম। যার অন্য কোন আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই নেই অন্য কোন স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসার বন্ধন। সঙ্গীনিরা পদ্মর মনটাকে অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করে। এমনি মন ভার ক'রে বসে থাকলে যে ও পাগল হ'য়ে যাবে। পদ্মর বয়সী মেয়েরা কেউ অথড়া নেই। কারো বা বিয়ে হয়েছে গাঁয়েই। ছেলে, মেয়ে, ঘর-গোহাল নিয়ে সংসার করছে। কারো বিয়ে হয়েছে ভিন গাঁয়ে। মাসে দশে পরব পার্ব্বনে আসে। পদ্মর বিশেষ অন্তরঙ্গ ভোমর বৌ। এবার আঁতুড় থেকে উঠে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে ভোমর

বো। অপেক্ষাকৃত বয়স্থা কুমারী মেয়েরা ভোমর বৌএর সঙ্গে পদ্মর কাছে আসে। সামনেই করম পরব। পরবে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। পদ্ম উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে। ওদের কথা গুলো যেন ওর কানে বাজে না। পদ্মর কাঁধ দুটো ধ'রে সজোরে ঝাকুনী দেয় ভ্রমর বৌ। 'পদ্ম—পদ্ম'

পদ্ম যেন চেতনায় ফিরে আসে। পদ্মর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভোমর বৌ বলে' ই রকম গুমরাই থাকল্যে ত পাগল হয়ে যাবি বুন।'

পদ্মর চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় জল গড়ায়। 'হাই দেখ্, আবার কাঁদে। কথা শুন পদ্ম, কান্দিস না। যে গেছে সে আর ফিরবেক নাই। কাঁদ্যে কি হবেক আনসারটাই। তার চেয়ে আমাদের সঙ্গে চল করমের গান গাইবি।'

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে পদ্ম বলে 'তুমি যাও বৌ। আমার যেতে মন লাগছে নাই।'

'অমন বুলিস না পদ্ম। মাতব্বর খুড়া নাই বুলে কি কেউ নাই ? তু উঠ। তুকে গাইতে হবেক নাই। তু শুধ্ বস্যে বস্যে শুনবি। আঁচল দিয়ে পদ্মর চোখের জল মুছিয়ে দেয় ভোমর বৌ।

'আমি পারছি নাই বৌ। আমি পারছি নাই! আমার যে আর কেউ রইল নাই গো।'

পদ্মর রিক্ততার বেদনা ওরা অনুভব করে। ঈশ্বরীর স্নেহের ছায়ায় এতদিন কোন অতৃপ্তি, বোধ ওর চেতনাকে স্পন্দিত করেনি। নিজের একাকীত্বকে পদ্ম ঢেকে রেখেছিল অনেক অহঙ্কারের অন্তরালে। কিন্তু আজ যে ওর সত্যিই কিছু রইল না। সব চেয়ে বড় অহঙ্কার ওর পিতৃপরিচয়। যার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের আড়ালে নিজেকে সুরক্ষিত মনে করত পদ্ম, আজ ঈশ্বরীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা ধূলিসাৎ হ'য়ে গেছে। রাতের চাঁদের মাথায় দিনের সূর্য্যকে কে স্মরণ রাখে ? ঈশ্বরীর নিবিড় স্নেহের আবরণ ভেদ করে অন্য কারো প্রীতি ভালবাসা পদ্মকে স্পর্শ করেনি। তাই ঈশ্বরীর মৃত্যুতে

নিজেকে এত নিঃসহায় বোধ করছে পদ্ম। পদ্মর জন্য ভোমর বৌএর দুঃখ হয়। বর্ষার ভরা গাঙের মত কূল মাতানো যৌবন পদ্মর। ফাল্গুন পূর্ণিমার মত মন ভুলানো রূপ—অথচ,—একটা আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ভোমর বৌএর বুক চিরে। অথচ কোন কাজেই লাগল না। নারীর যৌবন তো পুরুষের জন্যই। একটু অনুরাগের উত্তাপ, একটু ভালবাসার উষ্ণতা, একটু সোহাগের আলাপনের বিনিময়ে সে যৌবন তো বিকিয়ে দেওয়া যায়। অথচ পদ্ম ওর রূপ আর যৌবনের সম্পদকে প্রাণপণে আঁকড়ে রইল। রূপ আর যৌবন তো কৃপণ মহাজনের সম্পত্তি নয়। নদীর বুকে এক লহমার হড়পা বাণের মত। এই আছে, এই নেই। একদিন পদ্মর চোখের ইশারায় তিয়াসির জোয়ানরা প্রাণ দিতে পারত। আজ তারা পদ্মকে ভয় করে। সম্ভ্রম করে। আড়ালে বলাবলি করে 'মাতব্বরের বিটি খর আগুন। শরীলটি ঝলসে যায় কাছে গেলে।'

কিন্তু এতে কি মন ভরে? ভোমর বৌ ভাবে। পুরুষের চোখে দেবী হ'য়ে লাভ কি? রসবতী নাগরীর যা আদর দেবীর ও কি তাই? না, ভোমর বৌয়ের মনে হয় কিছু কম।

কিন্তু কেন? ভোমর বৌ ভেবে পায় না, কার প্রতীক্ষায় নিজের জীবন যৌবন এ ভাবে অপচয় করল পদ্ম। কার পথ চেয়ে আশা-আকাঙ্খা সাধ-স্বপ্ন সব সে বিসর্জন দিল কালিন্দীর জলে?

পদ্ম কাঁদে। মেয়ের দল দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চুপভাবে। একটি যৌবনের কান্না! অপচয়ের বেদনায়। ভোমর বৌ এর কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে পদ্ম। পদ্মর আলতো খোঁপাটা গুছিয়ে দিতে দিতে ভ্রমর বৌ বলে 'মা গো' এমুন সরাবণের মেঘের মতন চুল গুলিনের কি দশা করেছে, যেমুন গরু বাঁধা পাঘা। তু আমার সঙ্গে চল পদ্ম, কাঁকই দিয়ে চুলগুলি বেঁধ্যে দিব।'

'আমার কিছু ভাল লাগছে নাই বৌ। তুমরা আমাকে এক টুকুন একা থাকতে দাও।'

'না' ভোমর বৌ সস্নেহে বলে আর তুকে একা থাকতে দিব নাই। ইবার করম পরবের পরে তুকে একটি সারা জেবনের জন্যি সঙ্গী কর্যে দিব।' পরক্ষণেই ওর মুখটা কাছে টেনে বলে 'ইবার তু আর না বলিস না বুন। মাতব্বর খুড়া চল্যে গেছে। তুর এখন জুয়ান বয়স। একা থাকাটাও ঠিক লয়। না হয় তু ই বল যদি তুর কেউ মনের মানুষ থাকে ?'

পদ্ম জবাব দেয় না। এ সব কথা আলোচনা করতে আজ আর ভাল লাগছে না ওর। বেলা গড়িয়ে আসছে। ওরা যাওয়ার উদ্যোগ করে। ঘর সংসার আছে। গেরস্থালীর কাজ আছে। পদ্ম দু হাঁটুর মাছে মুখ গুঁজে বসে থাকে।'

ভোমর বৌও উঠে বলে আমিও যাই পদ্ম। আলো ছেল্যাটা কাঁদবেক। তু না হয় কাল যাস। আজ ললিতা আর বিন্দি তুর কাছে শুতে আসবেক।'

ললিতা আর বিন্দি অর্থ্যাৎ ভ্রমর বৌত্রর দুটি কিশোরী কন্যা। পিতৃশোকাতুরা পদ্মর কাছে কারো থাকা দরকার। তাই ভোমর বৌ ওদের থাকার ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া পদ্মর যা মনের অবস্থা, কখন কি করে বসে বলা যায় না। ওরা সবাই চলে যায়। ঘরটা আবার খাঁ খাঁ করতে থাকে। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে মাতালী বুড়ীর কান্না শোনা যায়। সেদিন থেকেই মাতালী বুড়ী বেহুঁস। খালি নেশা করে পড়ে আছে। হুঁস হ'লেই ঈশ্বরীব নাম ধ'রে কান্না। চারিদিক নিঝুম। এ যেন বেলা শেষের হপ্তাহাট। সারাদিন ধ'রে কত রূপ, কত রঙ্গ, কত মানুষের আনাগোনা। সন্ধ্যা হ'লেই শ্মশানের নিস্তব্ধতা। জন-প্রাণীও নেই। শুধু হাটের চালাগুলো সদ্যপুত্র শোকাতুরা নারীর শূন্য হৃদয়ের মত গুমরে মরে।

ঈশ্বরী বেঁচে থাকতে এ বাড়ীর কল্কের আগুন নিভত না কখনও সারাটা দিন টিকেতে ফুঁ দিয়ে দিয়ে গাল ব্যথা করত পদ্মর। কত বড় মান্যির লোক ছিল ঈশ্বরী আসে পাশের আরও পাঁচটা ভুমিজ

গাঁয়ের বিজ্ঞ লোক। নানা সমস্যা, নানা 'গাঁওয়ালী' ব্যাপার নিয়ে সবাই 'বুঝসুজ' করতে আসত। আর আজ? পদ্মর মনে হয়, শুধু ঘরটাই নয়। পদ্মর বুকটাও যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। বৈশাখের শালই ডহরের মত ধু ধু। ঈশ্বরীর হুঁকোটা গড়াগড়ি খাচ্ছে উঠোনে। আকাশের দিকে তাকিয়ে নানা কথা ভাবে পদ্ম। মানুষ মারা গেলে নাকি আকাশের তারা হয়। হয়ত তার বাপও তারা হয়ে আকাশের লাখো তারার মাঝে মিশে আছে। হয়ত বা পদ্মর দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষে। পদ্মর অবুঝ মন আকাশের অগুনতি তারার মাঝে দিশেহারা হ'য়ে যায়। তারপর পদ্ম এক সময় হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। 'কেউ নাই, আমার কেউ নাই' ওর কথাগুলোই যেন ওর অবচেতনে ওকে অতন্দ্র করে তোলে। পদ্ম একাকী। পদ্ম নিসঙ্গ। পৃথিবীতে সবারই সঙ্গী আছে। সুর্য্যের ঝিলমিল আলোতে আকাশের বুকে যে ডাহকীটা ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় তাকেও নিঃশব্দে অনুসরণ করে তার সঙ্গী। অথচ পদ্মর আজ আর কেউ নেই। কেউ নেই যে ওর সুখ দুঃখের অংশীদার হ'তে পারবে। যে ওর আকাজ্ক্ষায় কামনায় স্বপ্নে শুধু একান্তভাবে তারই হ'তে পারবে। অথচ সবই সম্ভব ছিল যদি সেই নির্জ্জন রাত্রিতে নীরব প্রেমের লজ্জায় পদ্ম পান্নুকে ফিরিয়ে না দিত। লজ্জা আর সঙ্কোচের বাধায় পদ্ম তাদের স্ফুটনোন্মুখ প্রেমের কুসুমকে দলিত করেছে। আর তারই প্রতীক্ষায় পদ্মর জীবনের শেষ দিনগুলি বৃথাই কেটে গেছে। আজ চোখের জল আর অতীত দিনের স্মৃতি ছাড়া অন্য কোন সম্বল নেই। স্মৃতি আনন্দ দেয় না। শুধু বেদনার কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে। পাওয়ার তৃপ্তিতে যদি মন ভরে থাকে তাহ'লে অতীতের স্মৃতি সেই আনন্দের পসরাকে কানায় কানায় ভরে তোলে। যেখানে শুধুই না পাওয়ায় বেদনা, সেখানে স্মৃতি কুপের কাঁটার মত বিঁধে থাকে। পান্নু একদিন যে উপকার দিয়ে পদ্মর প্রেমকে বরণ করতে চেয়েছিল আজ সেই উপকার সে ভগবানকে অর্ঘ্য দিয়েছে। একদিন যে ঐকান্তিকতা সে সঞ্চয় করেছিল পদ্মকে

ঘরে তোলার জন্য আজ সেই ঐকান্তিকতা দিয়ে সে ভগবানকে মনিকোঠায় প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। পান্নু কৃপা পেয়েছে ভগবানের। আর পদ্ম? শুধু লজ্জার আড়ালে আগলে রেখেছে একটি নিভু নিভু প্রেমের প্রদীপ। জীবন যৌবন সব ব্যর্থ হ'য়ে গেছে আজ। কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না পদ্ম গরবিনী নয়, আরও পাঁচটা মেয়ের মতই সাধারণ। পদ্মও বাঁচতে চেয়েছিল একটি সুখী গৃহস্থ পরিবারের বধূ হয়ে, কর্ত্রী হ'য়ে। পদ্মর হৃদয়েও সখ ছিল, সাধ ছিল। আর ছিল একটি লুব্ধ ভ্রমরের মন। যৌবনের স্বর্ণময় দিন গুলির বিনিময়ে সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছিল। একদিন যে প্রেম ওর ক্ষনিকের লজ্জায় ধুলোয় লুণ্ঠিত হ'য়েছিল, সেই লজ্জার বেদনাকে পদ্ম ভূলতে পারেনি। তাই যারা ওর কাছে আসতে চেয়েছে পদ্ম তাদের বার বার ফিরিয়ে দিয়েছে। সমাজে গুঞ্জন উঠেছে মাতব্বরের মেয়ের ভারী গুমোর। পদ্ম শুধু ঠাকুরের কাছে প্রার্থণা জানিয়েছে ঠাকুর আমি যেন দ্বিচারিনী না হই। আমি যে তাকেই আমার দেহ মন সঁপে দিয়েছি। কিন্তু আজ? আজ যে সবই মিথ্যা হ'য়ে গেছে।

'পদ্ম'

'কে' পদ্মর চিন্তা বিঘ্নিত হল।

একটা দুরাগত সম্ভাষণের মত কার ডাক পদ্মর কানে এসে বাজল। কৈশোর কালের গোঠালীর দিনগুলো যেন কেঁপে কেঁপে উঠল চোখের সামেন। তখনও ভোরবেলায় পান্নু এমনি আবেগ মথিত স্বরে পদ্মকে ডাকত। আর শুধু এই ডাকটুকুর জন্য পদ্ম রাত্রির শেষ প্রহর থেকে জেগে বসে থাকত।

ছিঃ ছিঃ একি ভাবছে ও। অবাধ্য মনকে ধিক্কার দেয় পদ্ম। পান্নু ঈশ্বরে সমর্পিত। পান্নুর সম্বন্ধে এভাবে চিন্তা করলে পাপ হবে ওর। আর ঈশ্বরের অনুগামিকে পথভ্রষ্ট করার মত পাপ আর নেই।

চকিতের জন্য শিহরিত হ'ল পদ্ম। তারপর বিস্রস্ত বেশকে সংযত ক'রে প্রদীপের শিখাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বাইরে বার হ'ল।

'ভিতরে এস সন্নাসী।'

ভেতরে একটা মাতুর বিছেয়ে দেয় পদ্ম। পান্নু বসে। পদ্মর দিকে খানিক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর বলে 'ই কি চেহারা করেছ পদ্ম? ই ভাবে শরীলটিকে ক্ষয় করে লাভ কি?'

পদ্ম ম্লান হেসে বলে সব কিছু কি লাভ লোকসানের হিসাবে বাঁধা থাকে সন্নাসী। তাছাড়া, ই পোড়া শরীলের দাম কি? মর্যে গেলে তু ফোঁটা চ'খের জল ফেলারও যে কেউ রইল নাই।' পদ্মর চোখ তুটো ছল ছল করে।

'ছিঃ ছিঃ উ কথাটি বল না, ভগবান শরীল দিয়েছেন সিটিকে রক্ষা করবার জন্যি, ক্ষয় করবার জন্যি লয়। শরীলকে রক্ষা করার নামই 'ধম্ম'। ক্ষয় করার নাম পাপ।

'মিন্তুক আমার যে আর বেঁচে থাকার সাধ নাই সন্ন্যাসী।

পান্নুর মনটা যেন, আবেগে শির শির করে।

'উ কথা মুখে এন না পদ্ম। আপনার জন কি কারও চেরকাল বেঁচে থাকে? মায়ের কোল থিকে সন্তান চ'ল্যে যায়, স্ত্রীর বন্ধন থিকে স্বামি চল্যে যায়। তবু মান্নুষকে বাঁচতে হয়। বাঁচার নামই 'ধম্ম'। বাঁচার জন্যি জন্ম হ'য়্যেছে পৃথিমিতে।'

'সন্ন্যাসী, তুমি অতি গেয়ানী লোক। তুমি ভগমানের পায়ে লিজেকে সঁপে দিয়েছ তাই কুন ব্যথাই তুমার পরাণে বাজে না।

একটা তীব্র জ্বালায় ছটফট করে উঠল পান্নু। পান্নুর চীৎকার করে ব'লতে ইচ্ছে হ'ল মিথ্যা কথা। আমিও মান্নুষ। আমারও ইচ্ছে হয় সুখী হ'তে, অপরকে সুখী করতে, কিন্তু—কিন্তু সে কথা পান্নু ব'লতে পারল না। ওর বাইরের সন্ন্যাসীটা ওকে বাধা দিল।' ঝুটো দেবত্বের মায়ায় সে কথা পদ্মকে ব'লতে পারল না পান্নু। পান্নু শুধু বল্ল 'না, পদ্ম তুমি যা ভাবছ তা লয়।'

পদ্ম সে কথা বোঝে না। 'সন্ন্যাসী, তুমি সন্নাসী। 'পদ্ম বলে 'আমি হচ্ছি মেয়্যা মান্নুষ। তুমার সখ সাধ স্বপ্ন সব ভগমানকে ঘিরে।

মিস্তুক আমি? আমার ত' সাধ ছিল, স্বপ্ন ছিল? সবই আজ বিফল হয়্যো গেছে। আমি বাঁচব কি লিয়ে?'

পদ্মর মনের ভাবটা পান্নু বুঝতে পারে না। তহ'লে কি ঈশ্বরীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পদ্মর বিয়ের সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে? পদ্ম কি সেই আশঙ্কায় ব্যথাতুর? পদ্ম কি অন্য কারও প্রণয়াস্পদা? আর ঈশ্বরীর মৃত্যুর পর কি সে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে? নানা বিচিত্র সম্ভাবনার চিন্তা মাথার মধ্যে জট পাকায় পান্নুর। একটা ইঙ্গীত স্পষ্ট করে বলবার প্রয়াসে পান্নু বলে 'কিছুই বিফল হয় নাই পদ্ম। তুমার মনটি ভাল কর্যে খুঁজে দেখ। মাতব্বরের মৃত্যুতে কুন কিছুই খোয়া যায় নাই তুমার। যারা তুমাকে আপনার জন ভাবে, তুমাকে ভালবাসে তারা আজও তুমাকে ভালবাসে। ইয়ার জন্যি মিছে দুশ্চিন্তা কর্যে শরীলটি পাত কর না তুমি।'

পদ্ম পান্নুর ইঙ্গিত বোঝে না কারণ পদ্ম জানে, যারা কাছে আসতে চেয়েছিল তাদের নিষ্ঠুর পরিহাসে ফিরিয়ে দিয়েছে। এবং পান্নু ঈশ্বরে সমর্পিত। পদ্ম একটি নিরুদ্বেগ আশ্রয়ের আশায় বেনামি বন্দরে নোঙ্গর করতে চায়নি। আজ নিসঙ্গ সাগরে একাকী ভাসমান। পদ্ম ওর মধ্য যৌবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে জীবনের ব্যর্থ বসন্ত গুলির স্মৃতি রোমন্থন করে। সেই প্রথম প্রেমের লজ্জার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি জলাঞ্জলিকে দিয়ে। তখন আশা ছিল পান্নু আবার ফিরে আসবে। আবার কানায় কানায় ওর দিনগুলি ভরে উঠবে। পান্নু এসেছে। নিজের চারপাশে একটা অনির্ব্বান আগুনের শিখার গণ্ডি দিয়ে। তাকে দেখা যায়। ছোঁয়া যায় না।

এবং একই কথা পান্নুও ভাবে। কিন্তু কেউ কারো কছে স্পষ্ট হ'তে পারে না। পান্নুর সন্ন্যাসের আবরন তাকে একটা সঙ্কোচের বেড়াজালে বদ্ধ রাখে। জানতে দেয় না তার হৃদয়ের উত্তাপ। মুখ ফুটে বলতে দেয় না 'পদ্ম গো আমি তুমাকে ভালবাসি। আজও ভালবাসি।'

এবং এই ঘোষণায় সোচ্চার হ'তে পারে না পদ্মও। পদ্মর মনে সর্ব্বদাই ভয়, যে তার সব কামনা বাসনা ভুলে গিয়ে নিজেকে সমর্পণ করেছে ভগবানের পায়ে। তার কাছে হৃদয়ের উষ্ণতা প্রকাশ করবে ও কোন আশ্বাসে। তার চেয়ে চিরদিন অজানা থাক ওর দীর্ঘ লালিত প্রেমের স্বপ্ন। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা অতৃপ্তির বেদনা কাঁটার মত বিঁধে থাকে ওকে। পদ্ম বুঝতে পারে না কিসের এ জ্বালা। ওর দেহের কোষে কোষে, স্নায়ুতে স্নায়ুতে সেই তীব্র জ্বালা ও অনুভব করে। সঙ্গে সঙ্গে যেন দুর্বার মরণের হাতছানি। এক দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয় দুটি অবুঝ প্রেমিক প্রেমিকা।

পুরোন কথার সুত্র ধরে পদ্ম বলে 'শরীলটি ত' অনেক দিন ধরে রাখলাম সন্ন্যাসী। ইবার ভেঙ্গে পড়ল্যেই বা ক্ষতি কি ?'

পান্নু উল্লসিত হয়। বেশ কথা বুলেছ পদ্ম। মিস্তক ফুল ফুটে, তাকি কেউ খোঁপায় গুঁজবেক বল্যে ? ফুটে উঠা টি ফুলের ধম্ম, তাই ফুটে। তেমনী জেবন দিয়েছেন ভগবান। জেবনের ও ধম্ম আছে। জেবনের ধম্ম তিনটি। তিনটি ধম্মের তিনটি কাল। বাল্য, যৈবন আর ব্রেদ্ধকল। তার মধ্যে যৈবন কালটি সেরা সময়। বছরে যেমন বসন্তকাল। এই যৈবনটি ব্রেথা কাটিয়ে লাভ কি ?'

পান্নু হয়ত আরও কিছু বলত। কিন্তু সহসা একটা উদ্ধত প্রশ্ন করে পদ্ম তুমার যৈবনটিও যে ব্রেথায় কাটল সন্ন্যাসী ? কি লাভ হল্য ইয়াতে ?'

আনমনেই পান্নুর মুখ থেকে বেরিয়ে যায় 'যার কেউ নাই পদ্ম, তার ভগমান আছে।'

কথাটা বলেই অত্যন্ত অনুতপ্ত বোধ করে পান্নু। বার বার ভগবান আর ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে পদ্মর কাছে নিজেকে দুর্বোধ্য করে তুলছে শুধু। প্রাণ ভ'রে প্রাণের কথাটা বলতে পারছে না। নানা জটিল তত্ত্বর বেড়া জালে পদ্মও দিশেহারা হ'য়ে পড়ে। পান্নুকে বুঝতে পারে না ও।

পদ্ম সঙ্কুচিত হয়। কথাটা বলা ওর অন্যায় হ'য়েছে। নিজেরই

এই শোকাকুল অবস্থায় প্রশ্নটা নিতান্তই অশোভন। বিরক্ত বোধ করে পদ্ম। থাক। এ প্রসঙ্গ বাড়িয়ে লাভ নেই। নিজের দুঃখ নিজেরই থাক। কাজ কি তাকে বাইরের আলোতে টেনে এনে। লাভ কি অপরকে নিজের ব্যথার কথা জানিয়ে। বিশেষ করে এক সংসার ত্যাগী বিবাগীকে।

পান্নুও তার ক্ষণ পূর্ব্বের বিচ্যুতির জন্য মনে মনে আফশোষ করছিল। উত্তরটা যথাযথ দেওয়া হয় নি। অন্ততঃ এই সুযোগে পান্নু ওর গোপন ইচ্ছাটা জানিয়ে দিতে পারত পদ্মকে। কিন্তু পরক্ষনেই সংশয়ে বিচলিত হ'ল পান্নু। পদ্ম কি এই দশবছরের দীর্ঘ ব্যবধানে অপর কারো জন্যে আকর্ষণ বোধ করেনি? ভালবাসেনি অন্য কাউকে? তার হৃদয়ে পান্নুর জন্য স্থান কতটুকু এই অনুচিত প্রশ্নটা পান্নুর মনটাকে তোলপাড় করে তোলে। হায়রে যুবতীর মন। পান্নুর অন্তরটা ব্যথায় মুচড়ে ওঠে।

পদ্মর মনের মাঝে একটা অসহ্য তিক্ততা জমে ওঠে।

'রাত হইছে সন্ন্যাসী, তুমি ইবার ফিরে যাও।'

'ফিরে যাব 'পান্নু' অসাবধানে বলে ফেলে।

'তুমি কি সারারাতই ইখেনে পড়্যে থাকতে নাকি?' পদ্মর কণ্ঠে বিরক্তিটা চাপা থাকে না:

দ্বিধাগ্রস্ত পান্নু সঙ্কোচের সঙ্গে বলে 'না না, তুমি অপরাধ নিও না পদ্ম, আমি ভাবছিলাম এই রাইত বিরাতে তুমি একলা থাকলে যদি ভয় ডব লাগে?'

'ভয় ডর কিসের?'

'কুন অপদেবতার?'

'অপদেবতার ভয় আমার নাই সন্ন্যাসী। আমার ভয় দেবতার আর মানুষের। সি জন্যি তুমি চিন্তা কর না। তুমি লিভাবনায় ফিরে যাও।'

অব্যক্ত বাণীর বেদনা বুকে নিয়ে পান্নু ফিরে যায়।

আজ পার্শ্ব একাদশী। করম পরবের জাগরন। ভোমর বৌ

এর উঠোনে করম গাছের ডাল পুঁতে করম দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করা হ'য়েছে। মাটিতে। রাশি রাশি ভাট আর কুর্চি ফুল। সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো হ'য়েছে। মাটির ভাঁড়ে ধূনো দেওয়া হয়েছে। বাতাস ধুনোর গন্ধে ভারী হ'য়ে উঠেছে। চোখ ছুটো বুজে আসে। সারা রাত ধরে নাচ গান চ'লবে। ভোমর বৌয়ের বাচ্চাগুলো আর পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দাপাদাপি করছে। মেয়েরা নাচবে ছোট ছোট দল করে। ছেলরা মাদল বাজাবে। গাঁয়ের যুবতী মেয়েরাই এই নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার অধিকারী। মা মাসীরা ঘর ধেকে বেরুবে না। ঘরে বসে তৈরী করবে রকমারী পিঠে।

ঘর দোর নিকোবে আর মাঝে মাঝে দেখবে ছেলেমেয়েদের উল্লাস। মাঝে মাঝে মন চলে যাবে অনেক পিছনে। ফেলে আসা অতীতের পানে। আধো আলো আধো আঁধারে করম সঙ্গীতের সুরে সুরে ভেসে আসবে সেই ছুরাগত স্মৃতির সুবাস, কারো নিবিড় অন্তরঙ্গতার উত্তাপ······তারপর হাঠাৎ কোন উজ্জ্বল যুবতীর চকিত হাসিতে সম্বিত ফিরবে। মনে পড়বে পিঠের ওপরে সরাটা চাপানো আছে: সাদাটে ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ। জীভ কেটে আপন মনেই ব'লবে 'হেই মা গো, আমি পাসর্যে গেছলম। পিঠাগুলিন বোধ হয় পুড়্যে গেলেন।' ঝটিতি রান্নাশালের মধ্যে ঢুকে গিয়ে মনটাকে শান্ত করে। বুকটা টনটন করে একটা মিষ্টি ব্যথায়।

যে মেয়েরা হালে এ গাঁয়ের বৌ হয়ে এসেছে প্রথম সুযোগ তাদেরই। প্রথম প্রথম লজ্জার আড়ষ্টতাটা কাটতে চায় না। তারপর নেশার মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। ওরা গাইছিল

করমা পরবে নৈহর যাব
শশুর ঘরে আর না রহব
করমা পরবে নৈহর যাব···

অনেকদিন আগে বাপের বাড়ী থেকে এসেছে। মন আর মানছে না। এবার মন টানছে বাপের বাড়ীর পানে। এবার

বৈশাখ মাসে একটা ভাই হ'য়েছে। তাকে ও এখনও দেখেনি। কালো কোঁকড়ান চুল। দীঘল দীঘল চোখ। গানের সঙ্গে মাদল বাজে। কুড় কুড় তাং কুড় কুড় তাং।

এ গাঁয়ের মেয়েরা, যারা সম্পর্কে ওদের ননদিনী তারা হেসে এ ওর গাঁয়ে লুটিয়ে পড়ে। ওদের মধ্যেই দু একটি মেয়ে মাঝে মাঝে ফুট কাটে। হেই গো লতুন বৌ, নৈহর গেলে যে দাদায় যে উদমায় যাবে। উদমায় যাওয়া অর্থে পাগল হ'য়ে যাওয়া।

নতুন বৌটি সবার সামনে এই ভাবে উপহসিত হওয়ার জন্য দারুণ লজ্জায় পড়ে! মাদল বাজাচ্ছিল ওর স্বামি। তারও হাতটা হঠাৎ বেতালে বাজায়। আল্‌তো পা ফেলে মাদলে বোল তোলে, 'কুড় কুড় তাং, কুড় কুড় তাং। ধা ধেনাক, ধা কেটে ধেনাক, ধাকেটে ধাকেটে ধাকেটে থুন, ধাকেটে ধাকেটে ধাকেটে ধাকেটে ধেনাক্। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরাও তেহাই দেয় 'কুড় কুড় তাং কুড় কুড় তাং।'

একসময় পরিশ্রান্ত হ'য়ে দাওয়ায় বসে পড়ে। দু একটা হাল্কা রসিকতা করে নিজেদের মধ্যে। হাসে। হেসে গড়িয়ে পড়ে। পুরুষরা বিরক্তির ভান করে 'কি যে হিহি করো হাসে 'আনখাই ভাল লাগে নাই।'

কিন্তু এই নাচ গান, এই উচ্ছল আলাপন সাড়া জাগায় না পদ্মর প্রাণে। পদ্মর বয়সি মেয়েরা কেউই এখনও অনূঢ়া নেই। এমন কি ওদের গোঠালীর সময় যে ছেলে মেয়ে দুটো কোমরে ঘুনসি বেঁধে শালই ডহরের মাঠে ফড়িং আর প্রজাপতি ধরে বেড়াত তারাও জোয়ান হয়েছে। এই নাচের আসরেই তাদের চোখ ঠারাঠারি দেখেছে পদ্ম। সবাই আজ ঘর সংসার করছে। একটি সুখী গৃহস্থর বৌ হয়ে প্রদীপ দিচ্ছে তুলসী তলায়। কখনও স্নেহে কখনও শাসনে দামাল ছেলেকে আগলে রাখছে। মুখে বিরক্তির চিহ্ন কিন্তু অন্তর স্নেহের রসে সিঞ্চিত। এই নাচের আসরে মত্ততা নেই। বন্যতা নেই। কেমন যেন একটা পরিপূর্ণতার আভাস ছড়ান রয়েছে সর্বত্র। আজ শুধু আলোচনা স্বামী আর সংসার নিয়ে। ভালবাসার জন

আর তাদের অবুঝ মন নিয়ে। নিজেদের ছোট্ট গণ্ডির মাঝে ভরে উঠেছে পরিতৃপ্ত পারাবত হৃদয়গুলি। অশান্ত সমুদ্র যেন হঠাৎ নিস্তরঙ্গ হ'য়ে গেছে। এই সৌরভি, রাধা, ময়না এরা যেন দাঁড়ের পাখী। বাঁধা আছে সংসারের সোনার শিকলে। আর ললিতা, বাসন্তী, সরস্বতী, এরা যেন বনের পাখী। ওদের মন যেন আশায় আর আশ্বাসে উদ্বেল। গোঠালীর সময় সৈরভী দুষ্টুমি করে অপরের ক্ষেতে গরুগুলো ছেড়ে দিত। রাধা গাছের মগডালে চড়ে পাখীর বাসা পেড়ে আনত, আর ময়না ডুরে শাড়ীটা কাছা করে পরে যাত্রা-দলের শ্রীকৃষ্ণ অনুকরণে চীৎকার করে গাইত 'রাধে তোর তরে আমি কদম তলায় বসে থাকি। কাজল পরা জোড়া আঁখি।'

এরা এখন কত শান্ত কত নিরুদ্বেগ। আর এদেরই পাশে পাশে কোমরে পলা আর পুঁতির মালা পরা একদল ছেলেমেয়ে শালই ডহরে ছুটোছুটি করত। এরাই আজকের আসরের মধ্যমণি। যৌবনের আনন্দে দুর্বার, খুশির সাহসে বেপরোয়া।

পদ্মর নিস্তরঙ্গ যৌবনের সমুদ্রেও একদিন জোয়ার এসেছিল। কিন্তু সেদিনও সে নির্বিকার। ওর নিরুত্তাপ প্রেম ওকে উদ্দাম করে তোলেনি। কোন প্রকাশ ছিল না ওর আচরণে। ছিল না তুর্নিবার আবেগের ক্ষীণতম ইশারা। পদ্মর অন্তরের গহণ অঞ্চলে একটি শুক্তি যেন দিন গুণছিল মুক্তির কামনায়। কবে সূর্য্য কিরণের স্পর্শে তার রূপান্তর ঘটবে। কবে সে মেলে ধরবে তার সাতরঙ্গ ঝিনুকের পাপড়ী তাই আজও—

পদ্মর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয় এল।

ভোমর বৌ ফিসফিসিয়ে বলে 'মনটি বুঝি উথলি পাথালি করছেন।'

পদ্ম ম্লান হেসে বলে 'কিসের লেগ্যে ?'

'মনের মানুষের লেগ্যে।'

'মনের মতন মনের মানুষ খুঁজে পেলম কই ?' একটু ইতস্তত: করে ঈষৎ কঠিন স্বরে ভোমর বৌ বলে 'মনের মানুষকে আঁচলে

'গাঁঠাই' রাখতে হয় পদ্ম। দামি জিনিষ, 'সর্বদাই চুরী যাওয়ার ভয়।'

'মিস্তুক ফাঁকা আঁচলে গিরা দিয়ে লাভ কি?' ভ্রমর বৌ আক্ষেপ করে বলে 'যে মেইয়্যার আঁচল ফাঁকা তার মরণ ভাল।'

পদ্মর চোখ দুটো ছলছল করে। 'ঠিকই বুলেছ বৌ। আমার মরণই ভাল।'

সস্নেহে পদ্মর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভ্রমর বৌ বলে 'তু কাঁদিস না বুন। আমি তামাশয় করলম।'

বাইরের জমাট অন্ধকাবের দিকে তাকিয়ে পদ্ম জবাব দেয়' 'তামাশাটিই আমার জেবনের সব থিকে বড় সত্যি।'

মেয়েদের কলকাকলী ভেসে আসে। আবার নাচ সুরু হবে। এবার নাচবে কুমারী মেয়েরা। আজ এদের জীবনের একটি পরম শুভক্ষন। এরপর হয়ত বিয়ে হ'য়ে যাবে। এখন ঘর গেরস্থ, চাষ আবাদ। দুপুরের সোনালী রৌদ্রে ঝিক্‌মিক করবে কাঁসার কানা ওঠা থালা, মাথায় ব্যাসাম নিয়ে স্বামীকে পৌঁছে দেবে পাহাড়তলীর ক্ষেতে। সেখানে গায়ের লোনা ঘাম মিশিয়ে লাঙ্গল চালাচ্ছে সে। সন্ধ্যায় গরুগুলোকে ঘরে তোলা, সকালে ঘর নিকোন। গোয়াল পরিস্কার··· একটা পরিপূর্ণতার স্বপ্ন যেন সার্থকতার প্রতীক্ষায় দিন গোণে আর সেই সোনালী নেশায় বুঁদ হ'য়ে রাত ভোর নাচে ওরা। কিন্তু পদ্ম? একটি অনাঘ্রাত ফুলের মত অকালে ঝরে যাবে। কেউ জানবে না সেই ফুলের পরাগ কোশের ছায়ার কত পিপাসা, কত ক্লান্তি। ভোমর বৌ পদ্মর ব্যথা বোঝে। পদ্মর মনে কোন কাঙালপনা নেই। তাই আজ এই মিতালীমুখর অনুষ্ঠানে নিজেকে বড় একাকী মনে হয়। ঈশ্বরী যদি বেঁচে থাকত তাহলে হয়ত শূন্যতা ও একাকীত্ব-বোধটা এত প্রকট হয়ে উঠত না। কিন্তু আজ এত কোলাহলের মধ্যেও পদ্মর মনে হ'ল পৃথিবী বড় নির্জ্জন, এত জনতার মাঝেও মনে হ'ল মানুষ কখনও কখনও বড় নিঃসঙ্গ। এই উপলব্ধি ওকে বারবার পীড়া দিতে লাগল। একদিন যে আনন্দে সোনালী

দিনগুলো উন্মুখ প্রতীক্ষায় কাটিয়েছে পদ্ম আজ মনে হল তার কোন মূল্য নেই। একটা ছায়ার পিছনে শুধু ছোটাছুটি করেছে। একটি গৈরিক বসনের বিনিময়ে পান্নু তার সব আকাঙ্খা সব স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়েছে। ইহকালের ইপ্সিতের জন্য তার কোন আকর্ষণ নেই। পরকালের মুক্তির জন্যই সে উন্মুখ। আর তার সেই সাধনাকে বিঘ্নিত করার প্রবৃত্তি পদ্মর নেই। কারণ পদ্ম স্বর্গবাসী অপ্সরী নয়। পদ্ম মানুষ। এবং দেবতারা যা পারে মানুষ তা পারে না।

মাতব্বরের মৃত্যুতে তিয়াসি কয়েকদিনের জন্য শোকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে আবার সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে এল। ঈশ্বরীর শূন্যস্থান পূরণ করবার জন্য এতদিন নীলকণ্ঠই ছিল সম্ভাব্য প্রার্থী। কিন্তু তার মধ্যেও নানা মতভেদ দেখা দিয়েছে। হোক না নীলকণ্ঠ ইস্কুলে পড়া ছেলে। তাই বলে প্রবীণতান্ধ কি কোন দাম নেই? নীলকণ্ঠর তো জোয়ান বয়স। পৃথিবীটাকে আরও ভাল করে দেখুক, তারপর বয়স হ'লেই সেও গ্রামে নেতৃত্বের অধিকার পাবে। ঈশ্বরীর ইচ্ছে ছিল নীলকণ্ঠই যেন তার মৃত্যুর পর মাতব্বর হয়। কারণ ও নবীন জীবনের দিশারী। ওর চোখে নতুনের নেশা। হয়ত নীলকণ্ঠর নেতৃত্বে যা কিছু পুরাতন, যা কিছু জীর্ণ সব দূরে ফেলে দিয়ে তিয়াসি নতুনের রাজবেশে সজ্জিত হবে। নীলকণ্ঠর চোখেও সেই আশার ঝিলিক দেখেছিল ঈশ্বরী। কিন্তু গোলমাল বাধিয়েছে হেঁটকুলীর লোকেরা। এতকাল মাতব্বর ছিল উভয় কুলীর লোক। জোয়ান বয়সের কাউকে যদি মাতব্বর করতে হয় তা'হলে হেঁটকুলীর চম্পাই কি দোষ করল? নটবরের ছেলে? এবার হেঁটকুলীর একজন না হ'লে যে আর মর্য্যাদা থাকে না। মন্দির তৈরী সমাপ্ত হ'য়েছে। পান্নুই সে মন্দিরের সেবাইত। মাতব্বরের মৃত্যুতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দু একদিনের জন্য একটু ব্যাহত হ'লেও পান্নুর আতিথ্যের প্রতি এতটুকুও শৈথিল্য হয়নি। আজও গ্রাম দেবতার মন্দিরে সাধুর জন্য বরাদ্দ আসে। চাল, ডাল,

গেরস্থবাড়ীর তরি তরকারী। কোন অভাব নেই। অসুবিধা নেই। এই আয়েসের মধ্যে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে পান্নু। মনটা খাঁ খাঁ করে। এ তো সে চায়নি। কোথা থেকে কি যেন হ'য়ে গেল। হঠাৎ নিজেকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলল। অথচ যাকে ঘিরে পান্নুর রাত্রিদিনের স্বপ্ন সেই অজানা রইল। মন্দিরের চত্বরে ব'সে ভাবে পান্নু। ফেরীর নৌকা একই ঘাটে বাঁধা থাকে চিরকাল। কিন্তু সওদাগরের নৌকা দেশ থেকে দেশান্তরে যায়। পান্নুর মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

হাতে একগাছা লাঠি আর একটা লণ্ঠন নিয়ে কাকে যেন মন্দিরের দিকে আসতে দেখা যায়।

'কে?' ধীর কণ্ঠে পান্নু জিগ্যেস করে।

'আমি নীলকণ্ঠ।'

অভ্যাস বশতঃ বুকটা ছম ছম ক'রে ওঠে। নীলকণ্ঠকে দেখলেই কেন যেন শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে পান্নু। ওর চাউনী, ওর কথাবার্তা সব কিছুই যেন খটাসের মতন অনুসন্ধানী মনে হয়।

'এস্য নীলকণ্ঠ, বস্য।'

নীলকণ্ঠ লাঠি গাছাটা আর লণ্ঠনটা চত্বরে রেখে মন্দিরের দেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণীপাত করে খানিকটা ধূলো ঠেকায় মুখে মাথায়। পান্নু হেসে বলে 'মন্দিরটি তুমিই দাঁড়াই থিকে তৈরী করাল্যে, মিন্তুক ঠাকুর প্রতিষ্ঠার পর আজ পেরথম দেখতে এল্যে। মাতব্বর হবার বর চাইলে বুঝি।'

চত্বরে এসে পান্নুর মুখোমুখী বসে নীলকণ্ঠ। তারপর বলে 'মিছা লয় কথাটি। কিন্তুক তার লেগ্যে শুধু ঠাকুরের আশীর্ব্বাদেই কাজ 'উসরাবেক নাই, সন্ন্যাসী, তুমার আশীর্ব্বাদও চাই।'

পান্নু বিগলিত হয়। দরদভরা গলায় বলে আমাদের 'আশীর্ব্বাদ ত' অহরহই তুমাদের সঙ্গে রইল হে।'

'তা বটেই, তা বটেই, তবে কিনা হেঁটকুলীর লোকরা বড় বাগড়া দিছেন হে। উনারা বলেছেন চম্পাইকে মাতব্বর করতে হবেক।

নাইলে নটবরকে। নবীন লোক। কিন্তুক বয়স বাড়লেই কি পবীন হয়? না বাঁদর বুড়্যালেই মুরুব্বি হয়? তুমিই বল কেনে সন্ন্যাসী?'

একটা নির্বিরোধ উত্তর চিন্তা করে পান্নু। 'তবে সি কথাটি গাঁয়ের লোকরাই বিচার করবেন।'

'না হে, ইয়ারা সবাই ভেড়ীর জাত।'

ইয়াদের লিজেদের কুন কথা নাই। সি জন্যিই ত' তুমার কাছে আসা।

কিন্তু এ ব্যাপারে পান্নু কি সাহায্য করতে পারে পান্নু ভেবে পায় না।

'আমি মাতব্বর হল্যে গাঁয়ের চেহারাটি বদলাই দিব। ইখেনেও রাধানগরের মতন হাঠ বসবেক। দোকান পাট বসবেক। হাঠুর্যা আসবেক বেসাতি নিয়ে ল'পাড়া, গোবিন্দপুর, চন্দনপুর দাস পাড়া থিকে। বাস চলবেক। সাইকেলের দোকানে কলের গান বাজবেক।' 'বলতে বলতে চোখ দুটো স্বপ্নাতুর হ'য়ে ওঠে নীলকণ্ঠর। যেন ও চোখের সামনে দেখতে পায় সেই সাইকেলের দোকান। যেখানে কলের গান বাজছে 'ঝিঙ্গা ফুল লিলেক জাতি কূল'···যেখানে বাসের খালাসি প্যাসেঞ্জারদের জানান দিচ্ছে 'হেই দাসপাড়া, গোবিন্দ-পুর, চন্দনপুর, তিয়াসি। বাসটা তিয়াসিতে এসে রাত কাটাবে, তারপর ভোরে আবার ছেড়ে যাবে। ড্রাইভার বাবু মন্দির চত্বরে বিছানা বিছিয়ে রাত কাটাবে খালাসি বাবু গাছটার তলায় ব'সে ব'সে বিড়ি টানবে। তারপর রিলীফের রাস্তা। জিয়ারের গম। আহা···

'কিন্তুক তুমি আর তুমার ঠাকুর সাহায্য না করল্যে কিছুই হবেক নাই সন্ন্যাসী। যে তিয়াসি সেই তিয়াসিই থাকবেক। সেই পলাশের তিনটি পাতা।' ওর বক্তব্য শেষ করে নীলকণ্ঠ।

এখনও বুঝতে পারে না পান্নু। 'ঠাকুরের কাছে ত' তুমি লিজেই 'পাথ্থনা' জানাল্যে। কিন্তুক আমি কি সাহায্য করব হে?'

'তুমার সাহায্যটিই বেশি দরকার হে। ঠাকুর ত' পাথরের দেবতা। না পায় দেখতে, না পারে কথা বলতে। ঠাকুরেব যা কিছু বলার সি ত' তুমি বলবে।'

তবুও কথাগুলো রহস্যময় বলে মনে হয় পান্নুর কাছে। এবার ঈষৎ প্রাঞ্জল হবার চেষ্টা করে নীলকণ্ঠ :

সন্ন্যাসী তুমি ঠাকুরের কেরপা পেয়েছো। হেঁটকুলীর লোক। উপর কুলীর লোক তুমাকে সমান মানে তুমার কথায় পেত্যয় করে। তুমি বল্লে, উয়াদের মনে কোন সন্দেহ থাকবেক নাই। তাহল্যে আমার মাতব্বরিটাই বাঁধা হয়ে থাকবেক।

পান্নু তটস্থ হয়। জোর করে একটা বিশ্বাস ওদের উপর কেমন করে চাপাবে ও? তাছাড়া নীলকণ্ঠর ধ্যান ধারণার সঙ্গে ওদের মিলবে না। শেষ পর্যন্ত হয়ত সুনিবিড় শান্তির গাঁয়ে একটা চিরস্থায়ী কলহের সৃষ্টি হবে। পান্নু তা চায় না। পান্নু তিয়াসিকে ভালবাসে।

পান্নু এড়াবার চেষ্টায় বলে 'আমার কথা যদি উয়ারা না মানে?'

নির্লিপ্ত কণ্ঠে নীলকণ্ঠ বলে 'তখুন না হয় ঠাকুর একটা স্বপন টপন দিবেন তুমাকে, যি নীলকণ্ঠই তিয়াসির মাতব্বর হবার যোগ্য লোক। তাহল্যেই আর কারো অবিশ্বাস থাকবেক নাই। তাছাড়া তুমরা দেবতার কাছের লোক। স্বপন টপন দেখবে ইয়াতে আর আশ্চর্য্যির কি?' হঠাৎ গলাটা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে 'পাথরের ঠাকুর কথা বলতে পারে না সন্ন্যাসী। কেউ হুজরাত্যে পারবেক।' নাই

নীলকণ্ঠর কথায় শিউরে ওঠে পান্নু। এক মুহূর্ত ভাবল পান্নু। পাথরের দেবতার উপরে মানুষ চিরকাল কর্তৃত্ব করে এসেছে। তাঁর ভোগ্যের নৈবিদ্য, তাঁর নামের অর্ঘ্য উপাচার গ্রহণ করেছে নিজে। অনেক অন্যায় ঘটেছে পৃথিবীতে দেবতার নামে। তাই নীলকণ্ঠর প্রত্যাশা অন্যায় নয়। কিন্তু পান্নুও যথার্থ সন্নাসী নয়। দেবতা যেমন মেকী, পান্নু তার চেয়েও ঝুটো। পাপ পুণ্যের ভয় পান্নুর নেই। তবু ওর মনে নিঃশেষিত প্রায় নীতিবোধ ওকে বাধা দিল।

না, এ অন্যায়। পান্নু ভাবল। একদিকে অপরিসীম আয়েস, অপর দিকে অকুল হতাশা, একদিকে পদ্মকে জয় করার তুরন্ত বাসনা, অন্যদিকে শূন্যতা ও অনিশ্চয়তার দুস্তর পারাবার, কিন্তু বেছে নিতে দ্বিধা করল না পান্নু।

পান্নু কঠিন কণ্ঠে বলে 'না, ই কাজটি আমি লারব। গাঁয়ের লোককে আমি বুঝাতে পারি, কিন্তুক ঠাকুরের নামে মিছা কথাটি বলতে লারব।'

পান্নুর প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলে 'তুমার ঠাকুরকে আমি রূপার ত্রিশূল গড়াই দিব সন্নাসী, আর তুমার সব উবকার করব, যা তুমি চাও।'

'আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কুন কামনা নাই।'

'ভাল করে্য ভেবে দেখ সন্ন্যাসী, তুমার কি কিছুই কামনা নাই? হাতড়াই দেখ বুকেরভিতরটি?'

বুকটা মুহূর্তের জন্য ছ্যাং করে ওঠে। তবুও দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দেয় পান্নু 'না, কিছুতেই না।

নীলকণ্ঠ অন্য কথায় যায়। 'আমার কাজটি তাহল্যে তুমি করবেক নাই?'

'মাফ কর নীলকণ্ঠ, ই কাজটি আমি লারব।'

নীলকণ্ঠর মুখের পেশীগুলো কঠিন হয়। হতাশটাকে আড়াল করে বলে ও'আমি পাপ, পুণ্যি মানি না সন্ন্যাসী, আমি মানি ন্যায় আর অন্যায়। বেশ্যাঘরের এঙ্গান দিয়ে যদি ঠাকুরের মন্দিরে যেতে হয় তাতে পাপ কিসের? আমার কাজ আমি করবই, তবে তুমি সাহায্য করল্যে ভাল হ'ত।'

পান্নু ক্ষীণ কণ্ঠে বলে 'আমি লারব নীলকণ্ঠ। মনটি সায় দিছে নাই।'

নীলকণ্ঠর চোখ দুটো হঠাৎ খটাসের মত দৃপ্ত হ'য়ে ওঠে। সর্বাঙ্গে যেন ফুটে ওঠে একটা আদিম বন্যতা। হঠাৎ ওকে একটা হিংস্র পশুর মত মনে হয়। পান্নু ভয় পেয়ে যায়। নীলকণ্ঠ লাঠি

গাছটা আর লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে সহসা পান্নুর কাছে এসে বলে সন্ন্যাসী, তুমি আমাকে মিছে কথা বুলেছ যে তুমার কামনা নাই। তুমার পরিচয় আমি জানি। তুমি মিছে কথা বুলেছ যি ঠাকুরের নামে তুমি মিছে কথা বুলতে পারবে নাই। সিদিন রেতের বেলায় তুমি যখন ঠাকুরের কেরপা পেয়েছিলে বাঁকা পোলের ধারে আমি তখুন সিখেনে ছিলম। ইয়ার বেশী বোধ করি বলতে হবেক নাই। আজ রাত তুমাকে সময় দিলম। ভেবে দেখ। সকালে তুমার মনের কথাটি আমাকে বলবে।'

নীলকণ্ঠ আর দাঁড়ায় না। লাঠিগাছাটা আর লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে হন হন করে বেরিয়ে যায়।

পান্নু বাকরুদ্ধ।

ঈশ্বরী সিংএর অধ্যায় শেষ হ'য়েছে। একটি দীর্ঘ দিনের ইতিহাসের অবসান ঘটেছে। এখন নবজীবনের অগ্রদূত নীলকণ্ঠ নতুন চিন্তার, নতুন ভাবনার দিশারী। হয়ত আর বছর কয়েক বাদে বাস্তবিকই ব'দলে যাবে তিয়াসির রূপ। তখন পান্নুকে আর কেউ চিনতে পারবে না। সেদিন আর খোল পাল্টাবার দরকার হবে না। এরা সভ্যতার অগ্রদূত। এরা ঈশ্বরকেও কয়েদ করতে চায়। নীলকণ্ঠর কোন দোষ নেই। অনেক মানুষকেই দেখেছে পান্নু তার অভিজ্ঞতাবহুল জীবনে। সবাই ভগবানের কাছে প্রার্থী। কেউ নিঃস্বার্থ নয়। দিতেও চায়, কেউ বা বিশ্বেশ্বরের মাথায় সোনার ছাতা মানত করে, তার কামনা একটি সন্তান, কেউ বা চায় মামলা-মোকদ্দমায় জীৎ, কারো বা আকাঙ্খা শত্রুর নিপাত।

প্রথম প্রথম ভারী হাসী পেত পান্নুর। শুধু মানুষই ভগবানের কাছে প্রার্থী নয়, ভগবানও মানুষের কাছে প্রার্থী, এবং ঐহিক সামগ্রীর প্রতি ভগবানেরও আকাঙ্খার শেষ নেই। ভগবানেরও মানুষের মতই সুক্ষ্ম ব্যবসা বুদ্ধি, কিছু না পেলে যে কিছু দেওয়া যায় না এ জ্ঞানটা ভগবানের ও যথেষ্ট টনটনে। কিন্তু পান্নু জানে— মানুষ বোকা। ভগবানকে কিছু দেবার ইচ্ছেটা একটা বিরাট আত্ম

প্রবঞ্চনা। এবং পান্নু এও ভাবে, মানুষের কোন দোষ নেই। ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু হিসেবে মন্দিরের সেবাইতের ব্যবস্থা করে। তাঁরা বিধান দেন। সে বিধান বিধাতার নির্দেশের মতই অমোঘ। এটা যে একটা বিরাট ফাঁকি মানুষও সজ্ঞানে একথা জানে। কিন্তু এই অনুভবটা চেপে রেখে সর্বদা ভাববার চেষ্টা করে তারা ভগবানের প্রতি অনুরক্ত। এবং এই মেকি আনুগত্যই অনেক দুষ্কর্মের প্রেরণা জোগায়।

কিন্তু পান্নু ভগবানকে আর ঠকতে দেবে না, কারণ পান্নু যথার্থই ভগবানের সেবাইত নয়। পান্নুও মেকী। নীলকণ্ঠ পান্নুকে ভয় দেখিয়ে গেছে, আবার ইঙ্গীতে একথাও জানিয়ে গেছে যে সে অনেক কিছুই জানে। কিন্তু ক্ষতি কি? গেরুয়ার বেশ পান্নুর কাছে অপরিহার্য নয়। যেমন অনায়াসে সে একদিন গেরুয়ার বেশে নিজেকে আবৃত করেছিল তেমনি অনায়াসেই তা ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু——এও তো এক আত্ম প্রবঞ্চনা। এমনি তরীর আশে তীরে ব'সে থাকা? এমনী সন্নাসীর ছদ্মবেশে নিজেকে ঢেকে রেখে কারো প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে ওঠা? পান্নুর মনটা সহসা বিদ্রোহ করে ওঠে। এই ছলনা আর নয়। আর নয় নিজের সঙ্গে অহরহ সংঘাতের পালা। ঝুটো সংযমের সামনে অবরুদ্ধ মনটা দুর্বার হ'য়ে ওঠে। যে যৌবন জ্বালাকে বুকে নিয়ে গাঁ ছেড়েছিল পান্নু, আজ তিরিশ বছরের সীমান্তেও সে জ্বালা নেভেনি। যে তাকে সবই দিতে পারত, কিছুই সে দিল না। মনের সিন্ধুকে কৃপণ মহাজনের মত সব সম্পদ বন্ধ রেখে সে বঞ্চিত করল নিজেকে এবং অপরকে তার কথা নিশিদিন মনে পড়ে। পাপ মন ভগবানের কথা দিনেকের তরেও ভাবেনি। মন্দিরের ঠাকুরের মুখ মাঝে মাঝে ঝাপসা হ'য়ে আসে। সেখানে পদ্মর মুখটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। পুকুরের জলে যখন জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের ছায়া পড়ে তার মাঝেও পদ্মর মুখই টলটল করে। কিন্তু আর নয়। দূরের যাত্রী আবার যাত্রা করবে দূরান্তরে। ক্ষনিক বিরতির দিনগুলি হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির

অন্ধকারে। হারিয়ে যাবে মাটির পৃথিবীর স্বপ্নগুলো। হারিয়ে যাবে ঘরের ঠিকানা। নীড়ের আরাম।

ভগবান সৃষ্টি করেছেন মর্ত্যের মানুষকে। মানুষ সৃষ্টি করেছে মন্দিরের ভগবান। যিনি পূজায়, অর্ঘ্যে, ভোগে ব্যসনে তুষ্ট হন। যিনি কিছু পেলে কিছু দিতে পারেন। যার কাছে দেবার বিনা আশ্বাসে কোন আশির্বাদ লাভ করা যায় না। এখানে ভগবানের চরিত্র নানা কালীমায় কলঙ্কিত। তাই মানুষের ভগবানকে ছেড়ে চলে যেতে চায় পানু। পানু হারিয়ে যেতে চায় আকাশের নিঃসীমতায়, যেখানে কোন ক্লান্তি নেই,‥ কোন কালীমা নেই, পানু হারিয়ে যেতে চায় সবুজের অরণ্যে, যেখানে মানুষেরস্বার্থ চিন্তা বিঘ্নিত করবে না ওর শান্তির আরাধনাকে। পানু সব কিছু হারিয়েও বাঁচতে চায়। বাঁচার তৃষ্ণা যে অনন্ত।

করম পরবের ঈষৎ স্তিমিত আনন্দোৎসবের কোলাহল থেকে বেরিয়ে এল পদ্ম। মধ্যপ্রহরের ক্লান্ত চাঁদ শালই ডহরের শিরীষ শাখার আড়ালে, কম্পমান। আজ পদ্মর সঙ্গে কোন পার্শ্ব চারিণী নেই। আজ পদ্ম একা। আজ সবাই প্রমোদের ক্লান্তিতে নিঃঝুম। হয়ত পদ্মর কথা ভুলেই গেছে। ভুলে যাওয়াবই তো কথা। মানুষ ভুলে যায়। অনেক কথাই ভুলে যায়। আবার অনেক কথা অকারণেই মনে রাখে। বাল্যের অনেক কথাই পদ্মও ভুলে গেছে। কৈশোরও বিস্মৃতপ্রায়। বয়স ক্রমবর্দ্ধমান। করমের আসরে হঠাৎ পরীবালা আর শ্রীকান্তকে দেখে সেই কথাই মনে হল পদ্মর। ওদের গোঠালীর দিনে শ্রীকান্ত আর পরীবলা কোমরে ঘুনসি আর এক ফালী কাপড় প'রে প্রজাপতি ধরত। আজ ওরা কত বড় হ'য়ে গেছে। এখন ওরা চোখের তারায় কথা বলে, হাসে, ভালবাসে। আর পদ্ম ? গোঠালীর দিনগুলোর স্থুধু নিস্ফল স্বপ্নের স্বাক্ষর। পদ্মর চটুল ভ্রুভঙ্গীমা, উজ্বল আলাপন আর ধারাল ছুরীর মত দৃষ্টির আজ আর কোন মূল্য নেই। পদ্ম আজ সকলের করুনার পাত্র। কারণ পদ্ম ফুরিয়ে গেছে। ওর চোখ থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে

যৌবনের দিপ্তি। ক্রমশঃ নিঃশেষিত হচ্ছে। মনোহরণ লাবণ্যের হাতছানি। অকস্মাৎ শরীরে একটা আতঙ্কের শিহরণ বয়ে যায়। পদ্ম বিস্ফাতির চোখে জেগে স্বপ্ন দেখে, একটি রূপহীন, দিপ্তিহীন লোল চর্ম নারীর, যে ওর নিজেরই প্রেতচ্ছায়া। তুনিবার ভয়ে ভয়ে চোখ তুটো বুজে এল। পদ্ম চীৎকার করে উঠল না—।

সেই আতঙ্কিত চীৎকারে নেশা ছুটে গেল মাতালী বুড়ীর। আপনমনে অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বল্ল। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল ও।

পদ্মর চীৎকার প্রতিধ্বনিত হ'ল পাহাড়তলীর পাথরে পাথরে, তারপর উতলা বাতাসের হাহাশ্বাসের মাঝে হারিয়ে গেল। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল পদ্মর। সমস্ত শরীরে একটা মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করল পদ্ম। যন্ত্রণাটা যেন একটি ঝর্ণা ধারার মত ব'য়ে চ'লেছে সর্বাঙ্গে। শরীরটাকে ক্লান্ত পায়ে বাইরে টেনে আনল পদ্ম। তারপর পাগলিনীর মত কালিন্দী সায়রের দিকে ছুটতে লাগল।

পথের মাঝে যেন ছায়ার জাল বিছানো। পথ হাঁটতে হয় আলতো পায়ে। পাছে ছিঁড়ে যায়। বাতাসে বুনো ফুলের সোঁদালী গন্ধ। আচ্ছন্নের মত পথ হাঁটে পদ্ম। কালিন্দী সায়রে কত জল। একদা ওর অতল গভীরে হারিয়ে যেতে সাধ হ'ত পদ্মর। কালিন্দীর পাড়ে এসে দাঁড়ায় পদ্ম। টলটল করছে কালিন্দীর জল। আহা! পদ্মর মনে হয় কালিন্দী যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। গাছের ছায়া পড়েছে জলে। শির শির করে কাঁপছে ছায়াগুলো। যেন পুলকের শিহরণ। দোলা লেগেছে কালিন্দীর বুকে। প্রথমে পদ্ম ভাবল কালিন্দী সায়রে ঝাঁপ দেওয়ার কথা। কালিন্দীর বুকে তলিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা কেমন যেন একটা তৃপ্তির সঙ্গে আস্বাদ করতে থাকে পদ্ম। বেশ হয় যদি কালিন্দীর জলে পদ্মর অনাঘ্রাত রূপ অনাস্বাদিত যৌবন বিলীন হ'য়ে যায়। আর তাতে কার কি যায় আসে? যে ফুল শুধু গাছে থেকেই গন্ধ ছড়াল, কারও স্পর্শ পাওয়ার আগেই যে ঝরে গেল মাটিতে, কেউ বা বোঝে তার ব্যথা।

অনেক বৈশাখের মধ্যদিনে কালিন্দীর বুকে অবগাহন করে দেহের জ্বালা জুড়িয়েছে পদ্ম। কিন্তু জলে কি হৃদয়ের জ্বালা নেভে? সে জ্বালা না মরলে নেভে না। আর যদি মরণ আসার আগেই মরতে হয়, তাহলে কালিন্দীর শান্ত শীতল কালো জলে ডুবে মরাই ভালো। কালিন্দীর জলে একটা স্নেহের আশ্বাস আছে। মায়ের কোলে মুখ গুঁজে ধীরে ধীরে ঘুমের মাঝে তলিয়ে যাওয়ার মত নিশ্চিন্ত আরাম আছে।

পদ্ম ধীরে ধীরে পাড় ছেড়ে নীচে নামে। এখন রাত্রির মধ্য প্রহর। এখনও চাঁদ ওঠেনি আকাশে। এবং জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে পদ্ম হঠাৎ ভাবল একবার চাঁদ দেখবে না? শেষ বারের মত। তারপর মনে হ'ল জীবনের অনেক মুহূর্তে ঈর্ষিত শত্রুর মত চাঁদও তাকে অনেক জ্বালিয়েছে। এতএব, থাক। পদ্ম আরও নীচে নামে। মরতে আর মোটেই ভয় লাগছে না। মনে হ'চ্ছে মরার ইচ্ছেটার মধ্যে একটা হারিয়ে যাওয়ার দুর্নিবার হাতছানি রয়েছে। কালিন্দীর জল বড় ঠাণ্ডা সর্বাঙ্গ যেন অবশ হ'য়ে যায়। পদ্ম আরও গভীরে নামে। এখানে বুক সমান জল। আর হাতখানেক পরেই মৃত্যু। হিমশীতল মৃত্যু। পৃথিবী নিস্তব্ধ। গাছের পাতাগুলো রুদ্ধশ্বাস। পদ্মর চোখ দুটো বুজে আসে। মৃত্যুর তোরণ দ্বারে দাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীটাকে প্রাণ ভ'রে দেখতে চায় পদ্ম।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মন্দির থেকে একটা ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। মাত্র কয়েকবার। দীর্ঘ, বিলম্বিত. গম্ভীর। মুহূর্তে পদ্ম যেন চেতনায় ফিরে এল। সেই ঘণ্টাধ্বনি বাতাসে তরঙ্গায়িত হ'য়ে কালিন্দীর বুকে একটা মৃদু কম্পনের সৃষ্টি করল। সমস্ত বনভূমিতে প্রতিধ্বনিত হ'ল। পদ্মর সহসা মনে হ'ল এই ঘণ্টাধ্বনি বুঝি বা কোন প্রিয়জনের আহ্বান। কারো সাদর আমন্ত্রণ।

পদ্মর মরা হ'ল না। মরার দুরন্ত বাসনাটা ডুবে মরল কালিন্দীর জলে। পদ্ম সিক্ত বসনে উপরে উঠে দ্রুত পায়ে মন্দিরের দিকে হাঁটতে

থাকে। সরু অপরিসর পথ। দু পাশে ভেড়ী জটার কাঁটা। কাঁটাগুলো ওর শাড়ীতে আটকে গেল। হঠাৎ চাঁদ উঠল 'আকাশে। জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হ'ল বনভূমি। সেই আলোর বন্যায় মায়ামুগ্ধ হরিণীর মত পথ চ'লতে লাগল পদ্ম।

মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে আবছা। যেন একটা শ্বেত হস্তীর মত বিশাল আর শান্ত। যেন সমস্ত বাধা. বিঘ্ন বিপদের অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

. পদ্ম ব্যস্ত পায়ে, মন্দিরের বারান্দায় ওঠে। চারিদিক তাকিয়ে দেখে পদ্ম। বুকটা ছম্ ছম্ করে। কই, কেউ তো কোথাও নেই? দেবতার পায়ের কাছে একটা প্রদীপ। তারই স্বল্প আলোকে বারান্দার একাংশ আলোকিত। সেই আবছা আলোয় পদ্ম দেখল ছাদের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা ঘণ্টাটা কাঁপছে মৃদু মৃদু। এবং তারপরই অবাক বিস্ময়ে পদ্ম দেখল এককোণে একরাশ গেরুয়ার বেশ জড় করা আছে। তা'হলে? পদ্মর হৃদয় আশা ও হতাশায় উদ্বেলিত হয়। কিন্তু কোথায় সে?

পদ্ম ওর সব লজ্জা বিসর্জন দিয়ে এসেছে কালিন্দীর জলে। পান্নুও পরিত্যাগ করেছে ওর মেকী গেরুয়ার বেশ। সুতরাং আর বাধা কোথায়? কিন্তু তবুও পদ্মর কবুতরের মত ভীরু হৃদয় অস্থির হ'য়ে ওঠে। হারানোর বেদনা পদ্ম অনুভব করেছে আজ প্রায় এক যুগ। আর পেয়ে হারানোর বেদনা যে আরও দুঃসহ।

পদ্ম প্রাণপণে চীৎকার করে ওঠে 'পান্নু'...কেউ সাড়া দেয় না। পদ্ম আর একবার চীৎকরে করে ডাকে। এবং আর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রে ধীরে ধীরে নীচে নামে। তারপর শালই ডহরের অন্ধকারের মাঝে মিলিয়ে যায়। পদ্ম পান্নুকে খুঁজবে। যেমন কৈশোরের গোঠালীর দিনে শালই ডহরের নিভৃত জায়গাগুলোতে পান্নুকে খুঁজে বার করত ও। ঠিক তেমনী করে।